বিপুল নিকট

সমরেশ মজুমদার

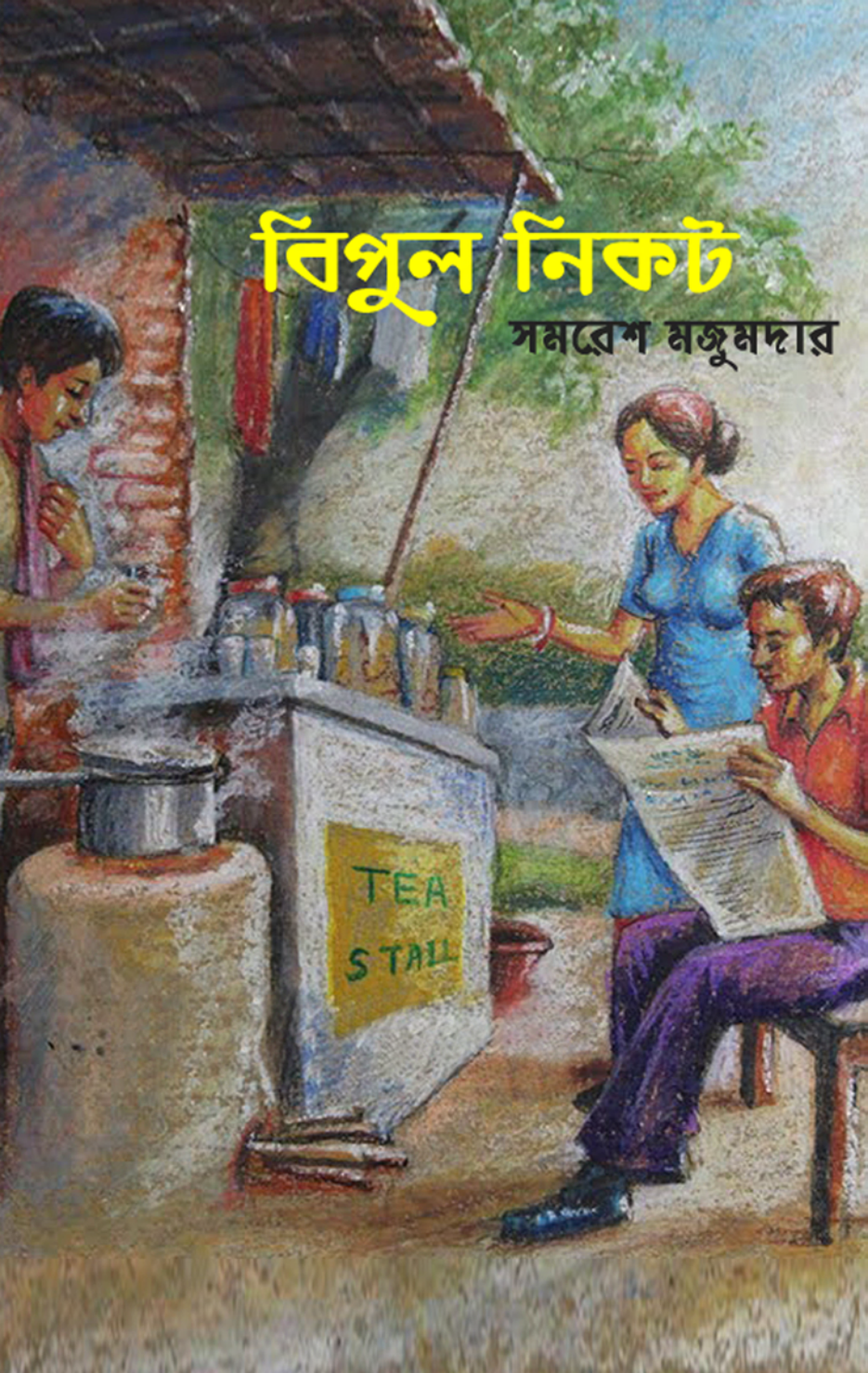

বিপুল নিকট

সমরেশ মজুমদার

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২

© সমরেশ মজুমদার

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-088-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

BIPUL NIKOT
by
Samaresh Majumder
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

।। এক ।।

বিকেল থেকেই আকাশ মেঘে অন্ধকার। সকালে কালীদার চায়ের দোকানে বসে কাগজ হাতে নিয়ে সে জেনেছিল আজ কলকাতা ভাসবে। চারটে বাজতেই ঠিক করেছিল গাড়ি গ্যারাজ করে দেবে।

মালিকের টাকা আর তেলের দাম উঠে গেছে যখন, তখন আর লোভ না করাই ভাল। কিন্তু ক্যালকাটা হাসপাতালের সামনে দাঁড়ানো দুটো মানুষকে দেখে না দাঁড়িয়ে পারেনি অজয়। বুড়ো-বুড়ি। পরস্পরকে ধরে দাঁড়িয়ে, বুড়োর একটা হাত কাঁপতে কাঁপতে তাকে থামতে বলছে। ছুটোছুটি করে ট্যাক্সি ধরার ক্ষমতা এঁদের নেই। অজয়ের গ্যারাজ ভবানীপুরে, ওই দিকে যদি যায় তা হলে নামিয়ে দিতে অসুবিধে নেই। গাড়ি থামিয়ে সে চেঁচিয়েছিল, ' কোথায় যাবেন?'

বুড়ি আঁকড়ে ধরেছিল গাড়ির দরজা, 'আমাদের বাড়ি পৌঁছে দাও বাবা। ওর মাথা ঘুরছে, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। যা চাইবে তাই দেব।'

হেসে ফেলেছিল অজয়, 'উঠে পড়ুন।'

পিছনের সিটে বসেই বুড়ো বলেছিল, ' আঃ। বেঁচে গেলাম।'

'বাড়ি কোথায়? ভবানীপুর না চেতলায়?'

'অ্যাঁ?' বুড়ি মাথা নেড়েছিল, 'না, না। আমরা থাকি সল্টলেকে। করুণাময়ীতে। বোনের অপারেশন হয়েছে, দেখতে এসেছিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চেপেছিল অজয়। সর্বনাশ। এখান থেকে সল্ট লেকে যেতে লাগবে ঘণ্টাখানেক। তার পর ফিরতে হবে খালি গাড়ি নিয়ে। বৃষ্টি তো শুরু হয়ে যাবেই। সে পিছনে তাকাল। বুড়ো চোখ বন্ধ করে মাথা হেলিয়ে বসে আছে, বুড়ি তার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে আছে। এঁদের নেমে যেতে বলবে কী করে!

অতএব কপালে দুঃখ আছে ভেবেই গাড়ি ঘুরিয়েছিল অজয়। পার্ক সার্কাসের চার নম্বর ব্রিজের ওপর উঠতেই বৃষ্টি নামল। সঙ্গে বিদ্যুৎ আর বাজ সঙ্গত করল।

'কাচ তুলে দিতে পারবেন, ঠাকুমা?'

'হ্যাঁ বাবা, পারব।'

যত এগোচ্ছে তত বৃষ্টির তেজ বাড়ছে। হেডলাইটের আলো রাস্তা পরিষ্কার করতে পারছে না। সব সাদা। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে থেমে যেতে হচ্ছিল অন্যান্য গাড়ির মতন। করুণাময়ীতে পৌঁছতে দেড় ঘণ্টা লাগল। বিশেষ একটা বাড়ির সামনে বুড়ির কথায় গাড়ি থামাল সে, 'নামবেন কী করে? কী জোর বৃষ্টি পড়ছে দেখছেন না?'

'ওই তো বাড়ি। দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছি। তালাও খুলতে হবে। তোমাকে কতক্ষণ আটকে রাখব বাবা?' বুড়ি বলল।

এ বার বুড়ো সোজা হল, 'কত হয়েছে ভাই?'

মিটার দেখে টাকার অঙ্কটা বলল অজয়।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে গুনে গুনে টাকাটা দিয়ে দিল বুড়ো। বুড়ি বলল, 'তুমি বসো। আমি গিয়ে তালা খুলে ছাতিটা নিয়ে আসি।'

'তখনই বলেছিলাম ছাতি নিয়ে বেরোও, শুনলে না!' বুড়োর গলায় রুষ্ট ভাব।

'কাকে সামলাব? তোমাকে না ছাতিকে? বসো, আসছি।'

অজয় দেখল বুড়ি টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে নিজের বাড়ির দরজার দিকে। সে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা ছাড়া আর কে কে থাকে এ বাড়িতে?'

'দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলে দুটো থাকে আমেরিকায়, মেয়ে-জামাই কেনিয়ায়। আমরা মরে যাওয়ার পর এসে বাড়ি বিক্রি করে দেবে। তদ্দিন...।' বুড়ো কথা শেষ করল না।

'ওদের কাছে চলে যাচ্ছেন না কেন?' অজয় প্রশ্নটা না করে পারল না।

'ওরা ওদের মা গেলে খুশি হবে, কিন্তু আমাকে ছেড়ে ইনি কোথাও যেতে চান না যে।'

দরজায় আওয়াজ হল। বুড়ো সেটা খুলতেই বুড়ির গলা শোনা গেল, 'এসো। ছাতাটা তুমি নাও, আমি তো ভিজে একসা। এখনই বাথরুমে ঢুকব।'

বুড়ো ছাতি মাথায় বুড়ির হাত ধরে চলে যেতেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিল অজয়। তার মন খারাপ হয়ে গেল। মনে হল মানুষের বেশি দিন একা একা বাঁচা ঠিক নয়। অবশ্য ওঁরা তো একা নয়, দু'জনে রয়েছেন। ছেলেমেয়ে থাকতেও দু'জনের একা হয়ে থাকাটা ভয়ঙ্কর কষ্টের। পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম হলেও তার বাবা-মায়ের এই সমস্যা নেই। উঠোনের চার পাশে কাকা জ্যাঠারা আছেন। চাষবাসও একসঙ্গে। ছেলেরা চাকরি করতে বাইরে গিয়েছে বটে, কিন্তু নিয়মিত টাকা পাঠায়। সেই টাকা প্রয়োজন পড়লে অন্যের সমস্যার সমাধান করে। চেষ্টা করলেও কেউ একা হতে পারবে না ওখানে।

বৃষ্টিটা আরও বাড়ল। কাচ থেকে জল সরাতে পারছে না কাঠিটা। ওপাশ থেকে আসা গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে ডাইনির চোখের মতো। এ ভাবে আরও আধ ঘণ্টা ঢাললে কলকাতার রাস্তায় এক হাঁটু জল জমে যাবে। শালা! বুড়ো-বুড়ির উপকার করতে গিয়ে সে ফেঁসে গেল। কোনও রকমে চিংড়িঘাটায় পৌঁছে সে গাড়ি রাস্তার ধারে পার্ক করল। নাঃ, এ ভাবে অজ্ঞের মতো বাইপাসে গাড়ি চালানোর ঝুঁকি সে নেবে না। রাত হোক। মালিক মিটার বাড়াতে চাইলে ঝগড়া করতে হবে। মনে হল বৃষ্টিতে ফেঁসে যাওয়ার খবরটা মালিককে জানিয়ে রাখাই

ভাল। সে প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল বের করে নাম বের করে বোতাম টিপল। রিং হচ্ছে। তার পর গলা পেয়ে ব্যাপারটা বলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মালিক চিৎকার করল, 'বৃষ্টি আসছে তুমি জানতে না? সব ক'টা কাগজে লিখেছে মারাত্মক ডিপ্রেশন হয়েছে, দেখোনি! তবু খিদিরপুর থেকে চলে গেলে সল্ট লেক? নাইট শিফটের ড্রাইভার আসবে রাত ন'টায়। যেমন করে হোক তার আগে এসে।' লাইন কেটে দিল মালিক। একটুও রাগ করল না অজয়। এখন মাত্র পৌনে সাতটা। সাধারণ সময়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ভবানীপুরে পৌঁছে যেত। এখন দু'ঘণ্টার ওপর সময় হাতে আছে। পকেটে মোবাইল ঢুকিয়ে সে লাল কাপড়টা দিয়ে সামনের কাচটা মুছতে যেতেই মোবাইলের রিং শুনতে পেল। আবার পকেটে হাত দিতে গিয়ে থমকে গেল সে। আওয়াজটা আসছে পিছনের দিক থেকে। সে ওপরে আলো জ্বেলে ব্যাক সিটটাকে দেখল। কিছু নেই। তার পর শব্দের উৎস বুঝে শরীর হেলিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে আলো জ্বলতে দেখল। ব্যাক সিটের পা রাখার জায়গায় একটা মোবাইল পড়ে আছে। বাজতে বাজতে থেমে গেল সেটা, আলো নিভে গেল।

অনেক কসরত করে মোবাইলটাকে হাতে পেল অজয়। সাধারণ চেহারার মোবাইল। নিশ্চয়ই কোনও প্যাসেঞ্জার ফেলে গেছে ভুল করে। তার গাড়িতে উঠে কেউ কি মোবাইলে কথা বলেছিল? মনে পড়ছিল না। এই মাত্র যে নম্বর থেকে ফোনটা এসেছিল তার সঙ্গে কথা বললে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে ভেবে বোতাম টিপল অজয়। নম্বরটা ল্যান্ড লাইনের।

রিং হচ্ছে। তার পরই গলা শুনতে পেল, 'হ্যালো!'

'আপনারা কেউ কি একটা মোবাইলে রিং করেছিলেন একটু আগে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার মোবাইল। কোথায় ফেলেছি মনে করতে পারছি না। হয় হাসপাতালে, নয় ট্যাক্সিতে। আপনি কে ভাই?'

'আপনি আমার ট্যাক্সিতেই ওটা ফেলে গেছেন।'

'ও, তুমি। এই শোনো, যে ছেলেটি আমাদের পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, সে ফোন করছে। ওর গাড়িতেই মোবাইলটা ফেলে এসেছি। ওই মানিব্যাগ বের করার সময় হয়তো পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে। হ্যাঁ ভাই, তুমি এখন কোথায়?' বুড়ো জিজ্ঞেস করল।

'চিংড়িঘাটায়'। অজয় জবাব দিল।

'ও বাব্বা! কী হবে? মুশকিল হল আমার ছেলেমেয়েরা ওই মোবাইলেই ফোন করে। তা ঠিক আছে, তুমি আবার যখন কোনও প্যাসেঞ্জার নিয়ে সল্ট লেকে আসবে তখন দিয়ে যেয়ো।'

অজয় সুইচ অফ করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

যে ছেলেমেয়ে বাপ-মাকে একা ফেলে রেখেছে তাদের ফোনের জন্যে বুড়ো এখনও উদগ্রীব হয়ে থাকে! এক বার মনে হল তার কী দরকার এখনই মোবাইলটা ফেরত দেওয়ার। এই যে তেল পুড়বে, সময় যাবে, তার দাম কি বুড়ো দেবে? ভাবতেই ঠোঁট কামড়াল। এ রকম হলে বুড়োর ছেলেরা-যা ভাবত, তাই সে ভাবছে! দুর!

তখনও বৃষ্টি সমানে চলছে। বাড়ির সামনে পৌঁছে হর্ন দিল অজয়। বৃষ্টিতে ভেজার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। দ্বিতীয় বার হর্ন বাজানোর পর দরজায় আলো দেখা গেল। ছাতি মাথায় বেরিয়ে এল বুড়ি। জানলার কাচ সরিয়ে মোবাইল তাঁর হাতে দিতে বুড়ি বলল, 'একবার ভেতরে আসতে হবে বাবা। এক কাপ চা খেয়ে যাও।'

'না, না। খুব দেরি হয়ে গেছে। আবার কখনও এ দিকে এলে নিশ্চয় চা খেতে আসব। আচ্ছা চলি।' কাচ তুলে গাড়ি ঘোরাল অজয় দরজা লক করে।

এখন রাস্তায় মানুষ দূরের কথা একটা নেড়ি কুকুরও নেই। পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত কোনও গাড়িই চোখে পড়ছে না। আকাশটা যেন আর বৃষ্টি ধরে রাখতে পারছে না। খানিকটা যেতেই একটা অ্যাম্বাসাডার দেখতে পেল সে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে দুটো মানুষ বৃষ্টিতে ভিজে একসা হয়ে হাত তুলে তাকে থামতে বলছে। এরা যদি সাউথে যায়, তা হলে খালি গাড়ি নিয়ে ফিরতে হবে না।

সে গাড়ি থামাতেই লোক দুটো গাড়ির ওপর আছড়ে পড়ল। এক জন চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, দরজা খোল। ডাবল ভাড়া দেব!'

সে কাচ নামাল, 'কোথায় যাবেন?'

দ্বিতীয় জন চেঁচাল বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে, 'তাতে তোর কী। ডাবল মাল নিবি পৌঁছে দিবি। তাড়াতাড়ি কর, টুনটুনি ভেগেছে, তুলতে হবে।'

লোক দুটো যে আকণ্ঠ মদ গিলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এদের গাড়িতে নিলে বিপদে পড়তেই হবে। কাচ তুলে অ্যাকসেলারেটারে চাপ দিল অজয়। গাড়ি চলতে শুরু করা মাত্র অশ্রাব্য গালাগালি শুরু করল লোক দুটো। অন্য সময় হলে অজয় গাড়ি থামিয়ে নীচে নামত। লোক দুটোকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ফিরে আসত। এখন এই বৃষ্টি, ভিজতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না। বেঁচে গেল জন্তু দুটো।

সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল অজয়। ইতিমধ্যেই গর্তগুলো জলে ভরে গেছে। সেখানে চাকা যদি জোর গতিতে পড়ে তা হলে গাড়ির বারোটা বেজে যাবে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আচ্ছা, ওই মাতাল দুটো এই বৃষ্টিতে গাড়ি থামিয়ে কী করছিল ওখানে? গাড়ি কি খারাপ হয়ে গিয়েছিল? নিশ্চয়ই তাই। নইলে নিজেদের গাড়ি ছেড়ে ট্যাক্সিতে উঠতে যাবে কেন? বৃষ্টির মধ্যে গাড়িতে বসে মাল খাওয়ার

পার্টি কলকাতায় প্রচুর। ব্যাপারটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। রাতে মাতাল দেখলে কোনও ট্যাক্সিওয়ালা দাঁড়াতে চায় না, যদি না ড্রাইভারের মতলব খারাপ থাকে।

একটা গর্ত বুঝতে পারেনি সে, গাড়ি লাফাল। শালা! অন্যমনস্ক হলেই বিপদ লাফিয়ে সামনে আসে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে খুব। মুহূর্তের জন্যে সামনের পথ সাদা হয়েই আরও অন্ধকার হচ্ছে। হেডলাইটের আলোকে বৃষ্টি গিলে ফেলছে।

নিকো পার্ক ছাড়াবার পরে রাস্তায় জল নেই দেখে সে গাড়ির গতি একটু বাড়াতেই বিদ্যুৎ চমকাল। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যে সে দেখতে পেল রাস্তার মাঝখান দিয়ে কেউ দৌড়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা মাথায় ঢোকার আগে গাড়ির ঠিক সামনে একটা মানুষকে দেখতে পেয়ে সাডেন ব্রেক চাপল অজয়। গাড়ি একই জায়গায় প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে দাঁড়িয়ে গেল। আবার বিদ্যুৎ চমকাল তখন, কিন্তু কেউ সামনে দাঁড়িয়ে নেই।

কিন্তু লোকটাকে সে সামনে দেখেছে। আর তার গাড়ি যে লোকটাকে স্পর্শ করেনি তাতে সে নিঃসংশয়। কিন্তু গেল কোথায়? গাড়ির সামনে পড়ে যায়নি তো? ধাক্কা যদি না লাগে তা হলে পড়বে কী করে?

কিন্তু যদি সামনে পড়ে থাকে তা হলে গাড়ি তো ওর ওপর দিয়ে যাবে। সে ঘড়ি দেখল। হাতে মাত্র দেড় ঘণ্টা রয়েছে। কী করবে। ব্যাক করল সে। খানিকটা পিছিয়ে যেতেই হেডলাইটের আলোয় দেখতে পেল এক জন রাস্তার মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বৃষ্টি যে শরীরটার ওপর পড়ছে, সেটা পুরুষের নয়।

না। সে ধাক্কা মারেনি। তা হলে মহিলা পড়ল কী করে? বেঁচে আছে তো? ওকে ওইখানে ফেলে পাশ কাটিয়ে সে চলে যেতেই পারে। তার পর লাল কাপড়টা তুলে মাথায় পাগড়ির মতো তুলে নীচে নামতেই জলের ঝাপটা লাগল শরীরে। মহিলার কাছে গিয়ে সে চিৎকার করল, 'কী হয়েছে আপনার? এই যে!'

কোনও সাড়াশব্দ নেই। সে শরীরটাকে চিৎ করে দিতেই বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোয় বুঝতে পারল ওর বয়স চব্বিশের বেশি নয়। নাকের নীচে আঙুল রাখতেই বুঝতে পারল শ্বাস পড়ছে। একে কোনও হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত। দৌড়ে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে আবার এগিয়ে এসে মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল অজয়।

পেছনের সিটে ওকে বসাতেই মাথাটা কাত হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে অজয় যখন ড্রাইভিং সিটে বসল, তখন তার সর্বাঙ্গ থেকে জল ঝরছে। গাড়ির বারোটা বেজে গেল। মালিক আজ তার শ্রাদ্ধ করবে।

গাড়ি চালু করল সে। সোজা বাইপাস দিয়ে রুবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই উচিত। কিন্তু ...! মাথা নাড়ল অজয়। হাসপাতালে গিয়ে সে মেয়েটার পরিচয় তো কিছুই দিতে পারবে না। অ্যাকসিডেন্ট হয়নি, রাস্তা থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে

নিয়ে এসেছে বললে তো পুলিশ কেস হয়ে যাবে। পুলিশ তাকে সহজে ছাড়বে না।

সে পিছন ফিরে চিৎকার করল, 'এই যে, কে আপনি?' কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। হঠাৎ মাতাল দুটোর কথা মনে এল। ওদের এক জন বলেছিল, টুনটুনি ভেগেছে, ওকে তুলতে হবে। তা হলে এই মেয়েই সেই টুনটুনি! ওই মাতালদের সঙ্গে কী করছিল?

ততক্ষণে গাড়ি বাইপাসে উঠে গেছে। অজয়ের মনে হল, ঝুটঝামেলায় না গিয়ে ওকে রাস্তার এক পাশে নামিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু কোথায় নামাবে। যদিও বাইপাসে এখন গাড়ি কম কিন্তু দৃশ্যটা কেউ না কেউ দেখতে পাবেই। একটা পুলিশের ভ্যানকে সে দেখতে পেল রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে ভিজছে । ধরা পড়লে কোনও কৈফিয়ত পুলিশ শুনবে না।

'এত ভাবছ কেন? তুমি তো প্রকৃত মানুষের যা করা উচিত, তাই করেছ।'

কে বলল কথাটা? গলাটা কোনও বয়স্ক মানুষের। গাড়িতে সে আর অজানা মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। শালা, আজ কী যে সব হচ্ছে! তবু সে পিছনের দিকে তাকিয়েই ব্রেকে চাপ দিল। একটি টাকমাথার বুড়ো মেয়েটির মাথার পাশে বসে আছে। সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ' কে আপনি? কী করে গাড়িতে উঠলেন?'

'ভাল করে তাকিয়ে দেখো, বোধ হয় আমাকে চিনতে পারবে।' বৃদ্ধ হাসলেন।

।। দুই ।।

জোরে ব্রেক চাপল অজয়। বাইপাসের রাস্তা ছেড়ে তার গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। সে অনেকটা ঘুরে বসে বলল, 'আপনাকে আমি চিনব কী করে? ওই মেয়েটাকে যখন গাড়িতে তুলেছিলাম আপনি সেই সুযোগে উঠে বসেছেন। খুব অন্যায় করেছেন। নেমে যান।'

'তুমি এখনও ভুল করছ হে। যা বৃষ্টি, ওই ভাবে উঠলে তো আমার শরীর জলে ভিজে যেত।'

মানুষটির হাসি দেখে খেয়াল হল অজয়ের। সত্যি তো, এক ফোঁটা জলের দাগও ওঁর পোশাকে নেই।

'কিন্তু তুমি খুব ভাল কাজ করেছ। নইলে ওই মেয়েটি কোনও গাড়ির নীচে চাপা পড়ত অথবা ওই মাতালদের লালসার শিকার হত। এই তো চাই! কে বলে, আজকাল মানুষের বুক থেকে দয়া-মায়া-পরোপকার করার ইচ্ছে চলে গেছে।'

অজয় মানুষটিকে ভাল করে দেখল। এ বার মনে হচ্ছে কোথাও দেখেছে ওঁকে। আর তার পরেই মনে হতে লাগল, খুব চেনা ওই মুখটা। সে নিজের মনেই বলল, 'না, এ হতে পারে না।'

'কী হতে পারে না?'

'অসম্ভব!' মাথা নাড়ল অজয়।

'আহা, তুমি তো মূর্খ নও যে অসম্ভব বলবে।'

'দেখুন, আপনার সঙ্গে যে মানুষটির হুবহু মিল, তিনি কত বছর আগে জানি না, মাইকেল মধুসূদন দত্তের আমলে বেঁচে ছিলেন। সেই মানুষটি এত বছর বাদে আমার গাড়িতে বসে থাকতে পারেন না!'

'কেন পারে না! কচি কচি শিশুরা যখন বইটা তাদের নরম হাতে স্পর্শ করে তখনই আমি বেঁচে উঠি। এই পৃথিবীর বাতাস থেকে তারাই মুছে যায়, যারা বেঁচে থাকার সময় মানুষের জন্যে একটুও ভাবেনি।' তিনি হাসলেন।

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তা হলে কি যাঁদের কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, তাঁরা সবাই এখানে বাতাসের সঙ্গে মিশে আছেন?'

'হ্যাঁ। আছেন।' তিনি মাথা দোলালেন, 'কিন্তু তুমি বেশ ভাল ভাবে কথা বলতে পারো, অন্যান্য ট্যাক্সিচালকদের মতো নয়।'

'আমি গাঁয়ের ছেলে। বি এ পাশ করে কোনও কাজ না পেয়ে ড্রাইভিং শিখে কলকাতায় ট্যাক্সি চালাচ্ছি।'

'খুব ভাল করেছ। কোনও কাজই ছোট নয়, যদি কাজটা ভাল ভাবে করো। তা এখন ওই মেয়েটিকে নিয়ে কী করবে?'

'বুঝতে পারছি না। হাসপাতালে নিয়ে গেলে পুলিশ ধরবেই।'

'তাই বলে রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে যাওয়া অত্যন্ত অন্যায় হবে।'

অজয় লজ্জা পেল, 'আমার মাথা কাজ করছিল না...!'

'আমি বলি কী, মেয়েটিকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়াই ভাল। মনে হয় ওর শরীরে কোনও আঘাত লাগেনি, ভয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।'

'কিন্তু আমি তো ওর বাড়ি কোথায় তা জানি না।' অজয় রাস্তার দিকে তাকাল। বৃষ্টি কমে আসছে। গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। সে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই ওর বাড়ির ঠিকানা বলতে পারবেন।'

কোনও সাড়া নেই। অজয় দেখল মানুষটি নেই। মেয়েটি নড়ে উঠে অস্ফুট আওয়াজ করল, 'উঃ।'

অজয় চিৎকার করল, 'আপনি চলে গেলেন কেন?' নিজের কাছেই গলাটাকে অপরিচিত ঠেকল তার।

নিজের শরীরে চিমটি কাটল অজয়। সে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খামোকা তার গাড়িতে এসে বসবেন কেন? মাল খেয়ে ওঁকে দেখলে কিছু বলার ছিল না। সেই কবে 'বর্ণ পরিচয়'-এর পাতায় ওঁর মুখ প্রথম দেখেছিল,

কলেজ স্কোয়ারের মূর্তিটা তো আজকাল আড়ালে পড়ে যাওয়ায় চোখে পড়ে না, কিন্তু কেসটা মুন্নাভাইয়ের মতো হয়ে যাচ্ছে না?

গাড়ি চালিয়ে অনেকটা এগোতেই মোবাইল বেজে উঠল। অন করতেই সে মালিকের গলা শুনতে পেল, 'কী ব্যাপার? এখন কোথায়?'

'এসে গেছি।' অর্ধসত্য বলল সে।

'নাহে, আজ রাতের ডিউটি করতে পারবে না ধনঞ্জয়। বৃষ্টিতে আটকে গিয়েছে। এখানে গ্যারেজের সামনেও হাঁটুজল জমে গেছে। জল নামলে গ্যারাজ করে চাবি দিয়ে যেয়ো। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।' মালিক বলল।

'যা ব্বাবা। রাস্তায় কোনও প্যাসেঞ্জার নেই। আমি ততক্ষণ কোথায় ঘুরব?'

'তোমার বাড়ির সামনে জল জমে?'

'বোধ হয় না।'

'তা হলে রাতে ওখানেই রেখে গাড়ির মধ্যে শুয়ে থেকো।'

গাড়ির মধ্যে সারা রাত শুয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তার আগে এই মেয়েটার হিল্লে করা দরকার। সে চার নম্বর ব্রিজ পেরিয়ে এসে গাড়ি থামাল, 'এই যে, শুনছেন? বিদ্যাসাগরমশাই যা-ই বলুন, এতক্ষণে তো জেগে ওঠা উচিত?'

মেয়েটির মুখ থেকে একটু আওয়াজও বের হল না। অজয় জলের বোতল থেকে খানিকটা মেয়েটির মুখে ছুড়ে মারতেই কথা ফুটল, 'ওঃ, ও মা! মাগো।'

'আপনার মায়ের ঠিকানাটা দয়া করে বলুন।'

'অ্যাঁ! আমি, আমি কোথায়?'

'আমার ট্যাক্সিতে। রাস্তায় পড়ে ছিলেন, দয়া করে গাড়িতে তুলে বাঁচিয়েছি। আমার কথা বুঝতে পারছেন? এখন দয়া করে নেমে যান। সাউথে বাড়ি হলে বলুন পৌঁছে দিচ্ছি। তিনি বলে গিয়েছেন আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে।'

'কে?'

'নাম বললে আমাকে পাগল ভাববেন। কোথায় থাকেন?'

'হটর।'

'সেটা কোথায়?'

'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। স্টেশন থেকে বাসে যেতে হয়।'

'ও। পার্ক সার্কাসের মোড়ে নামিয়ে দিচ্ছি, শেয়ালদায় গিয়ে ট্রেন ধরুন।'

'আমার মাথা ঘুরছে, হাঁটতে পারব না।' মেয়েটি এ বার কেঁদে ফেলল।

অজয় দেখল দূরে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সে আবার ইঞ্জিন চালু করে বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল, 'সল্ট লেকে কী করছিলেন?'

'আমাকে চাকরি দেবে বলে ডেকেছিল।'

'কী ভাবে ডাকল?'

'কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করেছিলাম।'

'তো?'

'এতক্ষণ বসিয়ে রেখে বলল, আমার চাকরি হয়ে যাবে। ওদের কোম্পানিতে টাকা দিয়ে যারা কিছুক্ষণের জন্যে বান্ধবী চায় তাদের সঙ্গ দিতে হবে। আমি রাজি হচ্ছিলাম না দেখে মেয়েটা আমাকে ওদের মালিকদের ঘরে নিয়ে গেল। তারা তখন মদ খাচ্ছিল। বলল, 'ঠিক আছে, চাকরি করতে হবে না। খুব বৃষ্টি পড়ছে, চলো তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি।' গাড়ির মধ্যে ওরা আমার গায়ে হাত দিতেই আমি ধাক্কা মারতেই গাড়ি রাস্তার ধারে চলে গিয়ে চাকায় আওয়াজ তুলে থেমে যায়। আমি তখন দরজা খুলে দৌড়তে থাকি। ওঃ, আর কিছু মনে নেই।'

'বাঃ, চমৎকার গল্প!' অজয় হাসল।

'না', চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, 'গল্প নয়। সত্যি।'

'বেশ। এখন আপনি কোথায় যাবেন? কলকাতায় কোনও আত্মীয় আছেন?'

'না। কেউ নেই।'

বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছিল। অজয় মাথা নাড়ল, 'আপনাকে আমি চিনি না, এমনকী আপনার নামও জানি না। পুলিশ ধরলে ফেঁসে যেতে হবে। দয়া করে আমাকে বাঁচান, নেমে পড়ুন।'

'আপনি, আপনি আজ রাতটা আপনার বাড়িতে থাকতে দেবেন?' কাতর গলায় বলল মেয়েটি, 'আমার নাম অঞ্জনা, অঞ্জনা বিশ্বাস।'

'যাচ্চলে! দেখুন, আমি একটা ঘরে একা থাকি। দুপুরে হোটেলে খাই, রাতে যা হোক কিছু বানিয়ে নিই। আপনাকে ঘর ছেড়ে দিয়ে আমি তো রাস্তায় থাকতে পারব না।' অজয় বলল।

'আপনি তো ভাল লোক। কোনও অসুবিধে করব না। ভোর হলেই চলে যাব।'

'কী যে করি। আমার বারোটা বেজে গেল।'

'কেন?'

'কাজ থেকে ফিরে রান্না করার সময় আমি দু'পেগ মদ খাই...!'

'আপনি মাতাল হয়ে যান? ওদের মতো?'

'না, না। দু'পেগে কেউ মাতাল হয় না। আমি কখনও হইনি।'

'তা হলে আমার কোনও অসুবিধে নেই।'

একটা ব্লাইন্ড লেনের শেষ বাড়ির একতলার অ্যাটাচড বাথওয়ালা ঘরে অজয়ের বাসস্থান। বৃষ্টি আবার জোরালো হওয়ায় পাড়ার কোনও মানুষ বাইরে নেই।

গাড়িটাকে গলির শেষ প্রান্তে নিজের দরজার সামনে এনে সে বলল, 'দাঁড়ান, আগে দরজা খুলি।'

দরজা খুলতেই মেয়েটি টুক করে ঢুকে গেল ভেতরে। আলো জ্বেলে দিয়ে গাড়িটাকে লক করতে গিয়ে আপাদমস্তক ভিজে গেল অজয়।

'ওপাশে বাথরুম আছে। আপনার জামাকাপড় তো ভিজে। এইভাবে থাকবেন?'

'অনেক শুকিয়ে এসেছে।' মেয়েটি, যার নাম অঞ্জনা, বাথরুমে চলে গেল।

দ্রুত ঘরটাকে গুছিয়ে নিতেই অঞ্জনা বেরিয়ে এল। অজয় বুঝতে পারল মেয়েটা সত্যি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে বলল, 'আমার কাছে মেয়েদের কোনও পোশাক নেই। বিছানার ওপর খবরের কাগজ পেতে দিচ্ছি, শুয়ে পড়ুন।'

'আমি ওই কোনার মেঝেতে শুয়ে পড়ি?'

' দেখুন, তিনি বলেছেন আমার বুক থেকে দয়া-মায়া মুছে যায়নি। যা বলছি তাই শুনুন। খাটে উঠে পড়ুন। আমি রান্না করছি, হলে ডাকব। খেয়ে নেবেন।'

'আমি কিছু খাব না।'

'আপনার মর্জি।'

বেশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অঞ্জনা খাটে শুয়ে পড়ল। শুয়ে দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরল। অভ্যেসে খাট বলে অজয়, আসলে এক জনের শোওয়ার মতো তক্তপোশ। তবে গদি এবং তোষকে বেশ আরামপ্রদ। বাথরুমে ঢুকে পোশাক পাল্টাল সে। চুল মুছল। বেশ শীত-শীত করছে। এ রকম রাতে দু'পেগ পেটে না গেলে....।

মদ্যপানের অভ্যেসটা করিয়েছিল জিতেনদা, জিতেন মণ্ডল। যার কাছে গাড়ি চালাতে শিখেছিল অজয়। বলেছিল, 'রাতে শোওয়ার আগে এক কী দুই পেগ গলায় ঢালবি। কখনওই তার বেশি নয়। দেখবি বেশ চাঙ্গা লাগছে। আর খবরদার, কোনও ঠেকে গিয়ে পাঁচ মাতালের সঙ্গে ভিড়বি না। তা হলে সব গোল্লায় যাবে। নিজের ঘরে বসে কোনও কাজ করতে করতে একা খাবি। এই বলে দিলাম।'

প্রথম প্রথম আধ পেগ খেতেই বিশ্রী লাগত। কিন্তু কখনওই সে জিতেনদার উপদেশ অমান্য করেনি। জিতেনদা পঁয়ষট্টি বছরেও এক শিফ্‌ট চালাচ্ছে। আর যারা ঠেকে যায়, তারা চল্লিশ পার হতে না হতেই ছবি হয়ে যায়।

ডিমের ডালনা আর ভাত। ভাতটাকে আগে বসিয়ে দিয়ে আলু কাটার আগে গ্লাসে এক পেগ ঢালতে গিয়ে মনে হল একটু বেশি পড়ে গেছে। আজকাল বোতলের মুখগুলো এমনভাবে আটকে দেয় যে, বাড়তি মদ ভেতরে ঢোকানো যায় না। পুরো জল ঢেলে আলু কেটে নিল অজয় মাঝে মাঝে চুমুক দিয়ে। বৃষ্টির শব্দ একটুও কমছে না। এই ঘরে বহু দিনই সে একা থাকছে। আজ যে মেয়েটা এল তাতেও তার মনে হচ্ছে পরিস্থিতি অন্য রাতের মতোই থেকে গেছে।

ভাত হয়ে গেল। ডিমের ডালনা চাপিয়ে দ্বিতীয় পেগ ঢালল অজয়। তার পর মুখ ফিরিয়ে দেখল অঞ্জনা কাটা কলাগাছের মতো পড়ে আছে। অচেনা, অজানা

বিছানায় যখন কোনও মেয়ে ওই ভাবে ঘুমায়, তখন বোঝাই যাচ্ছে ওর ভেতরে এই মুহূর্তে কোনও প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই।

ডিমের ডালনা নামিয়ে গ্লাসটা শেষ করতেই মনে হল একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেল। তখনই কানে এল, 'ওয়েল, আর একটা গ্লাস আনো।'

পুরুষকণ্ঠ কানে আসতেই অজয় চমকে বাঁ দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। নীচে বসে থাকায় মনে হচ্ছে লোকটা বেশ লম্বা, কেতাদুরস্ত কোটপ্যান্ট পরা, মুখে দাড়ি।

সে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। 'কে আপনি? কী ভাবে এই ঘরে ঢুকলেন?'

'অবান্তর প্রশ্ন। তুমি আর একটা গ্লাস বের করে তাতে মদ ঢালো। হ্যাঁ, একটুও জল মেশাবে না। বাঙালি যে অধঃপতনে গিয়েছে, তা মদ খাওয়ার ধরন দেখলেই বোঝা যায়। তোমরা মদ খাও না জল? ছিঃ ছিঃ।'

'আপনি কে?'

'আঃ, বিরক্ত কোরো না। হ্যাঁ, দ্বিতীয় গ্লাসটা আমার জন্যে। কিন্তু সেটা আমার হয়ে তুমি খাবে। আমি দেখব।'

'কেন?'

'ইডিয়ট। আমরা এখন ও-সবের ঊর্ধ্বে।' হতাশ গলায় কথা বলল মানুষটা। 'বেঁচে থাকতেই তো প্রায় ছেড়ে দিতে হচ্ছিল ওই ব্যাটা পণ্ডিত টাকা বন্ধ করে দেওয়ায়। দেখলাম, তোমাকে খুব জ্ঞান দিয়ে গেল। পুরনো অভ্যেস। কই ঢালছ না কেন?' তার পর গুনগুন করল, 'ঢালো, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তা হলে ঢেলে দাও।'

।। তিন ।।

দুটো গ্লাসে টলটল করছে নেশা, বলছে, আকণ্ঠ গ্রহণ করো আমাকে। দীর্ঘকায় মানুষটি যদিও দাঁড়িয়ে কিন্তু তাঁর দু'চোখে সাহারার তৃষ্ণা। কয়েক পলক পরে তাঁর ঠোঁটে হাসি ফুটল। বললেন, 'আর!'

অজয় খুব অবাক গলায় বলল, 'ও রকম আওয়াজ করলেন কেন?'

পায়চারির ভঙ্গিতে খানিকটা ঘুরে এসে বললেন, 'দ্বিতীয় পাত্রটি তোমার, খবরদার প্রথম পাত্রটিতে আঙুল ছোঁয়াবে না, ওটা আমি গ্রহণ করেছি। তোলো, হাঁ করে দেখছ কী?

সম্মোহিতের মতো অজয় দ্বিতীয় পাত্রটি তুলে ঈষৎ চুমুক দিল। আজ হচ্ছেটা কী! অনেক্ষণ পেট খালি থাকলে বায়ু জন্মায়, সেই বায়ুর প্রকোপে কি এমন উল্টোপাল্টা দৃশ্য দেখতে হয়? তখনই মানুষটি দ্বিতীয় বার তৃপ্তির আওয়াজ করলেন, 'আঃ!'

অজয় মাথা নাড়ল, 'গ্লাসে চুমুক না দিয়ে ও রকম আওয়াজ কেন করছেন? আমাকে ঢালতে বললেন অথচ নষ্ট করছেন। হুইস্কির দাম কী অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে তার খবর রাখেন?'

'মূর্খ! কথাটা দেখছি কানে যায়নি! ঘ্রাণেই অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায়। পুরো খাওয়ার যখন উপায় নেই তখন পণ্ডিতদের মতো অর্ধেকেই সন্তুষ্ট না হয়ে উপায় কী! আর শোনো, দাম নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।' বিড়বিড় করলেন তিনি, 'আমি কি ডরাই ভাই ভিখিরি রাঘবে?'

এবার উত্তেজিত হয়ে অনেকটা পান করে অজয় বলল, 'আপনাকে আমি—।'

থামিয়ে দিলেন তিনি, 'এতক্ষণে চৈতন্য পেলে বাবা! যাক গে, আজ তোমার সঙ্গে ওই পণ্ডিতের দেখা হয়েছিল। অথচ সে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কী জ্ঞান দিয়ে গেল সে?'

'ও, আপনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা বলছেন? উনি জ্ঞান দেবেন কেন? আমার প্রশংসা করছিলেন।' অজয় বলল, 'আপনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। বসুন না!'

মাথা দোলালেন মধুসূদন, 'যদি জানত তুমি ওই ঘরে বসে প্রত্যহ পান কর তা হলে তার দর্শন পেতে না। এই দ্যাখো, যখন বেঁচে ছিল তখন যে টাকা চেয়েছে তাকেই সাহায্য করেছে। স্বীকার করছি আমাকেও বাঁচিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল আমি চাল ডাল দুধ না কিনে ওর টাকায় পানীয় কিনে খাচ্ছি। যখন তখন টাকা ধার চাইছি। ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এড়াতে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াল। আরে আর যাদের সাহায্য করেছে তাদের আমার মতো লেখার ক্ষমতা ছিল কি? সেই যে পালিয়ে বেড়ানো শুরু করেছিল তা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। যাক গে! তা এই যে মেয়েটিকে ঘরে এনে তুললে, এটাও নিশ্চয়ই তার পরামর্শে?'

'হ্যাঁ, মানে—!'

'বোঝ! এখন কী করবে? এই মেয়ের ইতিবৃত্ত তোমার জানা নেই। ভাল বংশের না খারাপ পাড়ার মেয়ে তা কি তুমি জানো?'

'আজ্ঞে, জানার সুযোগ পাইনি।'

'তবে! এই মেয়ে যদি কাল পাড়ার মানুষদের ডেকে কেঁদে বলে তুমি ওর বেইজ্জত করেছ তখন তোমার কী হবে? বিয়ে করতে পারবে?'

'সে কী!'

'তখন সবাই জোর করে তোমাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাবে। ওই বামনে বুড়োর পরামর্শ শুনলে তো এই পরিণতি হবেই।'

'কিন্তু এই বেচারা বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় যে ভাবে পড়েছিল, না তুললে মরেই যেত!'

'বাহবা। তা হলে জে.ব চার্নক যা করেছিল তাই বুক ফুলিয়ে কর। নিজেই বিয়ে করে ওকে সারা জীবনের জন্যে বাঁচিয়ে রাখ। মারিয়াকে যেমন জোব চার্নক রেখেছিলেন।'

এই সময় খাটের ওপর থেকে অস্ফুট আওয়াজ ভেসে এল। অজয় তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল অঞ্জনা ধীরে ধীরে পাশ ফিরছে। সে নীচের গ্লাস দুটোর দিকে তাকাল। তার পর মনে হল, তার নিজের ঘরে সে যা ইচ্ছে করতে পারে। রোজকার রুটিন কেন এই মেয়েটিকে দেখে পাল্টাবে।

সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল অজয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন এসেছিলেন তেমনই মিলিয়ে গিয়েছেন। মানুষটির ছবি দেখেছিল সে। জীবনীও পড়েছিল পাঠ্যবইতে। ওঁর লেখা কোনও বই তার পড়া হয়নি। আজ সামনে পেয়েও তাই ওঁর বই নিয়ে কোনও কথা বলতে পারেনি সে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই ওঁকে এড়াতে এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এই খবরটা কেমন অভিনব লাগছে। সে পড়েছিল, বিদ্যাসাগর মশাই মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এই সময়ে অঞ্জনা বিছানায় উঠে বসল। বসে দুই হাতে মাথা চেপে ধরল কিছুটা সময়। তার পর তাকাল, 'আমি কোথায়?'

অজয় মাথা নাড়ল। বলল, 'এখন কিছু বললে আপনি কি মনে রাখতে পারবেন?'

অঞ্জনা তাকাল। বোঝাই যাচ্ছিল সে বিভ্রান্ত।

'আপনাকে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে গাড়িতে তুলে আমি ফেঁসে গিয়েছি। রাস্তার কোনও জায়গায় নামিয়ে দিলে পাবলিক প্যাঁদাত। হাসপাতালে নিয়ে গেলে পুলিশ ধরত। বিদ্যাসাগর মশাই যেচে পরামর্শ দিলেন বাড়িতে নিয়ে আসতে। আনার পর আপনি মড়ার মতো ঘুমালেন। বৃষ্টি এখনও থামেনি। এত রাত্রে কোনও গাড়ি বা বাস পাবেন না। কী করবেন?'

অঞ্জনা কেঁদে ফেলল।

'এই দেখুন, কেঁদেটেদে কোনও লাভ নেই। ভাগ্যিস বৃষ্টি হচ্ছে নইলে এত রাত্রে আমার ঘরে মেয়ের গলায় কান্না কেন জানতে পাবলিক ভিড় করে আসত। আমার রান্না হয়ে গেছে। ডিমের ঝোল, ভাত। লাস্ট কখন খেয়েছেন?'

অঞ্জনা কান্না থামাল কিন্তু জবাব দিল না।

'আমি খাব আর আপনি অভুক্ত থাকবেন এটা হতে পারে না। যান, মুখ ধুয়ে আসুন। আমি খাবার দিচ্ছি।'

অঞ্জনা তবু নড়ছে না দেখে অজয় রেগে গেল। বেশ জোরে ধমক দিল সে, 'যান। নামুন খাট থেকে। নামুন!'

এ বার অঞ্জনা পুতুলের মতো নেমে এল। চলে গেল মুখ ধুতে।

দ্বিতীয় গ্লাসের বাকিটা গলায় ঢেলে দিল অজয়। প্রথম গ্লাসটা ভর্তি রয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের আত্মা ওটার ঘ্রাণ পান করেছে। আত্মার এঁটো খাওয়া কি উচিত হবে? ইচ্ছের বিরুদ্ধে জানলার পাল্লা খুলে গ্লাসের পানীয় বাইরে ফেলে দেওয়ার সময় বৃষ্টির জলে হাত ভিজে গেল। খুব আফসোস হচ্ছিল অজয়ের। ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের পয়সায় পান করত, এখন দাম দিয়ে কিনতে হলে মজা মাথায় উঠত।

দুটে থালায় খাবার সাজিয়ে তার খেয়াল হল, ঘরে একটাই আসন আছে। দ্বিতীয় মানুষের জন্য আসন রাখার প্রয়োজন হয়নি এত দিন। কিন্তু অতিথি বলে কথা। অঞ্জনার জন্য আসনটি খানিকটা দূরে পেতে থালাটা সামনে রাখতেই সে এল।

'বসুন। মেঝেতে বসে খেতে হবে।'

অঞ্জনা বসল।

'রান্না ভাল হওয়ার কথা নয়। যতটা পারবেন খেয়ে নিন।'

'আমার—আমার খেতে ইচ্ছে করছে না!' করুণ গলায় বলল অঞ্জনা।

'অনেকেরই অনেক কিছু ইচ্ছে করে না। এই যে আপনাকে এই ঘরে এনেছি তা কি ইচ্ছে করে? পুলিশের ভয়ে আর গ্যাস খেয়ে।'

'গ্যাস?'

'বললাম না, বিদ্যাসাগর মশাই এমন গ্যাস দিলেন, খেয়ে নিন।'

'বিদ্যাসাগর? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর?'

'নামটা দেখছি জানা আছে। হ্যাঁ, তিনিই।'

এ বার আচমকা হেসে ফেলল অঞ্জনা।

'হাসলেন কেন?'

'না। খাচ্ছি, আমি খাচ্ছি।'

খেতে খেতে অঞ্জনা যে তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে তা টের পেল অজয়। সে কোনও কথা না বলে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। থালা গ্লাস ধুয়ে আনার পর দেখল অঞ্জনা নিজের থালা গ্লাস ধুতে যাচ্ছে।

অঞ্জনা ফিরে এলে অজয় বলল, 'এ বার শুয়ে পড়ুন। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেই দেখবেন ভোর হয়ে যাবে। কিন্তু ভোরেই বেরিয়ে যাবেন। এ পাড়ার লোকজন একটু বেলা করে ওঠে। কারও প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না আপনাকে।'

'আপনি? সরি, আমি ওখানে শুতে পারব না।'

'কী করবেন?'

'জেগে থাকব।'

অজয় হতাশ গলায় বলল, 'আপনি কি এখনও এই ঘরে আছেন?'

কেউ কোনও সাড়া দিল না। অঞ্জনা আরও অবাক হয়ে অজয়ের মুখের দিকে তাকাল। অজয় তখন ঊর্ধ্বমুখী। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?'

'মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম শুনেছেন?' অজয় তাকাল।

'যিনি মেঘনাদবধ কাব্য লিখেছিলেন?'

'পড়েছেন?'

'না।'

'বাঁচা গেল। আসলে দু'জনে একই নৌকায় ভাসছি। একটু আগে ভদ্রলোক এখানে এসে প্রচুর জ্ঞান দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছেন। আমার কথা তিনি শুনছেন কিনা জানি না, শুনলেও আমার কিছু করার নেই। বলেই অজয় চেঁচাল, 'জোব চার্নকের আমল বহু বছর আগে চলে গেছে স্যার। এখন কেউ মারিয়া হতে রাজি নয়। এ মেয়ে কাপড়ের পুঁটুলি নয়, যে যা ইচ্ছে তাই করানো যাবে।'

অঞ্জনা খাটের প্রান্তে বসল, 'আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে? কী ভাট বকছেন? তখন বললেন বিদ্যাসাগর এমন গ্যাস দিয়েছেন, এখন মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে কথা বলছেন! আমার খুব ভয় করছে।'

'ভয়? কেন? আমাকে অ্যাবনর্মাল লাগছে?'

'নর্মাল লোক তো এই সব বলে না। এঁরা কত কাল আগে মরে গেছেন।'

'মরে যাওয়া মানেই কি সব ফিনিশ হয়ে যাওয়া? আমি যখন ট্যাক্সি নিয়ে কলেজ স্কোয়ারের সামনে দিয়ে যাই তখন মূর্তিটাকে দেখতে পাই আর ভাবি, ভাগ্যিস উনি বর্ণপরিচয় লিখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা আমার কাছে বেঁচে ওঠেন। যাকগে, আপনি বসে থাকুন, আমি ঘুমাচ্ছি। সারা দিন খেটেছি, খুব টায়ার্ড। অজয় মেঝেতে এক ধারে বিছানা করে শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করেই সে হেসে ফেলল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বললেন, জোব চার্নকের মতো ওকে বিয়ে করে ফেলতে। প্রস্তাবটা এখন দিলে হয়তো এই মাঝরাত্তিরেই জল ভেঙে বেরিয়ে যাবে। সে কালে যা চলত, এখন তা চলে না।

ঘুম ভাঙতে দেরি হল। ভাঙার পর চোখ বন্ধ করা অবস্থায় মনে পড়ল গাড়িটা গাড়ির সামনে ঠিকঠাক আছে তো? তড়াক করে উঠে দরজার কাছে গিয়ে দেখল, সেটা ভেজানো। ছিটকিনি খোলা। তখনই অঞ্জনার কথা মনে পড়ায় সে খাটের দিকে তাকিয়ে দেখল, চাদরটা টানটান পাতা। বাথরুমে গিয়ে দেখল, সেখানেও অঞ্জনা নেই। যা বাবা! সে চলে যাবে বলেছিল, কিন্তু যাওয়ার আগে বলে যাওয়ার ভদ্রতাটাও দেখাতে পারল না।

অজয় বাইরে বেরিয়ে দেখল, গাড়িটা আস্ত আছে। লক ভাঙেনি কেউ। চাকাও

খুলে নিয়ে যায়নি। আঃ। কী আরাম। সে ঘরে ফিরে মালিককে জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি এখন গ্যারেজে নিয়ে যাবে না সন্ধের পর গেলেই চলবে!'

মালিক খিঁচিয়ে উঠল, 'নিয়ে আসবে মানে? সমস্ত হাঁটুর উপর জল হয়ে আছে। কোথায় থাকো তুমি যে জানো না, আকাশের ডায়াবেটিস হয়েছে!'

হাতমুখ ধুয়ে চায়ের জল বসিয়ে দিল অজয়। আজ কেলো হবে। কলকাতার অনেক রাস্তায় যদি জল জমে থাকে, তা হলে খুব ভুগতে হবে। প্যাসেঞ্জারগুলো গাড়িতে ওঠার আগে বৈষ্ণব থাকে, মিটার ডাউন করলে তান্ত্রিক হয়ে যায়।

দরজায় শব্দ হতেই পেছনে তাকাল। অঞ্জনা ভেতরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেশ অপরাধীর গলায় বলল, 'যেতে পারলাম না। বাস চলছে না। আবার জোরে বৃষ্টি আসছে। আমি বুঝতে পারছি না কী করব।'

'চা বানাচ্ছি। চা খান।'

'আপনি সরুন, আমি বানাচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে সরে দাঁড়াল অজয়। আর তখনই তার মনে হল, ঘরে একটাও বিস্কুট নেই। শার্টটা চাপিয়ে, 'আসছি' বলে বেরিয়ে পড়ল। মুদির দোকানের ঝাঁপ খোলেনি। আশপাশের দোকানও বন্ধ। চার ধার ভিজে স্যাঁতসেতে হয়ে আছে। এই সময় ঝেঁপে বৃষ্টি আসতেই সে দ্রুত একটা বন্ধ দোকানের লম্বা শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে বৃষ্টির জল থেকে বাঁচতে একজন চলে এল।

বৃষ্টি দেখতে দেখতে ছটফট করছিল অজয়। হঠাৎ খুব পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল, 'ভাই অজু, এটা তুমি কী করছ? অচেনা মেয়েমানুষকে ঘরে তুলেছ?' চমকে পাশে তাকাতেই অজয় বৃদ্ধের কাতর মুখ দেখতে পেয়ে বলে ফেলল, 'আপনি!'

।। চার ।।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'এ ভাবে আমাদের বংশের মুখে চুনকালি মাখালে বাবা!'

'এ সব কী বলছেন দাদু!' অজয় প্রায় আর্তনাদ করল।

'মিথ্যে কিছু বলিনি। ভরা যৌবনের যুবতী নারীকে রাস্তা থেকে তুলে ঘরে এনে রাত কাটালে; তোমার বাবা-মা শুনলে কী হবে এক বার ভেবেছ?' বৃদ্ধ বলল।

'বিশ্বাস করুন, আমি আনতে চাইনি। ওই বিদ্যাসাগর মশাই এমন ভাবে বললেন যে অমান্য করতে পারিনি।' অজয় বলল।

'তাঁরা বড় মানুষ, তাঁদের কথা শুনলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চলে? তাঁর কথা শুনে যদি আমি তোমার বাপের বিয়ে একটা বেধবার সঙ্গে দিতাম, তা হলে সে কি মেনে নিত? আমাদের গাঁয়ের জগদীশ করণের মেয়ে বিয়ের ছয়

মাসের মধ্যে বেধবা হয়েছে। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। তার সঙ্গে যদি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করা হয়, তুমি রাজি হবে?'

ধক করে উঠল বুকের ভেতরটা। জগদীশ করণের মেয়ে সুলেখা, দু'বছর আগে গাঁয়ে যখন গিয়েছিল সে তখন এক নির্জন সন্ধ্যায় অজয়কে বলেছিল, 'তুমি তো আমার দিকে কখনও তাকাওনি, কিন্তু আমি তোমাকে ধূপের মতো ভালবেসে এসেছি। আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। যদি বিয়ে হয়ে যায় তা হলে জানব আমার দ্বিতীয় বার বিয়ে হচ্ছে।' অজয় কিছু বলতে পারেনি। সুলেখার বিয়ের খবরটা পেয়ে চার পেগ পান করেছিল।

এখন বলল, 'আপনি যখন সব জানেন, তখন এটাও জেনেছেন আমরা এক ঘরে থাকলেও কেউ কাউকে স্পর্শ করিনি। তা ছাড়া এই মেয়ে তো ঠাকুমার মতো কেঁচো নয়, কেউটে সাপ। ছুঁতে গেলে ছোবল মারবে। কী? জানেন না?'

'তা জানি! বললে যখন তখন বলি কেঁচোর সঙ্গে ঘর করা যায়, কেউটের সঙ্গে তো যায় না। যত তাড়াতাড়ি পারো বিদায় করো।' বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন।

বৃষ্টিটা কমে এল তখনই। মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে গিয়ে হতাশ হল অজয়। ঠাকুর্দা নেই। যে ঠাকুর্দা আজ থেকে আট বছর আগে তালপুকুরে স্নান করতে গিয়ে হৃদরোগে মারা গিয়েছিলেন তিনি কোত্থেকে আজ এখানে চলে এলেন? গাঁয়ে গেলেই বাবা বলেন, 'এক বার গয়ায় যা অজু, বাবার পিণ্ডদান করে আয়।' অর্থাৎ পিণ্ড না দিলে ঠাকুর্দার মুক্তি হবে না। এই চরাচরে অদৃশ্য হয়ে মিশে থাকবে। তা হলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিণ্ড কেউ গয়ায় গিয়ে দেয়নি? কী জানি! মাইকেল মধুসূদন দত্ত তো খ্রিস্টান ছিলেন। গয়াতে পিণ্ড দানের বালাই ছিল না। কিন্তু এতটা কাল এঁরা কেউ তাকে দেখা দেয়নি। কথা বলেনি। এই মেয়েকে উপকার করতে যাওয়ার পরই এই সব দর্শন পাওয়া যাচ্ছে কেন? টিপটিপে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সে ঘরে ফিরে এল।

তাকে দেখে মেয়েটি বলল, 'চা বানিয়েছিলাম, সেটা জল হয়ে গিয়েছে। আবার বসাচ্ছি!' তাকে সক্রিয় হতে দেখে অজয় প্রশ্নটা না করে পারল না, 'খোলাখুলি বলো তো, তুমি কে?'

'কেন? আমাকে কি মানুষ বলে মনে হচ্ছে না?' মেয়েটি হাসল।

'তোমাকে গাড়িতে বসে বৃষ্টিতে হাঁটতে দেখলাম। পাগলের মতো হাঁটছ। তার পর আমার গাড়িতে ধাক্কা না লাগা সত্ত্বেও মাটিতে পড়ে গেলে। এমনি এমনি কেউ অজ্ঞান হয় নাকি?'

মেয়েটি জবাব দিল না। ফুটন্ত জলে চা ছাড়ল।

'আমি দয়া করে যেই তোমাকে গাড়িতে তুললাম, অমনি মরে যাওয়া মানুষগুলো এসে আমাকে উপদেশ দিতে লাগল! এটা হল কেন?'

চা গুলতে গুলতে মেয়েটি বলল, 'মায়ের কাছে শুনতাম, এঁটো জামাকাপড় পড়ে শুলে নাকি খারাপ স্বপ্ন দেখে। ভূতপেত্নিরা চলে আসে। কাল দুপুরে যখন খেয়েছিলেন তখন নিশ্চয়ই জামাপ্যান্টে মুখের এঁটো পড়েছিল।'

অজয় কথা বলল না আর।

চা খেয়ে সে ঘড়ি দেখল। যে সব রাস্তায় জল নেই, সেই সব রাস্তায় ট্রাই করলে হয়।

সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়িতে চিন্তা করছে না?'

চায়ের কাপ-ডিশ ধুয়ে আনছিল মেয়েটি, বলল, 'এক জনই চিন্তা করবে। কিন্তু আমি তাকে খবর দেব কী করে?'

'মোবাইল ফোন নেই?'

'পাশের বাড়িতে আছে।'

নিজের মোবাইল ফোন বের করে বিছানার ওপর রাখতেই বাইরে চিৎকার শোনা গেল। কেউ এক জন তার নাম ধরে ডাকছে। অজয় দ্রুত দরজার বাইরে মুখ বাড়াতেই দেখল পাড়ার চার জন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। এক জন বলল, 'আমার মায়ের বোধ হয় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আপনার ট্যাক্সি তো এখানেই, প্লিজ মাকে নিয়ে হাসপাতালে চলুন।'

'এক মিনিট আসছি।'

দরজা ভেজিয়ে অজয় বলল, 'আমাকে পেশেন্ট নিয়ে হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। আপনি চটপট ফোন করে নিন।' সে বাথরুমে ঢুকল প্যান্ট নিয়ে।

সেটা পরে বেরিয়ে এসে শার্ট গলাল, 'ফোন পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'দিন ওটা। বৃষ্টি ধরলে যখন ইচ্ছা চলে যাবেন। কখন ফিরব জানি না।'

'যদি সব চুরি করে নিয়ে যাই।'

'পোষাবে না আপনার।'

পেশেন্ট তুলে হাসপাতালে পৌঁছতে যথেষ্ট বেগ পোহাতে হল। জল জমে আছে খুব। তার ওপর বৃষ্টি শুরু হয়েছে নতুন করে। দু'দুবার সাইলেন্সার পাইপে জল ঢুকতে ঢুকতেও ঢোকেনি। মহিলাকে হাসপাতালের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার পর সে দেখল যারা সঙ্গে এসেছিল, তারা সবাই সঙ্গে গিয়েছে। ভাড়া পেতে হলে ওদের জন্য অপেক্ষা না করে উপায় নেই। হঠাৎ অজয়ের মনে হল, মহিলা পাড়ার একটি ছেলের মা। এই বিপদের সময় ভাড়া চাওয়াটা খুব অশোভন হবে। সে একটু ভেতরে ঢুকে খোঁজাখুজি করতেই দলের এক জনকে পেয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কি গাড়ির দরকার হবে?'

'না। থ্যাঙ্ক ইউ দাদা।'

'তা হলে চলি।'

'আপনার মিটারে কত উঠেছে।'

'দুর! উনি ভাল হয়ে উঠুন তাই চাই।'

বলতে ভাল লাগল অজয়ের।

সে গাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। একটি বেশ রোগা যুবক বসে আছে। মুখে ক'দিনের না-কামানো দাড়ি। গাল ভাঙা। চোখ দু'টি খুব উজ্জ্বল। দেখেই বোঝা যায় আদৌ সুস্থ নয় যুবক।

অজয় জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন?'

'আমি!'

'নেমে পড়ুন ভাই। এই জলে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।'

যুবক খুব ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমি তো কোথাও যেতে চাই না।'

'তা হলে গাড়িতে উঠেছেন কেন?'

'যদি বলেন তা হলে নেমে যাব।' শ্বাস টানল যুবক।

'আপনি দেখছি বেশ অসুস্থ। ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'ওটা সাতচল্লিশ সালের উনত্রিশ বৈশাখেই শেষ হয়ে গিয়েছে।'

অজয় থতমত খেয়ে গেল। ছেলেটা চৌষট্টি বছর আগেকার কথা বলছে। কিন্তু ওর বয়স তো একুশ বছরের বেশি নয়।

'তুমি কে?'

'আমি? আপনি কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেছেন? মানিকদা অনুগ্রহ করে আমার কথা লিখেছিলেন। আমার মতো সাধারণকেও সম্মানিত করেছিলেন। শুনুন তবে, আমরা রোদ এনে দেব ছেলেটার গায়ে,/আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট।/কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।/বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে /ঘাতকের মিথ্যা আকাশ?/ কে গাইবে জয়গান?/বসন্তে কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলবে/ সে কীসের বসন্ত?'

অজয়ের গলায় বাষ্প জমল। জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখানে কেন?'

যুবক ম্লান হাসল, 'যাদবপুরের যক্ষ্মা হাসপাতালের মেরি হার্বার্ট ব্লকে একটি লোক জমাদারের চাকরি করত। সুভাষদারা আমাকে সেখানেই ভর্তি করেছিল চিকিৎসার জন্য। সেখানে ওই লোকটির ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন বন্ধুরা, যাতে সে আমাকে দেখাশোনা করে। আটাশে বৈশাখ রাতে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলাম। ময়লার মধ্যে পড়ে ছিলাম ঘণ্টা দুয়েক। সে আসেনি। অন্য রোগীরা জেগে উঠে আমাকে দেখে বিছানায় তুলে দিয়েছিলেন। পরের দিন আমি চলে এলাম। সেই জমাদারের চাকরি করা লোকটির তো পৃথিবীতে থাকার কথা নয়। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে হাসপাতালগুলোতে এসে দেখি ওই রকম

মুখের মানুষ এখনও এ সব জায়গায় কাজ করে কি না। কাকে খুঁজব? এখনকার সব মুখই তো ওই মানুষটির মতো হয়ে গিয়েছে। জানেন ভাই, এখনও আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন বেজে যায়। হায়, পৃথিবীর কোনও জঞ্জালই আমি সরাতে পারিনি। আমরাও নয়।' যুবক শ্বাস ফেলল, তার পর বলল, 'ভাল থাকার চেষ্টা করুন ভাই।'

অজয় মাথা নাড়ল। গলায় জমা বাষ্প যেন চোখে উঠে আসছে। সে গাড়ির দরজা খুলে আয়নায় চোখ রাখতেই দেখল পেছনে কেউ নেই। সে ঘুরে দেখল, সিট ফাঁকা।

এ সব কেন হচ্ছে। স্কুলে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা বলে প্রাইজ পেয়েছিল সে। এই হাসপাতালে সে অনেক বার রোগী নিয়ে এসেছে, কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। আজই সেই কবে চলে যাওয়া মানুষটি তার সঙ্গে কথা বলে গেলেন। অজয় এখন সিদ্ধান্তে স্থির হল, ওই মেয়েটি আসার পরেই এই সব ঘটনা তার জীবনে ঘটে চলেছে।

মিটারে লাল কাপড় জড়িয়ে সে মালিকের গ্যারাজের উদ্দেশে রওনা হল। পথে অনেক হাত উঠছিল থামবার জন্যে, কিন্তু মন শক্ত রাখল সে। জল ভেঙে ভেঙে গাড়ি কোনও মতে গ্যারাজে ঢুকিয়ে মালিকের হাতে চাবি তুলে দিল। মালিক জিজ্ঞাসা করল, 'ফিরবে কী করে?'

'হেঁটে।' অজয় বেরিয়ে পড়ল।

অতটা রাস্তা হাঁটার অভ্যেস ইদানীং অজয়ের ছিল না। গ্রামে থাকতে যা অস্বাভাবিক মনে হত না, আজ তা হল। দুটো পায়ে যেন ভার বাড়ছে। বাড়ি ফিরে ভেজানো দরজা খুলে তাকে দেখতে পেল না। আবার কোথায় গেল ভাবতেই খাটের ওপর বই চাপা দেওয়া কাগজটাকে দেখতে পেল।

কোনও সম্বোধন নেই, মেয়েটি লিখেছে, 'বৃষ্টি ধরে গিয়েছে। মনে হচ্ছে চেষ্টা করলে চলে যেতে পারব। গত কাল থেকে আপনি যে উপকার করেছেন, তার জন্যে আমি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব। কোনও কোনও পুরুষ মানুষ যে আলাদা রকমের হয় তা আপনার জন্যে বুঝতে পারলাম। যদি কখনও এ দিকে আসি তা হলে দেখা করে যাব। আমি জানি, আপনি বিরক্ত হবেন না।' চিঠির শেষে কোনও নাম বা ঠিকানা নেই।

হঠাৎ কী রকম ফাঁকা লাগল অজয়ের। ঠাকুর্দা মেয়েটিকে তাড়াতে বলে গেলেন। অথচ ও নিজেই চলে গেল। একটা রাত সে ছিল এই ঘরে। বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটিয়েছে। কিন্তু তবু যেন ভরে ছিল এই ঘর। চিঠিটা দ্বিতীয় বার পড়ল সে। খুব আন্তরিকতায় ভরা। অথচ নিজের ঠিকানাটা লিখল না কেন? ও কি ভয় পেল? ঠিকানা লিখলে অজয় সেখানে গিয়ে হাজির হবে?

সারাটা দিন বেকার গেল। বৃষ্টি আসছে, চলে যাচ্ছে। এক দিনের রোজগার ভাঁড়মে গেল। বেলা দুটোর সময় সে যখন দিবানিদ্রার চেষ্টা করছে, তখন দরজায় শব্দ হল। প্রায় লাফিয়ে নীচে নেমে দরজা খুলতেই দেখল একটা পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনি অজয়? ট্যাক্সি ড্রাইভার?'

'হ্যা।' বেশ অবাক হল সে।

'বড়বাবু ডাকছেন, থানায় চলুন।'

দরজায় তালা দিয়ে পুলিশের গাড়িতে চেপে থানায় গেল অজয়। বড়বাবু লোকটি খুব রোগা, নিরীহ দেখতে। বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় সল্ট লেকে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'দেখুন তো, এই ছবির লোক দুটোকে চেনেন কি না!'

ছবিটা দেখল। ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ-স্যার। এরা কাল আমার গাড়ি আটকাতে চাইছিল। মাতাল বলে গাড়ি থামাইনি।'

'লোক দুটো কমপ্লেন করেছে আপনি ওদের চাপা দিতে চেয়েছিলেন। নম্বরটা ওরাই বলেছে। কিন্তু আমরা খবর নিয়ে জানলাম ওরা মেয়েমানুষকে গাড়িতে তুলে ফুর্তি করতে চেয়েছিল। সেই মেয়েটা পালিয়ে আপনার গাড়িতে ওঠে। চাপ দিতে ওরা কথাটা স্বীকার করেছে। সেই মেয়েটা কোথায়?'

'বাইপাসে নেমে গিয়েছিল। কোথায় বাড়ি জানি না।' ঝট করে অর্ধসত্য বলল অজয়।

'এ রকম উটকো মেয়েকে গাড়িতে তুলবেন না।'

'না স্যর, আর তুলব না।'

'যদি কেস ওঠে তাহলে খবর দেব। সাক্ষী দিতে হবে।'

'ঠিক আছে স্যর। যখনই বলবেন চলে আসব।'

বাড়িতে ফিরে অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থাকল অজয়। লোক দুটো গায়ের জ্বালা মেটাতে মিথ্যে বলে ফেঁসে গিয়েছে। কিন্তু মেয়েটা কি সব সত্যি বলেছে। হঠাৎ মনে পড়ল, মেয়েটা তার মোবাইল থেকে পাশের বাড়িতে ফোন করেছিল। সে ঝট করে পকেট থেকে মোবাইল বের করল।

।। পাঁচ ।।

নম্বরটা বের করতে কয়েক সেকেন্ড লাগল। টিপতেই রিং শুনতে পেল অজয়। তার পর গলা ভেসে এল, 'হ্যালো! কাকে চাই?'

'নমস্কার। আমি কলকাতা থেকে বলছি। যদি কিছু মনে না করেন তা হলে অঞ্জনাকে ডেকে দেবেন? ও বোধ হয় আপনাদের পাশের বাড়িতে থাকে।' অজয় সবিনয়ে বলল।

কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে যিনি ফোন ধরেছিলেন, বললেন, 'ধরুন, দেখছি!'

এক দুই করে প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল। অজয়ের সন্দেহ হল লাইন চালু আছে কি না। তার পরেই এক জন বয়স্কার গলা কানে এল, 'হ্যালো।'

'নমস্কার। অঞ্জনা বাড়িতে আছে?'

'আপনি কে বলছেন?' গলার স্বর বেশ সরু।

'আমার নাম অজয়। অঞ্জনা আমাকে চেনে।'

'সে তো বাড়িতে নেই।'

'ও। এলে বলবেন যার ট্যাক্সিতে সে সল্ট লেক থেকে এসেছিল, তাকে যেন একটা ফোন করে। আমার ফোন নম্বরটা লিখে রাখবেন?'

'আমার কাছে কাগজকলম নেই। আপনি পরে ওকে ফোন করবেন।'

'একটা কথা, কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

'সমস্যা! থানা থেকে লোক এসেছিল। ওকে দেখা করতে বলেছে। তাই শুনে আবার বেরিয়ে গেল। কী হয়েছে তা বললই না।'

'আচ্ছা, রাখছি।' মোবাইল ফোন অফ করল অজয়।

অজয় বুঝতেই পারছিল না ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছে। ওই লোকগুলো পুলিশের হাতে পড়েছে। পড়ে তার ট্যাক্সির নম্বর দিয়ে ঘোঁট পাকাতে চেয়েছে। নম্বর পেয়ে পুলিশ নিশ্চয়ই গ্যারাজে খোঁজ করে তার কথা জানতে পেরেছিল, নইলে এখানে আসবে কী করে! আশ্চর্য ব্যাপার হল, গ্যারাজের মালিক তো তাকে ফোন করে কারণ জানতে চাইল না। অথচ জ্ঞান দেয়, 'আমার ট্যাক্সির ড্রাইভার যদি পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা বাধায়, তা হলে আমি হাত তুলে দেব।' সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু পুলিশ কেন খোঁজ করছে তা জানতে চাইছে না, এটা অস্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, অঞ্জনার বাড়ির ঠিকানা পুলিশ পেল কী করে? মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছিল না সে।

নিজেকে গালাগাল দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে অজয়। কী দরকার ছিল পরোপকার করার! অঞ্জনা জলে-কাদায় ডুবে পড়ে থাকত রাস্তায়। পাশ কাটিয়ে

চলে এলে এই সব ঝামেলা ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত না। সে চিৎকার করল, 'এই যে স্যর, আপনি কি ধারে-কাছে আছেন? শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? মেয়েটাকে গাড়িতে তুলেছিলাম বলে খুব পিঠ চাপড়েছিলেন। আরে আপনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আপনাকে যা করলে পাবলিক হাততালি দিয়েছে, এখন আমি করলে পুলিশের খপ্পরে পড়তে হবে। আপনি জ্ঞান না দিলে কি ওকে এই ঘরে নিয়ে আসতাম? আমি জানতাম আপনি মাইকেল মধুসূদনের দরদি বন্ধু। অথচ ওর ভয়ে যে কেটে পড়েছিলেন, তা জানতাম না। কী দরকার ছিল আমাকে পাম্প দেওয়ার। এই বাংলায় আকাশে বাতাসে যেমন মিশে ছিলেন, তেমনি থাকতে পারতেন! যত্ত সব!'

গ্যারাজের মালিকের ফোন এল অনেক পরে। পরিষ্কার কথা, 'অজয়, এখন কয়েক দিন বিশ্রাম করো। আমি অন্য লোককে গাড়ি দিচ্ছি।'

'কেন?' অজয়ের গলা শুকিয়ে এল।

'উত্তরটা তোমার জানা।' লাইন কেটে দিল লোকটা।

মেজাজ বিগড়ে গেল। কলকাতা শহরে গ্যারাজের অভাব নেই। আজ অবধি এক বারও তার বিরুদ্ধে আইন ভাঙার অপরাধে পুলিশ চিঠি পাঠায়নি। চাইলে আজই সে আর একটা ট্যাক্সি পেতে পারে। কিন্তু অজয় ঠিক করল লোকটা যখন তাকে বিশ্রাম নিতে বলল তখন তাই নেবে। গ্রামে গিয়ে দিনরাত ঘুমাবে।

সারাদিন ঘরেই কাটাল সে। বিকেলে বেরিয়ে চারশো গ্রাম খাসির মাংস কিনে এনে ঠিক করল আজ রাতে জমিয়ে খাবে। মাংস ভাল করে কষে রান্না শুরু হলে গ্লাসে মদ ঢালল অজয়। কাল গ্রামে গেলে ক'দিন মদ খাওয়া বন্ধ। আত্মীয়স্বজনরা ভাবতেই পারে না ওখানে বসে কেউ মদ খাচ্ছে।

দুটো চুমুক দেওয়ার পর সে আবার অঞ্জনাকে ফোন করল। যে সাড়া দিল সে কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'রাতে ডেকে দেওয়া সম্ভব নয়।'

যাচ্চলে! তখনই খেয়াল হল, সে কেন অঞ্জনার সঙ্গে কথা বলতে ফোন করছে? কী দরকার? ক'বার সে যেচে বাঁশ নেবে?

দ্বিতীয় গ্লাস ভরার সময় নাকে গন্ধ এল। মাংসটা বেশ বাস ছাড়ছে।

'বেশ আছ। বেড়ে আছ। চালিয়ে যাও!'

গলাটা কানে আসতেই চমকে সে দরজার দিকে তাকাল। একটা লিকলিকে লোক মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে আছে। সে ফিসফিস করল, 'আপনি কে?'

'আমি কেউ না। এক কালে মাল খেতাম। হুইস্কি, ব্রান্ডি, ওয়াইন, কিন্তু ভুলেও দিশি গলায় ঢালিনি। তোমাকে জম্পেশ করে মাল খেতে দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। খাও দেখি!'

অজয় হাসল, 'দরজা বন্ধ যখন তখন আপনি নিশ্চয়ই...!'

'হাওয়ায় মিশে থাকি। এক কালে অভিনয় করতাম। অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, কার সঙ্গে করিনি। আঃ, খাও, না!' ধমকালো লোকটা।

টুক করে এক ঢোঁক গিলল অজয়।

'আঃ!' লোকটা গেলার আওয়াজ করল।

'আপনার নামটা যদি দয়া করে বলেন?'

'এক্সট্রা।' বেশ গম্ভীর গলায় জবাব এল।

'মানে বুঝলাম না।' অজয় বলল।

'টালিগঞ্জের স্টুডিয়োতে কখনও যাওনি মনে হচ্ছে। আমি রোজ যেতাম। মুখ দেখানোর পার্ট পেলে আনন্দের সঙ্গে করতাম। আমাদের বলা হত এক্সট্রা। চাকরবাকরদের চরিত্রে চান্স পেতাম না। সে সব করতেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য, প্রীতি মজুমদার, মণি শ্রীমানী, আশু দারা। কপালে দুটো হাত ঠেকাল লোকটা, এঁরা জাত অভিনেতা ছিলেন। একটা সংলাপ, তাই সই, বলতেন, কোনও চরিত্রই ফ্যালনা নয়। আমার ভাগ্যে মাত্র দু'বার সংলাপ জুটেছিল। প্রীতিদা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এক টেকে ওকে। ডিরেক্টর হতভম্ব। বলে, 'বাঃ। পরের ছবিতে আপনাকে বড় চরিত্রে ভাবব।' আমার কপাল, তার আগেই বেচারা ছবি হয়ে গেল। আঃ, খাচ্ছ না কেন?' ধমকাল লোকটা।

তাড়াতাড়ি আর একটা চুমুক দিয়ে অজয় বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমার কাছে আপনি কী মনে করে এলেন?'

'শুনলাম মধুসূদন দত্ত নাকি এখানে এসেছিল। ওই মাপের মানুষ তো কারণ ছাড়া আসবেন না। এসে দেখলাম তুমি মাল খাচ্ছ। আহা গন্ধে বুক ভরে গেল গো। শোনো, দুটো জিনিস তোমাকে বরবাদ করে দিতে পারে। মেয়েমানুষ আর মদ। প্রথমটা আমার কাছে হার মেনেছিল। ফিল্মে অভিনয় করলেও সারা জীবন চরিত্র হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছি। কিন্তু ওই মদই লিভার পচিয়ে দিয়েছিল। তুমি বোধ হয় জানো না, মধুসূদন দত্তেরও একই কেস। কিন্তু ঠিক সময়ে যদি কন্ট্রোল করতে পারো, তা হলে কোন সমস্যাই হবে না। তা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ওই মেয়েমানুষটার সঙ্গে যখন তুমি বিদ্যেসাগরী ব্যবহার করলে তখন আর পেছনে ছুটছ কেন?'

'আপনারা সব জানতে পারেন, তাই না?'

'যে চায় সে পারে। মজাও হয়। এই ক'দিন আগে এক জন গিয়ে বিদ্যেসাগর মশাইকে নমস্কার করে বলল, 'আপনি সাঁতার জানেন?'

বিদ্যেসাগর মশাই অন্যমনস্ক হয়ে বলেছিলেন, 'না হে।' ব্যস, রটে গেল যিনি সাঁতার জানতেনই না, তিনি কী করে বর্ষাকালে ভয়ানক দামোদর পার হয়ে

গিয়েছিলেন মায়ের কাছে? আবার এক জন এসে আমায় বলল, তুমি তো একটু আধটু অভিনয় করতে, দাড়ি গোঁফ পরতে হত?

তা আমি বললাম, 'নাটক করতে গিয়ে কত পরেছি।'

সে জিজ্ঞাসা করল, 'খুলে যেত না?'

বললাম, 'যেত না আবার। পঞ্চাশ বছর আগের ব্যাপার, প্রায়ই খুলে যেত আঠা। সব সময় সতর্ক থাকতে হত।'

তা শুনে সে কী বলল জানো? বলল, 'তা হলে মুখে দাড়িগোঁফ লাগিয়ে আফগান সেজে সুভাষ বসু ট্রেনে চেপে যে ভারতবর্ষের এ ধার থেকে ও ধারে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর দাড়িগোঁফের আঠা খুলল না কেন? খুললে তো যাওয়া হত না!'

শুনে অজয় ভাবতে বসল। কলেজে পড়ার সময় সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের বর্ণনা সে পড়েছিল। ঠিক কী পড়েছিল মনে করতে চেষ্টা করছিল।

কয়েক সেকেন্ড পরে মুখ তুলে দেখল লোকটা নেই! সে গলা তুলে ডাকল, 'এক্সট্রাবাবু! আপনি কি চলে গেলেন?'

কোনও সাড়া এল না। এতক্ষণ ঘরে কেউ ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। গ্লাসের দিকে তাকাল সে। গুরু বলেছিলেন, খবরদার দুই পেগের বেশি কখনওই খাবি না। আদেশ মেনে চলেছে সে। কিন্তু অঞ্জনার পেছনে সে ছুটছে, এমন অভিযোগ কেন করল লোকটা? কৌতূহলী হয়ে সে দু'বার ফোন করেছিল, সেটাকে কি ছোটা বলে? মাংস ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ল অজয়।

সকালে উঠে চা খেয়ে স্নান সেরে সে যখন গ্রামে যাওয়ার জন্যে দরজায় তালা দিচ্ছে, তখন পুলিশটাকে দেখতে পেল। ইউনিফর্ম না পরা থাকলেও বিহারি পুলিশগুলোকে সহজেই চেনা যায়। ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে বুট জুতো পরে তার সামনে এসে বলল, 'ড্রাইভারভাই, আপনাকে এখন থানায় যেতে হবে।'

'কেন?' প্রশ্নটা বেরিয়ে এল।

'আপনি হয় যাবেন, নয় বলুন যাবেন না।'

তর্ক করে লাভ নেই। লোকটার সঙ্গে পনেরো মিনিট হেঁটে থানায় পৌঁছল সে। সকালবেলায় থানা আর বিয়ের রাতের পরের সকালের ছাদনাতলার চেহারায় বেশ মিল আছে। ঝোলা ব্যাগটাকে নিয়ে অজয়কে বসে থাকতে হল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তার পর বড়বাবু এলেন। ব্যাগ দেখেই বললেন, 'কোথায় পালানো হচ্ছে?'

'পালাচ্ছি না। দেশে যাচ্ছি।'

'নো। এখন স্টেশন ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না। বসো আসছি।'

আরও আধঘণ্টা পর বড়বাবুর ঘরে ডাক পড়ল। সেখানে যেতেই বড়বাবু

বললেন, 'তোমাকে দেখলে ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হয়। যা জিজ্ঞাসা করছি তার ঠিকঠাক জবাব দেবে।'

অজয় চুপ করে থাকল।

'মেয়েছেলেটাকে কত দিন ধরে চেন?'

'কার কথা বলছেন?'

'আঃ।'

'যে মাটিতে শুয়ে সিমপ্যাথি আদায় করে গাড়িতে উঠে বলত টাকা দিন নইলে ইজ্জত নিচ্ছেন বলে চেঁচাব? সল্ট লেকে যাকে তুলেছ সে চেঁচায়নি, কারণ তোমার চেনা মেয়েছেলে। কত দিন চেনো?' বড়বাবু চোখ বড় করলেন।

'বিশ্বাস করুন, ওকে আমি আগে কখনও দেখিনি।'

'তা হলে সে চেঁচিয়ে পাবলিক ডাকল না কেন?'

'আমি জানি না। বিদ্যাসাগর মশাই...।' বলেই থেমে গেল অজয়।

'কোন বিদ্যাসাগর? কোথায় থাকে? সে আসছে কেন এর মধ্যে?'

'আজ্ঞে, যিনি বর্ণপরিচয় লিখেছিলেন। সত্যি কথা বলতে বলেছিলেন। মানুষের উপকার করতে বলেছিলেন, বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন।'

'আর ইউ ম্যাড?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বড়বাবু।

'আজ্ঞে, না স্যর।' মাথা নাড়ল অজয়।

'তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। যদি তা করি তা হলে জেনো, শি ইজ আ কলগার্ল। ওই সল্ট লেকের মাতাল দুটো কীসের অফিস চালায় জানো?'

'না স্যর।'

'খবরের কাগজের সেকেন্ড পাতায় পত্র-মিতালির বিজ্ঞাপন দেখেছ? টাকা খরচ করে ঠকবেন না। মনের মতো বান্ধবী পাবেন। ফোন নম্বর দেওয়া থাকে বিজ্ঞাপনে। ওই লোক দুটো এই ব্যবসা শুরু করেছিল। কলগার্ল মেয়েটি দেখল নিজে খদ্দের খুঁজলে অনেক হ্যাপা, তাই ওদের ওখানে অ্যাপ্লাই করেছিল। কলকাতায় মালদার লোকজন গোপনে বন্ধুত্ব চাইলে ওরা একে কাজে লাগাবে। কমিশন নেবে। হুঁঃ।' বড়বাবু মাথা নাড়লেন।

'তা হলে সে পালাল কেন?'

'প্রথম দিন খদ্দের হাতের কাছে না থাকায় ওরা ট্রায়াল নিতে চাইছিল। মেয়েটা বিনা পারিশ্রমিকে রাজি হয়নি। তাই পালিয়েছিল। ওর অ্যাপ্লিকেশনের ঠিকানা দেখে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। সে বাড়ি ফিরেই যখন শুনেছে আমরা খোঁজ করছি, অমনি হাওয়া হয়ে গিয়েছে। অবশ্য ওই লোক দুটো ফেঁসে গেছে। অনেক শিক্ষিত ভদ্র মেয়ের নাম ঠিকানা ওদের অফিসে পাওয়া গিয়েছে। এ রকম উটকো মেয়েকে আর গাড়িতে তুলো না। মেয়েটাকে যদি কয়েক দিনের মধ্যে না পাওয়া যায়, তা হলে কেস ড্রপ করে দেওয়া হবে। অন্য মেয়েদের সাক্ষী করে কেস চলবে। কোথায় দেশ?'

'আজ্ঞে মেদিনীপুরে।'

'তাই বিদ্যাসাগরের নাম করেছিলে। যাও, ফিরে এসে দেখা কোরো।'

অজয়ের মনে হল অঞ্জনা যদি চিরকালের জন্যে হারিয়ে যায়, তা হলে তাকে আর ঝামেলায় পড়তে হবে না।

।। ছয় ।।

ধর্মতলা থেকে বাস ধরে রামনগরে নেমে অটোয় উঠতে হবে। কিন্তু ফিরে আসতে হল অজয়কে। বাসে উঠেই পকেটে হাত চেপে বুঝল মোবাইলটা নেই। পকেটমার হল? চোখ বন্ধ করে ভাবল সে। তার পর মনে হল, তাড়াহুড়োর সময় বেরোবার আগে ওটার কথা সে ভুলে যায়নি তো? এক বার মনে হল, ঘরে পড়ে থাকলে থাক। ক'দিন পরে এসে দেখবে ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে, এই তো! তাকে জরুরি ফোন করার মানুষ তো বেশি নেই। এ রকম ভাবলেও মন থেকে খচখচানিটা গেল না। সে নেমে পড়ল বাস থেকে।

দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকেই সে মোবাইল ফোনটাকে দেখতে পেল। খাটের এক পাশে পড়ে আছে। তুলে দেখল চার বার মিসড কল হয়ে গেছে। চার বারেই একই নম্বর থেকে কল এসেছিল। সে নম্বরটা টিপল। একটু পরেই যে ফোন ধরল, সে জানাল ওটা এসটিডি বুথের নম্বর। ওকে কে ফোন করেছিল তা ছেলেটি জানে না।

ঘড়ি দেখল অজয়। থানা এবং বাস থেকে ফিরে আসতে যে সময় নিয়েছে, তাতে এখন রওনা হলে গ্রামে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। দুপুরের খাওয়া কোথায় জুটবে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে ভাতে ভাত ফুটিয়ে খেয়ে বারোটা নাগাদ রওনা হলে সে সন্ধের পরেই পৌঁছে যাবে। কোনও হ্যাপা থাকবে না। জামাপ্যান্ট ছেড়ে পাজামা পরে রান্নার জন্যে কাজে হাত লাগাল অজয়, ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হল।

পিছন দিকে না তাকিয়ে অজয় চিৎকার করল, 'কে?'

ভেজানো দরজা খোলার শব্দ হল। তার পর চুপচাপ।

অজয় পিছন ফিরে তাকিয়ে অবাক হল। অঞ্জনা দাঁড়িয়ে আছে। খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওকে। চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিল। উঠে দাঁড়াল অজয়, 'কী ব্যাপার?'

ঠোঁট কামড়াল অঞ্জনা। তার পর মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন কেন?'

প্রশ্নটা আশা করেনি অজয়। সেই সঙ্গে তার মনে হল মেয়েটাকে পুলিশ খুঁজছে। তার এই ঘরে যদি খুঁজে পায়, তা হলে দেখতে হবে না। হাজারটা

ঝামেলায় তাকে জড়িয়ে পড়তে হবে। সে গম্ভীর গলায় বলল, ' ফোন করেছিলাম কারণ আমি চাই না তুমি এখানে আর আসো। তোমাকে পাইনি বলে জানাতে পারিনি।'

'ও। কথাটা তো মাকে জানিয়ে দিতে পারতেন!'

'আমি ওঁকে বিব্রত করতে চাইনি।'

অঞ্জনা পাশ ফিরল। অজয় বুঝতে পারল চলে যাওয়ার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ওর মধ্যে কোনও দুশ্চিন্তা কাজ করছে।

'তোমাকে দেখে যদি বুঝতে পারতাম তুমি ওই ভাবে উপার্জন করো, তাহলে কখনওই এখানে নিয়ে আসতাম না।' অজয় বলল।

অদ্ভুত চোখে তাকাল অঞ্জনা।

'একটা কথা, তুমি প্ল্যান করে আমার গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েছিলে। জানতে আমি ব্রেক কষবই, তোমাকে অজ্ঞান ভেবে গাড়িতে তুলে নেব। সবই যখন ঠিক ছিল, তখন আমাকে ব্ল্যাকমেল করোনি কেন? টাকা না চেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার ভান করেছিলে কেন? তার পর যখন এই ঘরে এলে তখনও তো দারুণ সুযোগ পেয়েছিলে। টাকা চেয়ে না পেয়ে চিৎকার করলে পাড়ার লোকেরা আমার বারোটা বাজিয়ে দেবে জেনেও কিছু করোনি। এ রকম তো তোমার করার কথা নয়।' অজয় বেশ কেটে কেটে কথাগুলো বলল।

'আমি যাচ্ছি।' অঞ্জনা নিচু গলায় বলল।

'আমি তোমাকে আসতে বলিনি। কিন্তু এসেছ যখন জবাব দিয়ে যাও।'

'আমার কিছু বলার নেই।' মাথা নাড়ল অঞ্জনা।

'থানায় বড়বাবু আমাকে ধমকালেন, তুমি এক জন কলগার্ল, তোমাকে কেন আমি গাড়িতে তুলেছি। সত্যি বলছি, তুমি তাই বুঝলে কখনও গাড়িতে তুলতাম না।'

'এখন তা হলে বুঝতে পেরেছেন!' সোজাসুজি তাকাল অঞ্জনা।

'তুমি বলেছ যে হটরের কাছে থাকো। চাকরি খুঁজতে সল্ট লেকে এসেছিলে। কী চাকরি? না যে সব লম্পট পুরুষ মোটা টাকার বিনিময়ে কয়েক ঘণ্টার জন্যে সঙ্গিনী খোঁজে, তাদের আনন্দ দেওয়ার চাকরি। তাই না?'

'ওখানে যে ওই ধরনের কাজ করাবে, তা আমি জানতাম না।'

'কাকে বোঝাচ্ছ? সবাই জানে আর তুমি জানো না?'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?' হঠাৎ গলায় অন্য সুর বাজল অঞ্জনার।

অজয় কথা না বলে তাকিয়ে থাকল।

'সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়, সিগারেট মৃত্যুকে ডেকে আনে। সরকার এই কথাগুলো হাজার বার প্রচার করছে। কিন্তু সিগারেটের দোকানগুলো বন্ধ করছে

না কেন? সিগারেট তৈরি করে যে সব কারখানা, তা উঠিয়ে দিচ্ছে না কেন? জেনেশুনে সাধারণ মানুষকে মরতে সাহায্য করছে না? বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল পাবলিক রিলেশনের চাকরি। কী বুঝব তাতে? কিন্তু খবরের কাগজে ওরা যখন বান্ধবী চাই বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে টাকা খরচ করে, তখন পুলিশ চোখ বন্ধ করে থাকে কেন? সবাই তো জেনেশুনে অন্ধ হয়। আর আমি বোকার মতো ফাঁদে পা দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু পুলিশ যে বলল...!'

'কী বলল? আমি কলগার্ল? ঠিক আছে, আমি থানায় যাচ্ছি।' অঞ্জনা দরজার দিকে পা বাড়তেই অজয় নার্ভাস হয়ে গেল। আগামী সাত দিন যদি পুলিশ অঞ্জনাকে না পায়, তা হলে ওর বিরুদ্ধে কোনও কেস রাখবে না। যদি পায় তা হলে অজয়কে টানাটানি করবে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে। সে বেশ কাঁপা গলায় ডাকল, 'শোনো।'

অঞ্জনা দরজায় হাত রেখে দাঁড়াল।

'তোমার বাড়িতে পুলিশ গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। আমি তখন ছিলাম না।'

'খবর পেয়ে তোমাদের থানায় যাওনি কেন?'

'প্রথমে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পরে ঠিক করলাম আমার কাছে কী করে গেল, তা হয়তো আপনি জানতে পারেন। তাই এসেছিলাম।'

'তুমি ওই খাটে বসো।'

'মানে?' অবাক হল অঞ্জনা।

'এখনই থানায় যাওয়ার দরকার নেই।'

'কেন? ওরা আমাকে কলগার্ল বলবে আর আমি মেনে নেব?'

'তুমি প্রমাণ করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই। তবে তার আগে ওদের প্রমাণ দিতে হবে।'

'তুমি বুঝতে পারছ না। পুলিশ ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। ওরা দিনকে রাত করে দিতে পারে এক নিমেষে। বসো।'

'এক জন কলগার্লকে জেনেশুনে নিজের বিছানায় বসতে বলছেন?'

'কী করব! আমার ঘরে কোনও চেয়ার নেই।'

'কী বলতে চাইছেন তা বলুন।'

'পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা করে কোনও লাভ হবে না। তার চেয়ে দিন সাতেক ওদের এড়িয়ে থাকো, কেস ড্রপ হয়ে যাবে।' অজয় বলল।

'তার মানে? আমার ওপর অন্যায় করা হয়েছে অথচ আমাকেই ওরা দোষী করেছে? উঃ, এটা আমি মেনে নেব?'

'না মেনে করবে কী? সব সময় মাথা গরম করে কোনও লাভ হয় না। সাত দিন পরে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।' অজয় বলল।

মাথা নাড়ল অঞ্জনা। বোঝা যাচ্ছিল প্রস্তাব মেনে নিতে তার অসুবিধে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'কোথায় যাব। আমার তো একটাই জায়গা, মায়ের কাছে।'

'সর্বনাশ! সেখান থেকে থানায় নিয়ে যেতে পুলিশের সুবিধে হবে। আর কোনও আত্মীয় নেই?'

'না। আমার মা ছাড়া কেউ নেই।'

'যাচ্চলে।' চিন্তায় পড়ল অজয়।

'আপনি এত ভাবছেন কেন?' অঞ্জনা প্রশ্নটা করা মাত্র দরজায় শব্দের সঙ্গে হাঁক শোনা গেল, 'অজয় ড্রাইভার আছেন?'

দ্রুত অঞ্জনাকে বাথরুমে টেনে নিয়ে গিয়ে অজয় বলল, 'এখানে কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়াও, প্লিজ।'

বাইরের দরজা খুলতেই সে সকালবেলার পুলিশটাকে দেখতে পেল। লোকটা হাসল, 'আসুন, বড়বাবু গাড়িতে বসে আছেন।'

বাধ্য হয়ে লোকটাকে অনুসরণ করে গলির মোড়ে এসে বড়বাবুকে দেখতে পেল অজয়। গাড়িতে বসে তিনি বললেন, 'এখনও গ্রামে যাওনি?'

'যাচ্ছিলাম...।'

'সমস্যা হয়ে গেল। ওই লোক দুটো বেল পেয়ে গেছে। পিছনে পলিটিক্যাল হাত ছিল। মনে হচ্ছে কিছু প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু ওই মেয়েটাকে যদি পাওয়া যায়, তা হলে ওরা ফেঁসে যাবে। আমরা মেয়েটাকে চাইছি ওরা জানে। ওরা চাইবে না সেটা। খুনটুনও করে ফেলতে পারে। মুশকিল হল, মেয়েটা বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। আমাদের কাছে এলে প্রাণে বেঁচে যেত। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হলে বোলো এ কথাটা। তিন দিন পরে কোর্টকে জানাতে হবে। নইলে কেস ড্রপ হয়ে যাবে। আচ্ছা...।'

বড়বাবু পুলিশটাকে নিয়ে চলে গেলেন।

আর এক সমস্যা তৈরি হল। এখন শুধু পুলিশ নয়, ওই মাতাল দুটো লোকও অঞ্জনাকে খুঁজবে। কেস ড্রপ না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটাকে লুকিয়ে রাখতেই হবে। নইলে লোক দুটো তাকেও ফাঁসাতে পারে। ওর ঠিকানা তো বের করতে ওদের বেশি দেরি হবে না। ঘরে ফিরে ব্যাগটা তুলে অজয় বলল, 'চলো।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল অঞ্জনা, 'কোথায়?'

'ওই মাতাল লোক দুটো তোমাকে খুঁজছে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ। খুন করবে বলে। ওদের অপরাধের সাক্ষীকে রাখতে চাইবে না। চলো।'

দরজায় তালা দিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগল অজয়। পিছনে অঞ্জনা।

বড় রাস্তায় পৌঁছে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'মাথা কাজ করছে না। তোমাকে নিয়ে গ্রামে যাওয়া যাবে না। হাজারটা প্রশ্ন শুনতে হবে। কলকাতায় কোনও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নেই, যার বাড়িতে তোমাকে নিয়ে যাব। চলো, ওই বাসে উঠি।' হাত নেড়ে বাসটাকে থামাল অজয়।

অঞ্জনা মেয়েদের সিটে, অজয় একেবারে পিছনে। ঝাঁকুনি লাগছে বেশ। বাস যখনই একটু থামছে, তখনই কন্ডাক্টর যাত্রীদের তোলার জন্যে জায়গাগুলোর নাম হাঁকছে। অজয় বুঝতে পারল এই বাস কলকাতা ছাড়িয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যায়। এখনও টিকিট চায়নি কন্ডাক্টর। চাইলে কোথায় নামার কথা বলবে সে? প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়ল সে। জানলার লোকটা নেমে যেতে সে সরে বসে রাস্তা দেখতে লাগল। সাইকেল রিকশা চলছে।

'তোমার কি মাথা স্থির নেই?' প্রশ্নটা পাশ থেকে ভেসে আসতেই অজয় চমকে উঠল। আড়চোখে পাশের আসনে তাকিয়ে সে খুব হতাশ হল। সেখানে কেউ বসে নেই। নতুন যাত্রী ওঠেনি। অথচ কথাগুলো পাশ থেকেই কেউ বলেছে। সে চার পাশে চোখ বুলিয়ে বুঝল কেউ তার দিকে তাকিয়ে নেই।

' কোথায় যাচ্ছ, নিজেই জানো না?' আবার শুনতে পেল অজয়।

চোয়াল শক্ত হল। আশেপাশের কেউ যে কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে না, তা মুখগুলো দেখে বোঝাই যাচ্ছে। সে ঠোঁট চেপে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে? আপনি কি এই বাসেই আছেন?'

'অবশ্যই। আমি তোমার বুকের ভেতরে বসে আছি হে। সে-দিন তোমার প্রশংসা করেছিলাম, পথ থেকে তুলে মেয়েটিকে বাঁচিয়েছিলে বলে। আজ তুমি পুলিশের ভয়ে সেই মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছ? কোথায় পালাবে? তার চেয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যাও, শান্তি পাবে।'

খেপে গেল অজয়, 'ওঃ, আপনি! আপনার জন্যে আমার এই দুরবস্থা। এখন আপনি আমার ভেতরে ঢুকে বসে আছেন?' কোনও উত্তর নেই। বুকে হাত বোলালো অজয়, কী মুশকিল।

হঠাৎ খুকখুক হাসি কানে এল, 'ব্রাদার, তোমাকে সাবধান করেছিলাম, ওই বামুনটার কথায় কান দিয়ো না। ও যদি আমার পাশ থেকে সরে না যেত, তা হলে আমি আর একটা মেঘনাদবধ কাব্য লিখতে পারতাম। কিন্তু মেয়েটা ভাল।'

'আপনি কোথায়?' অজয় নীরবে প্রশ্ন করল।

'তোমার ভেতরে। জায়গাটা ভাল, কিন্তু বামুনটাও এখানে ঢুকে পড়েছে।'

'মরেছে! ভেতরটা কি ধর্মশালা না আত্মাশ্রম?' নীরবে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল অজয়। কোনও জবাব এল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আর কে কে আছেন? ঠাকুর্দা? সেই এক্সট্রাবাবু? আপনারাও কি আছেন?' কোনও জবাব না আসায় অজয় বুঝতে পারল আপাতত দু'জনই তার বুকের বাসিন্দা। বাস এখন প্রায় খালি। সে উঠে অঞ্জনার কাছে গিয়ে বলল, ' কোথায় নামা যায় বলো তো?'

অঞ্জনা উঠে দাঁড়াল, 'চলুন, সামনেই নেমে পড়ি।'

ভাড়া মিটিয়ে ওরা যেখানে নামল সেখানে তেমন দোকানপাট নেই, রাস্তা শুনশান। হঠাৎ অজয় চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে বুকের বাসিন্দারা, এ বার কী করব, আর একটু জ্ঞান দিন!'

'ওমা! আপনার বুকের ভেতরে অনেকে আছে বুঝি? তা হলে আমাকে নিয়ে এলেন কেন? পুরুষমানুষরা বোধ হয় এই রকমই হয়।' বলে অঞ্জনা হনহন করে হাঁটতে লাগল। দূরত্ব কমাবার জন্যে পা চালাল অজয়। দূরত্ব কমছে।

মাটি পায় না তাকে

দুপুর থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল বিকেলে তা প্রবল হল। নীপা তাই দেখে আপত্তি জানাল, "মা, তোমাকে আজ যেতে হবে না।"

অপর্ণা অবাক হলেন, "কেন রে?"

"কী ভয়ঙ্কর বৃষ্টি পড়ছে। ট্রেন ছাড়বে কি না কে জানে, আর ছাড়লেও মাঝপথের কোথাও যদি আটকে যায় তো গেল। তুমি একা যাচ্ছ। আর মাসখানেক থেকে গেলে আমরাই তোমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে পারতাম।" নীপা বলল।

"এতদিন বাড়ি ছেড়ে থাকা যায়? দু'হপ্তা তো হয়ে গেল। তুই মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিস। পথে একটুও অসুবিধায় পড়ব না।" অপর্ণা হাসলেন।

জামাই দিবাকর এল ঘরে। "আমার মনে হয় আপনি কাল যান। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে প্লেনের টিকিট কেটে দিচ্ছি।"

"না বাবা। ট্রেনই ভাল। তোমরা চিন্তা করো না।" অপর্ণা বললেন।

পাঁচ মিনিট পরে স্বামী-স্ত্রী তাদের শোওয়ার ঘরে গেলে দিবাকর বলেছিল, "যাই বল, তোমার মায়ের হেভি এনথু আছে।"

কপালে ভাঁজ পড়ল নীপার, "তার মানে?"

"একা চলাফেরা করতে একটুও ভয় পান না। তুমি হলে নিশ্চয়ই যেতে না। কত বয়স হল ওঁর?" দিবাকর নীপার দিকে তাকাল।

"শাশুড়ির বয়স জানতে চাইছ?"

"আশ্চর্য! এতে অপরাধ কোথায়?"

"মায়ের পঁচিশ বছর বয়সে দাদা হয়েছিল। তার পাঁচ বছর পর আমি।"

"বাপস। তোমার দাদার বয়স এখন কত? চল্লিশ। তোমার পঁয়ত্রিশের সঙ্গে পাঁচ প্লাস করছি। তাহলে আমার শাশুড়ি মায়ের বয়স এখন পঁয়ষট্টি, ফাটাফাটি!"

"মানে?"

"এই বয়সে কী ফিগার রেখেছেন ভদ্রমহিলা। ভাবা যায় না!"

"তোমার লজ্জা করছে না মায়ের সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে?"

"একটাও লজ্জা করার মতো কথা বলিনি। আসলে আমরা বাঙালিরা, মা-মাসিদের দেবীর আসনে বসিয়ে দূরত্ব তৈরি করে খুশি থাকতে চাই। তাঁরাও যে মানুষ এ কথা ভাবলে আমাদের খারাপ লাগে।"

"তাহলে মাকে তোমার বক্তব্য জানিয়ে আসি?"

"দুটো প্রতিক্রিয়া হতে পারে। হয় বদহজম হয়ে যাবে নয় হজম করবেন। খামোকা ঝুঁকি নিয়ে লাভ কী?" দিবাকর হাসল।

বৃষ্টি পড়েই চলছিল। অপর্ণা বলেছিলেন, "তোদের যেতে হবে না। ড্রাইভার তো আছে, কোনও অসুবিধা হবে না।"

মেয়ে-জামাই শোনেনি আপত্তি! মেঘ এবং বৃষ্টির জন্যে আজ তাড়াতাড়ি আলো নিভেছিল। গাড়ি চালাচ্ছিল ড্রাইভার। বলল, "পাহাড়ে ধস নেমেছে।"

নীপা মুখ ঘোরাল, "শুনলে?"

"শুনলাম। কিন্তু আমরা তো পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি না। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় যেতে কোনও পাহাড় পড়ে না।" অপর্ণা হাসলেন।

দিবাকর বলল, "টিয়া যদি আজ এখানে থাকত তাহলে আপনি যেতে পারতেন না। ওর মন খারাপ হয়ে যাবে বলে আপনার আসার খবরটা ওকে দিইনি।"

"ওকে খুব মিস করলাম। কলকাতার বদলে দিল্লিতে পড়তে পাঠালে, আমার কাছে থেকে স্বচ্ছন্দে পড়তে পারত। এবার ছুটিতে আসার সময় ও যেন কলকাতা হয়ে শিলিগুড়িতে আসে। সেইভাবে টিকিট কেটে রাখবে।" অপর্ণা বললেন।

ওরা গাড়ি থেকে নেমে যাতে ভিজে না যায় তাই দিবাকর তিনটে ছাতা এনেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিজতে হল। প্ল্যাটফর্মে পা রাখার আগে অপর্ণা বললেন, "এই বৃষ্টিতে তোমরা আর অপেক্ষা করো না।"

"আগে আপনার কামরা খুঁজে বের করি।" দিবাকর বলল।

অন্যদিনের থেকে আজ প্ল্যাটফর্মে ভিড় অনেক কম। এসি টু টিয়ারে তখন পর্যন্ত প্রচুর জায়গা খালি। মেয়ে-জামাই তাঁকে যত্ন করে বসিয়ে দিলে অপর্ণা আবার তাগাদা দিলেন ফিরে যাওয়ার জন্যে।

নীপা বলল, "যাচ্ছি মা যাচ্ছি। বাস্কেটে খাবার দিয়েছি। মনে করে খেয়ে নিও। লুচি, পরোটা দিলাম না, যদি অ্যাসিড হয়ে যায়!"

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি তোর মা না তুই আমার?"

শেষপর্যন্ত ওরা বিদায় নিলে কামরার দরজায় এসে দাঁড়ালেন অপর্ণা। ওরা চোখের আড়ালে চলে গেলে দু'পাশে ঘন ঘন মুখ ফেরালেন। তারপর নিজের আসনে ফিরে গেলেন। চারটে বার্থ, বাকি তিনজন এখনও এসে পৌঁছয়নি। ঘড়ি দেখলেন অপর্ণা। সবে সন্ধে শেষ হল। রাতের খাওয়ার জন্যে ঘণ্টাখানেক জেগে থাকতে হবে।

এই সময় কয়েকজন মহিলা-পুরুষ মালপত্র নিয়ে কামরায় উঠে ভিতর দিকে চলে গেল। চার বার্থের এই জায়গাটুকু একটু বেশি ফাঁকা লাগছে এখন। ট্রেন চলতে শুরু করলে নিশ্চয়ই দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে। সামনের পর্দা টেনে দিলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন। অবশ্য ট্রেনে কখনওই তাঁর ভাল ঘুম হয় না। কৃষ্ণেন্দু যখন বেঁচে ছিলেন তখন ট্রেনে উঠলেই বলতেন, "তুমি তো জেগেই থাকবে, জিনিসগুলোর দিকে একটু খেয়াল রেখ। আমি শোব আর ঘুমোব।" কথাটা অন্যভাবেও সত্যি হয়ে গেল। বুকে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করতে শুয়ে পড়েছিল কৃষ্ণেন্দু, পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিল চিরকালের মতো।

"নাম্বার এইট। হ্যাঁ, এই তো, এটাই।"

গলার স্বরে মুখ ফিরিয়ে লোকটিকে দেখতে পেলেন অপর্ণা। স্যুটকেস সিটের নীচে ঢুকিয়ে উল্টোদিকে বসলেন ভদ্রলোক। খুব বেশি হলে পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। চোখাচোখি হতে বললেন, "এই ভয়ঙ্কর বৃষ্টিতে এলেন কী করে?"

ঠোঁটে একটু হাসি ফুটল কি ফুটল না, অপর্ণা কথা বললেন না।

"ট্রেনটা ফাঁকাই যাচ্ছে। অথচ দিন সাতেক আগে টিকিট কাটতে গিয়ে শুনেছিলাম আমাকে ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হবে। আজ সকালে কনফার্মড হল।" লোকটির বোধহয় একটু বেশি কথা বলার বাতিক আছে, অপর্ণা এবার হাসলেন না।

ট্রেন ছাড়ল। রেলরক্ষী বন্দুক হাতে প্যাসেজ দিয়ে চলে গেল। লোকটি বলল, 'এই ট্রেন কাল সকালে শিয়ালদায় পৌঁছবে। ততক্ষণ আমরা বোবা হয়ে থাকব না ভদ্রজনের মতো কথাবার্তা বলব তা আপনাকে ঠিক করতে হবে।"

এরকম প্রস্তাব এই প্রথম শুনলেন অপর্ণা। তবু বললেন, "আমি কেন?"

"আপনি একজন মহিলা। আপনি ইচ্ছে করলে কথা নাও বলতে পারেন।"

"আমার কোনওটাতেই আপত্তি নেই।" অপর্ণা বললেন।

"বেশ। আমার নাম গৌতম, গৌতম সেন। কলকাতার একটা বেসরকারি কলেজে পড়াই। অল্প বয়সে ঠিক করেছিলাম কখনই প্রেমে পড়ব না। বই নিয়ে থাকব। তারপর যখন মনে হল এরকম ইচ্ছের কোনও মানে হয় না তখন

দেখলাম যাঁরা আমার প্রেমিকা হতে পারতেন তাঁদের সবাই ছেলেমেয়ের মা হয়ে গেছেন, কেউ বা শাশুড়ি, কাছাকাছি বয়সের এমন কোনও অবিবাহিতা মহিলা নেই যার প্রেমে পড়া যায়। তাছাড়া একা থাকতে বেশ কিছু অভ্যেস তৈরি হয়ে গিয়েছিল যা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না। এই হলাম আমি।" গৌতম সেন বললেন।

"প্রেম না করেও তো মানুষ সংসার করে।" না বলে পারলেন না অপর্ণা।

"গোড়ার দিকে, যখন মা বেঁচে ছিলেন তখন খুব চাপ দিতেন। পরে যখন আমি একা হয়ে গেলাম তখন মনে হল চিনি না, জানি না এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করে একসঙ্গে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওটা যে বয়সে সবাই করে তা আমি পেরিয়ে এসেছি। কলকাতায় যাচ্ছেন তো?" আচমকা প্রশ্ন করল গৌতম সেন।

"এই ট্রেন তো সেখানেই যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু মাঝখানে কয়েকটা স্টেশনে থামবে।"

"ও। হ্যাঁ, কলকাতাতেই।"

"আমি একটু আসছি।" বলে উঠে গেলেন গৌতম সেন।

একটু অন্যরকম চরিত্র। অবশ্য যদি বাচাল না হয় বা অন্য মতলব না থাকে তাহলে কথাগুলো খারাপ লাগার কথা নয়। এভাবে নিজের কথা কাউকে বলতে শোনেননি তিনি । ঘড়ি দেখলেন অপর্ণা। ট্রেনটা খুব জোরে ছুটছে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কামরায় বসলে বাইরের পৃথিবীটা অদেখা থেকে যায়। তাই অন্ধকার কীরকম, বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে কি না বুঝতে পারলেন না তিনি।

মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এলেন গৌতম সেন। এবার সিগারেটের গন্ধ পেলেন অপর্ণা। বললেন, "শুনেছি ট্রেনে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ।"

"অ্যাঁ? বা বেশ শার্প ঘ্রাণশক্তি আপনার? হ্যাঁ। তাই টয়লেটকে স্মোকিং জোন বানিয়ে নিয়েছি। বিদেশের ট্রেনগুলিতে একটা সিগারেট খাওয়ার কামরা থাকে। ভারতীয় রেল যখন সেই ভদ্রতা করবে না তখন এছাড়া উপায় কী?" আরাম করে বসলেন গৌতম সেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন গৌতম সেন, "শুনুন। আমি পাশের কুপেতে গিয়ে বসছি। ওটাও একদম খালি। টিটি যদি এদিক দিয়ে আসেন তাহলে প্লিজ বলবেন আমি ওদিকে আছি।"

"অস্বস্তি হচ্ছে?"

"একটু।"

"বুঝতে পারছি না। আপনি কথা বলতে চাইলেন, কথা বললাম। আপনি সিগারেট খেতে চাইলে টয়লেটে যেতে পারতেন।"

"একদম ঠিক। আপনি একজন অ্যাডাল্ট মহিলা। বলাই যায়। আমি রোজ নিয়ম করে দুই পেগ করে হুইস্কি খাই। ট্রেনে যেতে হলে সহযাত্রীদের অনুমতি

চাইলে দেখেছি অনেকেই ওই অর্থেও আমার সহযাত্রী। কিন্তু আজ আপনার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে আপনি হজম করতে পারবেন না।" গৌতম সেন বললেন।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন অপর্ণা। তারপর বললেন, "আপনি যদি মাতলামো না করেন তাহলে ওদিকে যাওয়ার দরকার নেই। আমার স্বামীকেও দীর্ঘদিন দেখেছি কিন্তু কখনও তাঁর কথা জড়িয়ে যায়নি। আপনি যদি তা না পারেন তাহলে স্বচ্ছন্দে পাশের কুপেতে যেতে পারেন। যাওয়ার সময় স্যুটকেসটা নিয়ে যাবেন।"

"চমৎকার। আপনার স্বামী কি— !"

"উনি আজ নেই। ওঁর কথা থাক।"

এইসময় টিটি এলেন। টিকিটে দাগ দিয়ে চলে গেলেন রোবটের মতো। স্যুটকেস খুললেন গৌতম সেন। একটা কাচের গ্লাস বের করে বোতল খুলে পানীয় ঢাললেন খানিকটা। তারপর বললেন, "এই যাঃ। জল কেনা হয়নি।"

অপর্ণা কিছু বললেন না। মেয়ে খাবারের বাস্কেটে দু'বোতল জল দিয়েছে যার অনেকটাই তাঁর লাগবে না।

স্যুটকেস বন্ধ করে তার আড়ালে গ্লাস রেখে উঠে দাঁড়ালেন গৌতম সেন, "যাই, একটু জলের সন্ধান করে আসি। চণ্ডালিকার কথা মনে পড়ছে। জল দাও, জল দাও?"

একটু বাদেই আধবোতল জল নিয়ে ফিরে এলেন গৌতম সেন। গ্লাসে কিছুটা মিশিয়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "চমৎকার!"

অপর্ণা তাঁর ব্যাগ থেকে বাংলা পত্রিকা বের করে চোখ রাখলেন। কিন্তু ঠিক মন দিতে পারছিলেন না। মিনিট দুয়েক পরে চোখ তুলে দেখলেন গৌতম সেন তাঁর দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন। অস্বস্তি হল তাঁর। মুখ নামাতেই শুনলেন, "আপনি রবীন্দ্রনাথে ডুবে আছেন, তাই তো?"

হেসে ফেললেন অপর্ণা, "আমি? না তো!"

"সত্যি বলছেন বলে মনে হচ্ছে না।"

"তাই? কী করে আপনার মাথায় কথাটা এল?"

"মাথায় নয়। মনে।"

"ও, আচ্ছা।"

"আপনি কি জানেন রবীন্দ্রনাথের দু'টি নারী চরিত্রের আদল আপনার মধ্যে রয়েছে?" গৌতম সেন জিজ্ঞাসা করলেন।

লোকটার কথা এখনও জড়ায়নি। কিন্তু উত্তর দিলেন না অপর্ণা।

"কিছুটা এলা, অনেকটা সুচরিতা।"

এবার সোজা হলেন অপর্ণা, "মিস্টার সেন আপনাকে আমি প্রথমবার দেখা হওয়া সত্ত্বেও সহজ কথা বলতে দিয়েছি। আপনি দু'পেগ পান করতে চেয়েছেন,

আপত্তি করিনি। কিন্তু আমাকে অপমান করার অধিকার আপনাকে দিইনি। সেটা করছেন।''

''অপমান? আপনাকে? আর ইউ ম্যাড?''

''আপনি আমার কোথায় সুচরিতা বা এলাকে পেলেন, বলুন?''

গ্লাস শেষ করে একটু ভাবলেন গৌতম সেন, ''আমি যখন ওই উপন্যাস দুটো প্রথম পড়ি তখন সুচরিতা বা এলার যে ছবি মনে মনে এঁকেছিলাম তার সঙ্গে লাবণ্য বা দামিনীর একটুও মিল ছিল না। সুচরিতা নিজেকে ক্যারি করতে জানত। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। অতীন এলার চোখে নিজের সর্বনাশ দেখেছিল। ওদের মধ্যে সেই আগুন ছিল যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু কাছে গেলেই তাপ অনুভব করা যায়। আপনার সামনে বসে আমি সেই তাপ বাস্তবে অনুভব করলাম। এতে আপনি অপমানিত বোধ করছেন কেন?''

''মিস্টার সেন, আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট। আপনার কাছ থেকে এসব কথা শুনতে আমি রাজি নই।'' অপর্ণা বললেন।

''আপনার বয়স কত আমি জানি না। ইন ফ্যাক্ট, আপনাকে দেখে বয়স আন্দাজ করা যাবে না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আপনি সেই ধরনের মানুষ যিনি সত্যি কথা সহজভাবে নিতে পারেন।'' কথা শেষ করে গ্লাস স্যুটকেসে ঢুকিয়ে বেরিয়ে গেলেন গৌতম সেন। একটা পাত্র শেষ করে একটা সিগারেট। অপর্ণার মনে পড়ল ট্রেনে কৃষ্ণেন্দু পান করত না। কিন্তু বাড়িতে থাকলে এক পেগ শেষ করেই সিগারেট ধরাত। অপর্ণা বিরক্ত হতেন, ''দু'দুটো নেশা একসঙ্গে কর কেন?''

কৃষ্ণেন্দু হাসত, জবাব দিত না।

এই লোকটা, যার নাম গৌতম সেন, কৃষ্ণেন্দুর অভ্যাসের সঙ্গে এর কিছুটা মিল থাকলেও এর একটু আগের বলা কথা কোনওদিন কৃষ্ণেন্দু বলেনি। সত্যি কথা হল, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ওর কোনও কৌতূহলই ছিল না। সুচরিতা, এলা কেমন দেখতে ছিল তা দূরের কথা, ওরা কোন কোন উপন্যাসের নায়িকা তা জানার কোনও আগ্রহ কৃষ্ণেন্দুর ছিল না। ''আপনার বয়স কত আমি জানি না, ইন ফ্যাক্ট, আপনাকে দেখে বয়স আন্দাজ করা যায় না।'' লাইনদুটো মনে আসতেই শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। মেরুদণ্ডে অদ্ভুত কনকনে অনুভূতি। অপর্ণা মনে করার চেষ্টা করলেন, সুচরিতার চেহারার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ কী লিখেছেন? মনে পড়ল না। তারপর ভাবলেন, দুর ভেবে লাভ নেই। গৌতম সেন যখন বললেন তখন ধরে নেওয়াই যেতে পারে সুচরিতাকে দেখতে অনেকটা তাঁর মতো। আহা, এই কথাটা তাঁকে কেউ বলেনি। এখন মনে পড়ছে, অনেকের চোখ সে-কথা বলেছিল বিয়ের আগে।

গৌতম সেন ফিরে এলেন। রেল কোম্পানির রেখে যাওয়া বালিশ কম্বল টেনে

বিছানা করে দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লেন। দুটো সিগারেট খেয়েছে এবং একটার বেশি পান করেছে লোকটা। এখন মনে হচ্ছে রাতের খাবারও খাবে না। সঙ্গে খাবারের ব্যাগ নেই, স্যুটকেসে কেউ খাবার নিয়ে আসে না।

হঠাৎ কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে শুরু করল অপর্ণার। ট্রেনটা ছুটেই চলেছে। লোকটা কি অকারণে তাঁর স্তুতি করল? কী লাভ হল ওর? এখন শরীরের এলিয়ে থাকা ভাব বলে দিচ্ছে ঘুমে তলিয়ে গিয়েছে। মতলববাজ মানুষরা এত দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ে না। তাঁর জন্যে অনেক খাবার বাস্কেটে ভরে দিয়েছে মেয়ে। গৌতম সেনকে তার অর্ধেক দিলে একটুও কম পড়বে না।

একবার টয়লেটে যাওয়া দরকার। অপর্ণা উঠলেন। চলন্ত ট্রেনের দুলুনি সামলে সেখানে পৌঁছে দরজা বন্ধ করতেই নাকে সিগারেটের গন্ধ পৌঁছে গেল। কৃষ্ণেন্দু সিগারেট ধরাতেই তিনি দূরে সরে বসতেন। কিন্তু এখন গন্ধটা তেমন কটু বলে মনে হল না। সামনের আয়নাটা খুব পরিষ্কার। ট্রেনে এমনটা দেখতে পাওয়া যায় না। অপর্ণা নিজেকে দেখলেন। এখনও তাঁর চুল পাকেনি। চোখের তলায় হালকা দাগ, অনেকটা হাঁসের পায়ের ছাপ। না, এখনও তাঁর দ্বিতীয় চিবুক হয়নি। হেসে ফেললেন তিনি। বাঁদিকের নীচের পাটির একটা দাঁতে মাসদুয়েক আগে শিল্পকর্ম করেছেন দাঁতের ডাক্তার। এখন বোঝার উপায় নেই। আচ্ছা, সুচরিতাদের কি মাঝে মাঝে হাঁটুতে ব্যথা হয়? চুল ঠিক করলেন অপর্ণা। নিজের বার্থে ফিরে গিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলেন তিনি, "মিস্টার সেন, উঠুন। না খেয়ে ঘুমোবেন না। আমার কাছে শেয়ার করার মতো অনেকটাই খাবার আছে।"

হিমশীতল

কলকাতা থেকে বাদকুল্লা আর কতটুকু? ট্রেনে তো বটেই, গাড়ি নিয়ে গেলে দিনে দিনেই ফিরে আসা যায়! ছেলেবেলায়, যখন স্কুলের শেষ ধাপে পড়ি তখন মায়ের সঙ্গে দু'দুবার গিয়েছিলাম অবনীমেসোর বাড়িতে। অনেকখানি জমি, গাছপালা, গরুর গোয়াল, হাঁসেদের হুটপাট, তাদের সাঁতার কাটার জন্যে জমির লাগোয়া যে নদী তার নাম অঞ্জনা। এটুকু মনে আছে। সেই অঞ্জনা নদীর জল যাতে জমিতে না চলে আসে তাই ছোট বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। সেই বাঁধের গায়ে বড় বড় নারকোল গাছ ছিল। মাঝরাতে একটা নারকোল খসে গিয়ে যেই জলে পড়ত তখন অদ্ভুত শব্দ হত। ঘুমিয়ে কাদা না হয়ে গেলে বিছানায় উঠে বসতাম। গা ছমছম করত।

অবনীমেসোর স্ত্রী কাজলমাসি মায়ের মামাতো বোন। সম্পর্কটা আমাদের

কাছে বেশ দূরের। সময় যত বয়ে গেছে তত জীবন ছিমছাম হয়ে গেছে। নিকট আত্মীয় যাদের বলা হয় তাদের সঙ্গেই যোগাযোগ কমে গিয়েছে তো মায়ের মামাতো বোনের সঙ্গে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। একসময় নিজের ভাইবোন, মামা-মামি, কাকা-কাকিমার সঙ্গে গায়ে গা জড়িয়ে থাকতাম। এখন ভাইবোনদের সঙ্গে ফোনে কথা হয়, দেখা অবরে সবরে। কেউ আছে দুর্গাপুরে তো কেউ কুচবিহারে। সবাই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে শেকড় গেড়ে সেই যে বসে গেছে আর নড়াচড়ার বাসনা হয় না। আমিই ফোনে জিজ্ঞাসা করি, 'তোর ছোট ছেলের বৌটার নাম কী যেন? ও রায়া। সে কোথায়?' অথবা, মামাতো বোনকে ফোনে জিজ্ঞাসা করি, 'হ্যাঁরে, তোর মেয়ে কি এখনও বেঙ্গালুরুতে?' উত্তর শুনে অবাক হই, 'সে কী রে। কবে গেল আমেরিকায়!'

কয়েক বছর আগে মায়ের শরীর যখন খারাপ হত তখন বলতেন, 'হ্যাঁরে! তোর কাছে কাজলদের ফোন নাম্বার আছে?'

চট করে নাম শুনে ঠাওর করতে পারিনি। মাঝখানে তিরিশটা বছর চলে গেছে। নেই শুনে মা বললেন, 'পারিস যদি গিয়ে দেখে আয় না, অনেক দিন খবর পাইনি।' তখনই মনে পড়ল জ্যোছনা রাতে মা আর কাজলমাসি অঞ্জনা নদীর ধারে বসে গান গাইতেন, 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে।' কথা খুব কম বলতেন কাজলমাসি। কিন্তু মা গেলে আর চাঁদনী রাত হলে গলায় গান আসত!

তখনও ব্যক্তিগত আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও প্রিয়জনের ইচ্ছাকে সম্মান দিতে অনেকেই যেন আপত্তি করতেন না, আমিও করিনি।

শেয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগরের ট্রেনে চেপে বাদকুল্লায় পৌঁছেছিলাম সকাল ন'টায়। স্টেশন থেকে রিকশা নিয়ে অবনীমেসোর বাড়ির দিকে যেতে যেতে মনে হয়েছিল তিরিশ বছরে যে বদল হয়েছে তা স্মৃতি মুছতে পারছে না। রিকশাওয়ালার সৌজন্যে বাড়ির গেটে পৌঁছে অবাক হলাম। যখন আগে আসতাম তখন বাড়ি একটাই ছিল। দোতলা, ছিমছাম। এখন দু'খানা বাড়ি, মাঝে বাগান। মায়ের কাছে শুনেছি কাজলমাসির একটাই মেয়ে যার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তিরিশ বছর আগে সেই মেয়ের জন্মই হয়নি। একটি মেয়ে জন্মাল, বড় হল এমনকী বিয়েও হয়ে গেল, বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে আমি সেই বাড়িতে এলাম অথচ তাকে জানলামই না।

গাছপালার মধ্যে দিয়ে দুটো বাড়ির সামনে পৌঁছাতেই চোখ গেল অঞ্জনা নদীর দিকে। দেখা মাত্র মন খারাপ হয়ে গেল। জল আছে কিন্তু ঢেউ নেই। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু যেন চওড়ায় ছোট দেখাচ্ছে।

'আপনি কি বাবুকে খুঁজছেন?' একজন বৃদ্ধ কাজের লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তার দিকে ভাল করে তাকাতেই মুখে এল, 'তুমি বিষ্ণুদা, না?'

'হ্যাঁ। আপনাকে ঠিক— !' বৃদ্ধ চোখ ছোট করলেন।

পরিচয় পেয়েও বৃদ্ধ তেমন উল্লসিত হলেন না। বললেন, 'কার কাছে যাবেন? বাবু না মা?'

একটু অবাক হলাম। কিন্তু সেটা না বুঝিয়ে বললাম, 'অবনী মেসোমশাই বাড়িতে নেই?'

'আছেন। আসুন।'

নতুন বাড়িতে নিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। আমাকে দাঁড়াতে বলে ভেতরে ঢুকলেন। এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। তিরিশ বছর আগে এ বাড়িতে আমার অবারিত দ্বার ছিল। পুরোনো বাড়ির ওপাশে গোয়ালঘর এবং রান্নাঘর ছিল। এখন দেখলাম নতুন বাড়ির গায়ে আর একটি রান্নাঘর হয়েছে। অর্থাৎ ধরনটা একই রকম রয়ে গেছে। আগেকার দিনে রান্নাঘর, বাথরুম বা পায়খানা মূল বাড়ির একটু বাইরে তৈরি করা হত। এই নতুন বাড়িটি বেশি দিন আগের না হলেও সেই রীতি মেনেছে।

বৃদ্ধ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সবিতাদিদির ছেলে?'

সবিতা মায়ের বিয়ের আগের নাম। প্রথমবার শ্বশুরবাড়িতে পা রাখতে না রাখতেই ঠাকুর্দা নামটা বদলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাপের বাড়ির লোক পুরোনো নাম ভুলতে পারেনি। বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তাই বলো, এসো এসো।' বৃদ্ধর মুখে হাসি দেখা দিল।

ভাল লাগল। এই বাড়িতে আমার নিজস্ব কোনও পরিচয় নেই। মায়ের ছেলে বলে এখনও স্বীকৃত।

ভেতরে ঢুকলাম। নতুন বাড়ির ঘরগুলো বেশ ঝকঝকে। আসবাবপত্রও বেশ আধুনিক। দেখলাম একজন মধ্যবয়সিনী একটা বাটি হাতে পাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেই থমকে গেলেন আমাকে দেখে। বৃদ্ধ বললেন, 'এখন নয়। পরে, পরে—।'

তৃতীয় ঘরে টিভি চলছিল। তার সামনে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন যিনি তিনিই যে অবনীমেসোমশাই তা অনুমান করলাম। তিরিশ বছর আগেকার স্বাস্থ্য এখন নেই, মাথায় চকচকে টাক।

বৃদ্ধ ডাকলেন, 'বাবু।'

অবনীমেসো মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখলেন, 'এসো। তা হঠাৎ কী ব্যাপার?'

'মা আপনাদের কথা খুব চিন্তা করছেন, বললেন, দেখা করে আয়।' আমি জানালাম।

'রাস্তায় দেখা হলে তোমায় চিনতেই পারতাম না। শুনেছি নভেলটভেল লিখে

তুমি নাকি নাম করেছ। তাতে ভাল রোজগার হয়?' অবনীমেসো চোখ সরাচ্ছিলেন না।

'মোটামুটি।' হাসলাম আমি।

'বোসো। বিষ্ণু, ওকে মোড়াটা এগিয়ে দে।'

আমি বসলে তিনি বললেন, 'দুম করে চলে এলে, আমি তো বাড়িতে নাও থাকতে পারতাম। মেয়ের বিয়ের সময় চিঠি পাঠিয়েছিলাম, তোমরা কেউ এলে না। তোমার বাবা তো কোনও দিন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। কত বয়স হল তাঁর?'

'বাবা বহু দিন আগে গত হয়েছেন।'

'বাঃ। তোমরা শ্রাদ্ধের চিঠিটাও পাঠাবার প্রয়োজন বোধ করোনি। আমি বুঝতে পারছি না হঠাৎ তোমার মা আমাদের খবরের জন্যে উদ্বিগ্ন হলেন কেন? এখান থেকে কি কোনও চিঠিপত্র তাঁর কাছে গিয়েছে?' অবনীমেসো গেঞ্জি খুলে ফেললেন। এখনও তাঁর স্বাস্থ্য ভাল। সত্তরের পরেও বেশ মজবুত।

'না। গেলে মা আমাকে বলতেন।'

'ঝিমলির শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়। সে ফোনটোন করেছিল নাকি?'

অনুমানে বুঝলাম ঝিমলি ওঁর মেয়ের নাম। মাথা নাড়লাম, 'না।'

'বিষ্ণু, ওকে চা-টা দে। আমি আজ নিরামিষ খাই। খেতে পারবে তো?'

'আজ্ঞে, আমি সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরব। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

'আমি ব্যস্ত হচ্ছি তা তোমাকে কে বলল। আমার সব ঘড়ি ধরা। এখন তেল মাখব। সাড়ে দশটার মধ্যে স্নান শেষ করে ঠাকুরঘরে বসব। বেলা বারোটায় আহার। এই পৃথিবীর কোনও ব্যাপার আমাকে ব্যস্ত করে না।'

বিষ্ণুদা তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন দেখে বিরক্ত হলেন অবনীমেসো, 'সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চা দিতে বললাম না?'

'যাচ্ছি।'

'শোন, সে কোথায়? তাড়াতাড়ি তেল নিয়ে আসতে বল।'

'একটু পরে তেল মাখলে হত না?'

'কেন?' খিঁচিয়ে উঠলেন অবনীমেসো।

'আচ্ছা, ডেকে দিচ্ছি।' বিষ্ণুদা বেরিয়ে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাজলমাসিমা কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

অবনীমেসো অবাক হয়ে তাকালেন, 'তিরিশ বছর পরে এসে তার খোঁজ করছ? আচ্ছা, আরও তিরিশ বছর পরে এলে ওই একই প্রশ্ন করবে কি?'

চমকে গেলাম। তাহলে কাজলমাসি কি বেঁচে নেই?

'তিনি আছেন তাঁর মতো। তাঁর খবর নিতেই তো তোমার মা পাঠিয়েছেন। যাওয়ার আগে দেখা করে যেও।'

এই সময় সেই মধ্যবয়সিনী বাটি হাতে ঘরে ঢুকলেন। মাথায় ঘোমটা।

অবনীমেসো বিরক্ত হলেন, 'টাইমের কাজ টাইমে করবে, কতবার বলেছি, অ্যাঁ?' বলে বাঁ হাতটা শূন্যে সোজা করে ধরলেন।

বাটি টেবিলে রেখে তা থেকে আঙুলে তেল তুলে অবনীমেসোর কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত মাখালেন মহিলা। তারপর তেলটাকে বসাতে চেষ্টা করলেন।

'আপনি কি সারা বছর ধরে তেল মাখেন?' না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না।

'মাখি। কেন, তোমার কি কোনও অসুবিধে হচ্ছে?'

'না না।'

'এই যে শরীরটা দেখছ, প্রতিদিন এর পরিচর্যা করতে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক ঘণ্টা ধরে যোগা, প্রাণায়াম করি। সপ্তাহে দু'দিন নিরামিষ। ডিম মাংস ছেড়েছি বহু কাল। মাছ বলতে তিন ইঞ্চির মধ্যে ছোট মাছ। আগে ওই অঞ্জনাতে মেছোরা ধরে দিয়ে যেত, এখন তো নদী বাঁজা হয়ে গিয়েছে। ষোলো ঘণ্টা জাগি, আট ঘণ্টা ঘুমোই। আমার বয়সি দুটো মানুষকে দেখাও তো, এরকম শরীর খুঁজেও পাবে না।'

বাঁ হাত হয়ে গিয়েছিল, এবার ডান হাত। মাঝে মাঝে মহিলার ঘোমটা খসে যাচ্ছিল। শ্যামলা গায়ের রঙ, মুখটি সুন্দর। অবনীমেসো চোখ বন্ধ করে মর্দন উপভোগ করছেন। হঠাৎ সেই অবস্থায় অবনীমেসো খিঁচিয়ে উঠলেন, 'কী ব্যাপার? কাল কীসের উপোস করেছিলে? এটা কি মালিশ হচ্ছে?'

শোনামাত্র মহিলা সজোরে এমন হাত চালালেন যে মাথা থেকে আঁচল খসে পড়ল। বুঝলাম মধ্যবয়সিনী এখনও যুবতী।

উঠে দাঁড়ালাম, 'আমি একটু কাজলমাসির সঙ্গে দেখা করে যাই?'

'তা তো যাবেই। আমি কে? তাকে বিয়ে না করলে তো মেসো বলে ডাকতে না। ঠিক আছে, হাত ছেড়ে এবার পায়ে তেল দাও।' শেষ কথাগুলো যে মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলা তা বোঝার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ফিরে গিয়ে মাকে অবনীমেসোর তেল মাখার গল্প করতে পারব না।

বাড়ির বাইরে আসতেই বিষ্ণুদা ছুটে এলেন, 'ভালই হয়েছে। ওখানে চা না খেয়ে মায়ের কাছে বসে খাবে চলো।'

পুরোনো বাড়িতে ঢুকলাম। এবার সব মনে এল। তিরিশ বছর আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম সব কিছু অবিকল রয়েছে। একজন প্রৌঢ়া এগিয়ে আসতেই বিষ্ণুদা বললেন, 'মাকে বলেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'যাও বাবু, এর সঙ্গে যাও।'

কাজলমাসি আরও রোগা হয়েছেন। আমায় দেখে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিনতে পারছ?'

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন কাজলমাসি। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। প্রৌঢ়া দ্রুত এগিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত রাখল, 'কাঁদছ কেন? কেঁদো না। তোমাকে দেখতে এসেছেন উনি।'

নিজেকে সামলাতে প্রায় মিনিট খানেক লাগল। দেখলাম, কাজলমাসির মুখে বয়সের থাবা ভালরকম পড়েছে। যে জামা পরে আছেন তা ঢলঢল করছে কিন্তু মাথার চুল একদম কালো।

শেষ পর্যন্ত তাকালেন কাজলমাসি, 'এত দিন আসিসনি কেন?'

অপরাধ স্বীকার করলে কখনও কখনও মার্জনা পাওয়া যায়। কোনও যুক্তি না দাঁড় করিয়ে বললাম, 'অন্যায় হয়ে গিয়েছে।'

'তোর মা কেমন আছে?'

'এই বয়সে যা থাকা সম্ভব, মাঝে মাঝে বাতের ব্যথা খুব বাড়ে।'

'খুব দেখতে ইচ্ছে করে!'

'মা ঘরের ভেতরেই হাঁটাচলা করেন। এত দূর আসতে পারবেন না।' আমি বললাম, 'তুমি চলো।'

'আমি? এ বাড়ি থেকে যখন বের হব তখন মানুষ বয়ে নিয়ে যাবে। মেয়ে কতবার চেয়েছে নিয়ে যেতে— !' বড় শ্বাস ফেললেন কাজলমাসি। তারপর ধীরে ধীরে কাছে এলেন, আমার বুকে হাত রেখে বললেন, 'তুই কত বড় হয়ে গেছিস রে!'

'বাঃ। কত বয়স হয়ে গেছে চিন্তা করো!'

'নারে! তুই কত বই লিখেছিস। কত গল্প। ওই মানদাকে দিয়ে আমি মাত্র দুটো বই কিনে আনাতে পেরেছিলাম। হাতে টাকা থাকে না তো। ঝিমলি বলেছিল এনে দেবে। কিন্তু সে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিয়েছে।'

কথাটা শুনেও না শোনার ভান করলাম। বললাম, 'তুমি চিন্তা কোরো না, আমার সব বই তোমাকে পাঠিয়ে দেব।'

'নারে! পাঠাস না। পড়তে পারব না।'

'কেন?'

'এই চশমাটায় ছোট অক্ষর আর দেখতে পাই না।'

'চোখ দেখিয়ে নতুন চশমা নাও।'

হাসলেন কাজলমাসি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোকে কিছু বলল ও?'

'এমনি গল্প করলেন।'

'খারাপ কিছু বললে মনে করিস না।'

'তোমরা দুজনে দুটো আলাদা বাড়িতে কবে থেকে থাকছ?'

এবার গম্ভীর হলেন কাজলমাসি। এই সময় চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকলেন বিষ্ণুদা, 'নাও, খেয়ে নাও। কিন্তু এই সময় এসে দুপুরে না খেয়ে চলে যাবে?'

হেসে বললাম, 'কলকাতায় কাজ ফেলে এসেছি।'

বিষ্ণুদা বললেন, 'যাক, তবু তো এসেছ।'

চা-জলখাবার খেতে খেতে জানলাম, এখনও রোজ পাঁচ কেজি দুধ হয়। কর্তার নির্দেশে তার চার কেজি বিক্রি করে দেওয়া হয়। চারটে ছাগল আছে। দুটোর বাচ্চা হবে শিগগির। বাড়িতে যত নারকোল গাছ আছে তা বাজারের এক দোকানদারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

ফেরার আগে কাজলমাসিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে চাই, যাবে?'

অদ্ভুত হাসি ফুটল তাঁর মুখে, 'নারে! এখন আর হয় না।'

নিজের টেলিফোন নাম্বার একটা কাগজে লিখে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। অবনীমেসোর বাড়ির দরজা বন্ধ। অত বড় বাড়িতে শুধু পাখির ডাক ছাড়া কোনও শব্দ নেই।

ফিরে এসে মাকে সব কথা বলিনি। অবনীমেসোর মালিশের মেয়ের কথা তো নয়ই। তবে তাঁরা আলাদা বাড়িতে থাকেন শুনে মা যেন খুশি হলেন, 'যাক গে, এবার ও নিজের মতো নিশ্চয়ই থাকতে পারছে।'

বিস্তৃত ব্যাখ্যা আমি চাইলাম না।

মা চলে যাওয়ার পর শ্রাদ্ধের কার্ড পাঠিয়েছিলাম। আমাদের রীতি অনুযায়ী ওটা অবনীমেসোর নামেই পাঠাতে হয়েছিল। কোনও প্রতিক্রিয়া পাইনি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হত কাজলমাসিকে অবনীমেসো খবরটা দিয়েছেন কিনা।

বছর দুয়েক বাদে এক সকালে ফোনটা এল, 'আপনি বোধহয় আমাকে চিনবেন না!'

কোনও মহিলা কণ্ঠ এভাবে শুরু করলে আমি বিরক্ত হই। যদি সেই সংশয় থাকে তাহলে নিজের নাম বলেই তো শুরু করতে পারে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মহিলার বোধ ফিরল। 'আমি ঝিমলি, আমার মাকে আপনি কাজলমাসি বলেন।'

মুহূর্তেই বদলে গেলাম, 'ওহো! কেমন আছ?'

'আপনার সঙ্গে আমার কখনও কথা বলার সুযোগ হয়নি। এই টেলিফোন নাম্বারটা আমি বিষ্ণুকাকার কাছ থেকে পেয়েছি। আপনি মাকে দিয়ে এসেছিলেন।'

'খুব ভাল লাগছে তোমার ফোন পেয়ে। কাজলমাসি কেমন আছেন?'

'মা, মায়ের মতন আছেন।' একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কিছু জানেন না?'

'কী ব্যাপারে বলো তো?'

'মাকে দেখতে প্রত্যেক সপ্তাহে দু'দিন আমাকে যেতে হয়।' ঝিমলি বলল।

'কেন?'

'মায়ের মন ভাল নেই।'

'ভাল না থাকারই কথা। অন্তত সেবার গিয়ে আমার তাই মনে হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'অবনীমেসোমশাই কেমন আছেন?'

ঝিমলি বলল, 'অবনীবাবু দিব্যি আছেন।'

হেসে ফেললাম, 'তুমি অবনীবাবু বলো নাকি?'

'কী বলব?' তীক্ষ্ণ শোনাল ঝিমলির গলা।

'সবাই যা বলে থাকে।'

'সরি। ওই লোকটিকে আমি আবার বাবা বলে মনে করি না। আচ্ছা আজ রাখছি। আপনার মোবাইলে নিশ্চয়ই আমার নাম্বার দেখতে পেয়েছেন।'

ঝিমলির শেষ কথাটা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল। কয়েক দিন ধরে মনে হচ্ছিল ওকে ফোন করে কারণ জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু ওই লাইনটা বলার সময় গলার স্বরে যে অভিব্যক্তি ফুটেছিল তার পরে আর খোঁচাতে চাইনি।

এরও কয়েক মাস পরে কৃষ্ণনগরের বইমেলায় আমন্ত্রণ পেলাম। উদ্যোক্তারা বললেন, অনুষ্ঠানের পর রাত্রে থাকার ভাল ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমি ফিরে আসতে চাইলে ঠিক হল ওঁরা গাড়িতে পৌঁছে দেবেন। একটু রাত হবে এই যা।

যাওয়ার সময় ট্রেনে গেলাম। বাদকুল্লা স্টেশনটি দেখার পর কাজলমাসির মুখ মনে পড়ল। ঝিমলি বলেছিল কাজলমাসির মন ভাল নেই। কাজলমাসি আর মা অঞ্জনা নদীর ধারে জ্যোৎস্না রাত্রে গান গেয়েছিলেন।

বইমেলার অনুষ্ঠান শেষ করে গাড়িতে উঠতে রাত আটটা বেজে গেল। এখন আমি আর ড্রাইভার। বারোটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাব বলে আশ্বাস দিয়েছে ড্রাইভার।

বাদকুল্লায় আসামাত্র মনে হল পাঁচ মিনিট দেরি হলে এমন কোনও ক্ষতি হবে না, কাজলমাসির সঙ্গে দুটো কথা বলেই যেতে পারি। ড্রাইভার রাজি হল। কিন্তু অবনীমেসোর বাড়ির সামনে পৌঁছাতেই টায়ার থেকে হাওয়া বের হয়ে গেল। ড্রাইভার বিরক্ত-গলায় বলল, 'শালারা পেরেক ছড়িয়ে রেখেছে। তাড়াতাড়ি আসুন, স্টেপনি লাগিয়ে নিচ্ছি।'

ভেতরে ঢুকলাম। অবনীমেসো যে বাড়িতে থাকেন তার জানলার কাচে আলো জ্বলছে। এখন শীতের শুরু। বেশ ঠাণ্ডা ভাব। এই সময় চাঁদ উঠল।

দ্রুত জ্যোৎস্না গিলে খেল চরাচরকে। দেখলাম অঞ্জনা নদী আরও শুকিয়ে গিয়েছে। জল বোধহয় হাঁটুর ওপরে স্থির।

'কে?'

'আমি। বিষ্ণুদা নাকি?'

এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ, হাতে টর্চ। মুখের ওপর আলো ফেলে চাপা গলায় বললেন, 'একি? তুমি? ও হ্যাঁ, তোমার তো আজ কেশনগরে যাওয়ার কথা। পোস্টার পড়েছে। যাক, তবু মনে পড়ল।'

'কেমন আছ তোমরা?'

'কোনও খবর পাওনি? ঝিমলি বলেছিল ফোন করেছে।'

'হ্যাঁ। করেছিল। অবনীমেসোর খাওয়া হয়ে গিয়েছে?'

'দাঁড়াও।' সামনের বাড়ির দরজার কড়া নাড়ল বিষ্ণুদা। একটু বাদে যিনি দরজা খুললেন তিনি যে আগের মধ্যবয়সিনী নন তাতে আমি নিঃসন্দেহ। বিষ্ণুদা তাকে চাপা গলায় কিছু বলতে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে মাথা নাড়লেন।

বিষ্ণুদা বললেন, 'যাও। জেগে আছেন। তবে বেশিক্ষণ থেকো না।'

মহিলাই আমাকে নিয়ে গেল অবনীমেসোর ঘরে। সেখানে তখন টিভি চলছে। অবনীমেসো টিভি দেখছিলেন। তাঁর বাঁ দিকের টেবিলে মদের গ্লাস, জল আর মাছ ভাজা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এত রাত্রে? হঠাৎ?'

'কৃষ্ণনগরে এসেছিলাম, ফেরার পথে ভাবলাম—।'

'নিশ্চয়ই আমার কাছে আসোনি?'

'আমি তো প্রথমে আপনার কাছেই এলাম।'

'বাঃ। গুড। তুমি কি এসব খাও?'

'খাই না বলব না, এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'আমি খাই, রোজই।'

'পরিমিত খেলে অসুবিধে কিছু নেই।'

'বাঃ। দ্যাখো, জীবন তো একবারই আসে, যায়। এই সময়টুকু যে যার মতো যদি উপভোগ করে তাহলে কি তুমি অপছন্দ করবে?'

'নিশ্চয়ই না।'

'আরে! তুমি দেখছি অন্যরকম। তোমাকে ভুল ভেবেছিলাম। বসো বসো।'

'আমাকে এখনই কলকাতায় ফিরতে হবে যে।'

'কেন? আজকের রাতটা এখানেই থেকে যাও।'

'উদ্যোক্তারা গাড়ি দিয়েছে। আমাকে পৌঁছে ওটা আবার ফিরবে।'

'এখান থেকেই ফিরে যাক। গাড়ি ক'টা চাও? কাল সকালে ব্যবস্থা হবে।'

'না মেসোমশাই—।'

'আবার না বলে!' লম্বা চুমুক দিলেন অবনীমেসো। এমনিতেই গলার স্বর জড়িয়ে এসেছিল, বোঝা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ পানে আছেন। হঠাৎ বললেন, 'তুমি নাকি একজন লেখক। আমার ডাক্তার বলেন, তুমি ভাল লেখো। আমাকে তোমার কেমন লাগে?'

আমি হাসলাম। ঘড়ি দেখলাম।

'আমার মেয়ে ঝিমলির সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'একদিন ফোন করেছিল।'

'অ। সে আমাকে বাবা বলে স্বীকার করে না।' বলেই হো হো শব্দে হাসলেন অবনীমেসো, 'আরে আমি যদি না থাকতাম তুই পৃথিবীতে আসতিস? ইডিয়ট! আমি ওকে বলি প্রোডাক্ট অফ ডিপ ফ্রিজ। মানে বুঝলে?'

'না।'

'বিয়ের পরেই বুঝলাম আমার বিয়ে হয়েছে একটি ডিপ ফ্রিজের সঙ্গে যা শুধু ঠাণ্ডা নয়, হিমশীতল। কোনও রকমে তিনি মা হয়ে যেতেই মেরুবাসিনী হয়ে গেলেন। কিন্তু আমাকে তো বাঁচতে হবে। আমি বাঁচার রাস্তা খুঁজে নিলাম। আর তাতেই আমি নাকি লম্বট, মাতাল, চরিত্রহীন হয়ে গেলাম। আমাকে বাবা বলতে মেয়ের ঘৃণা হয়। তোমার কি তাই হচ্ছে?'

'আজ্ঞে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। তুমি দেখছি বংশছাড়া! এঃ, বড্ড দেরিতে আলাপ হল হে! আজকাল, বুঝলে, জীবনটাকে ঠিকঠাক উপভোগ করতে পারি না। না না, মন চায় কিন্তু শরীর বাদ সাধে। এই যে শরীর, ওপরটাকে ঠিকঠাক করে রাখি কিন্তু ভেতরের গড়বড় তো আমি সারাতে পারব না। ডাক্তার পাল্টে পাল্টে চলেছি।' বলেই খেয়াল হল, 'এই যে খুকুসোনা, গ্লাসটা যে কাঁদছে চোখে পড়েনি?'

যার উদ্দেশে বলা সে এগিয়ে এসে যখন বোতল থেকে হুইস্কি ঢালছিল গ্লাসে তখন ভাল করে দেখলাম। না, মহিলা বদলে গেছে। এই মফস্সলে ব্যক্তিগত কাজের জন্যে মহিলা পাওয়া যায়? অবনীমেসো চুমুক দিয়ে বললেন, 'তুমি যখন এসেছিলে তখন এ ছিল না। আগেরটি বড্ড চুরি করত।'

বললাম, 'এবার উঠতেই হবে।'

'হোক। আমার ইচ্ছেয় আসনি, আমার ইচ্ছেয় যাবে না। এসো মাঝে মাঝে। একবার একসঙ্গে খাওয়া যাবে। বুঝলে, আগে আট-দশ গ্লাস বেমালুম মেরে

দিতাম, এখন পাঁচের বেশি পারি না। নেশা হয় না কিন্তু পেটের ভেতরে পিঁপড়ে কামড়ায়। একদম লাল পিঁপড়ের কামড়।'

'ডাক্তার কী বলছেন?'

'ডাক্তার বী বলবে? আমার ঠিকুজিতে আছে অষ্টাশি বছর সাত মাস তিন দিন বাঁচব। লং ওয়ে টু গো।' অবনীমেসো আবার গ্লাস তুলতেই আমি বেরিয়ে এলাম।

জ্যোৎস্নার তেজ বেড়ে গেছে এর মধ্যেই। গাড়ির হর্ন কানে এল। সম্ভবত চাকা পরিবর্তন করে ড্রাইভার জানান দিচ্ছে। বিষ্ণুদা ছিলেন কাছাকাছি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখলে?'

'হ্যাঁ।' তারপর দ্বিতীয় বাড়ির দিকে তাকালাম, 'কাজলমাসি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'না।'

আমি সেদিকে এগোতেই বিষ্ণুদা বললেন, 'না গেলেই নয়?'

'মানে? এ বাড়িতে এসে কাজলমাসির সঙ্গে দেখা না করে চলে যাব?'

'বেশ!'

ঘরে খুব কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। বিছানায় বসে আছেন কাজলমাসি। চট করে মনে হবে পাথরের মূর্তি। পরনে ময়লাটে সাদা শাড়ি। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, 'কাজলমাসি?'

অবাক হয়ে দেখলাম ওঁর কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। চোখে কম দেখছিলেন শুনে গিয়েছিলাম, কানেও কি শুনতে পাচ্ছেন না? বিষ্ণুদা পেছনে ছিলেন, তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি মাথা নিচু করলেন।

এবার এগিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতেই দেখলাম তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাজলমাসি, আমাকে চিনতে পারছ না?'

চোখের পাতা পড়ল না। ঠোঁট কাঁপল না একটুও, যেমন বসে ছিলেন তেমনি রইলেন। আমি মরিয়া হয়ে দু'বার চেঁচিয়ে নাম ধরে ডাকার পর বিষ্ণুদার গলা কানে এল, 'মা শুনতে পাচ্ছেন না।'

'মানে?'

'মা আর কানে শোনেন না, কথা বলতে পারেন না। খাইয়ে দিলে খান। প্রত্যেক হপ্তায় কলকাতা থেকে ঝিমলিদিদি আসেন। প্রথম প্রথম মাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতেন। অনেক বড় ডাক্তারকে এখানে এনেছেন। তাঁরা বলেছেন মায়ের শরীরটা রয়েছে কিন্তু মন মরে গেছে। এই অসুখ নাকি সারে না।' বিষ্ণুদা বললেন।

'কবে থেকে হয়েছে?'

'তুমি যে বছর এসেছিলে তার পরের বছর, দোলপূর্ণিমার দিন।'

'কীভাবে হল?'

'শুনে কী করবে?'

'তবু শুনি—!'

'জ্যোছনার মধ্যে মা অঞ্জনা নদীর ধারে গিয়েছিলেন। ওই বাড়ির ঘাটেই। হঠাৎ দুটো লোক এসে বাবুর দরজায় আঘাত করে। আমি আটকাতে পারি না। ওরা বাবুকে খুব গালমন্দ করে। বাবু বন্দুক বের করেন। ওরা মেয়েটাকে নিয়ে চলে যায়। লোক দুটোর একজন ছিল মেয়েটার স্বামী। ওই সব শুনে, দেখে, মা খুব জোরে কেঁদে ওঠেন। তখন বাবুর নজর পড়ে মায়ের ওপর। মাকে গালাগাল করতে শুরু করেন। মা ভয় পেয়ে বসে পড়েন। আমরা কোনও মতে মাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাই। মায়ের সারা শরীর প্রচণ্ড কাঁপতে থাকে। ডাক্তার ডেকে আনি। কোনও লাভ হয়নি। সেই থেকে মা বেঁচে মরে আছেন।' বিষ্ণুদা কেটে কেটে কথাগুলো বললেন।

'অবনীমেসোমশাই এসেছিলেন?'

'এসেছিলেন। পরদিন বিকেলে। ততক্ষণে ঝিমলি খবর পেয়ে চলে এসেছিল। সে বাবুকে ঢুকতে দেয়নি।'

'দেয়নি?'

'না। মুখের ওপর বলেছিল, আপনি আমার মায়ের কেউ নন। যার সঙ্গে মায়ের বিয়ে হয়েছিল সেই লোকটা মরে গেছে। আপনি এই বাড়িতে ঢুকবেন না।' বিষ্ণুদা জানালেন।

কাজলমাসির দিকে তাকালাম।

সেই কিশোরবেলায় জ্যোৎস্নারাত্রে পাশের অঞ্জনা নদীর ধারে বসে মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাজলমাসি গেয়েছিলেন, 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে।'

ওঁর হাত দু'হাতে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সন্তর্পণে নামিয়ে রাখলাম।

গাড়িতে বসে আচমকা মনে হল, এর আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন কি কাজলমাসির মন বেঁচে ছিল? অবনীমেসো যে মনকে হিমশীতল বলেছেন তাকে তপ্ত করার কোনও চেষ্টাই কোনও দিনও করেননি। দুটি হৃদয় পাশাপাশি রয়েছেন এত দিন। একজন জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে আর একজন নিজস্ব আনন্দের সন্ধানে জীবন খুঁড়ে যাচ্ছেন অবিরত। এই খোঁড়া সব সময় সুখের হয় না, যন্ত্রণা চলে আসে ভেতর বাইরে।

কিন্তু নির্লিপ্ত কাজলমাসির মন শরীর আরও গভীর নির্লিপ্তিতে চলে গেছে। সাধকদের সমাধি হলে শরীর মন চৈতন্যলুপ্ত হয়।

কাজলমাসির জন্য আর আমার খারাপ লাগছিল না। উনি ভালই আছেন।

মনের আয়না

মুখ হল মনের আয়না। যেদিন প্রথম এই লাইনটা পড়েছিলাম সেদিনই আশপাশের মানুষের মুখ খুঁটিয়ে দেখা শুরু করলাম। কারও চোখে, নাকে, চিবুকে নরম নরম সরল ভাব দেখতে পেলেই ভেবে নিতাম এর মুখ আকাশের মতো উদার। তখন আমার ষোল বছর বয়স। পিতৃদেবের মুখের দিকে তাকালে কংস বলে মনে হত। আমাকে দেখলেই তাঁর মনে হত পড়াশুনা ছাড়া আর সব করছি। সেই মনে হওয়াটা বাক্যের মধ্যে মিশিয়ে দিতেন তিনি। তাঁর মুখে কোনো নরম ভাব ছিল না।

পাশের বাড়ির বিনয়দার মুখ ছিল শরতের আকাশের মতো। দেখলেই মনে হত দিনটা ভালো যাবে। ওর ঠাকুমা নাকি ঘুম থেকে উঠে চোখ না খুলে চেঁচিয়ে ডাকতেন, 'ও বিনু, বিনুরে, সামনে আয়, তোকে দেখতে দেখতে চোখ খুলি।' সেই বিনয়দা আচমকা আমাকে বললেন, 'এই চার আনা দে তো।'

বললাম, 'চার আনা নেই, আধুলি আছে।'

'তাই দে।'

দেওয়ার সাতদিন পরে ফেরত চাইলে বললেন, 'সেকি রে! দিয়ে আবার ফেরত চাইছিস? তোর তো কালীঘাটে গিয়ে কুকুর হতে হবে।'

এই বিনয়দাকে কুড়ি বছর পরে আবার দেখলাম। জামাকাপড় বলে দিচ্ছে আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে সরল হাসি হাসলেন, 'কুড়িটা টাকা দে তো?'

বললাম, 'তুমি দেখছি একটুও বদলাওনি।'

বিনয়দা বললেন, 'আমি এককথার মানুষ, কেন বদলাবো?'

বাল্যকালে শুনতাম, মা-মাসিরা বলতেন, 'মুখ দেখে বোঝা যায় না; পেটে পেটে এত?' তাহলে সত্যি মুখ দেখে বোঝা যায় না? অথচ মুখ মনের আয়না? খুব বিপাকে পড়লাম।

আমার প্রিয় বন্ধু মণ্টি একদিন ঘোষণা করল সে প্রেমে পড়েছে। আমরা অবাক। সেই প্রথম একজন জীবন্ত প্রেমিককে দেখলাম। যখন বলছিল তখন মণ্টির মুখখানা একদম অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। একটু লাজুক লালচে, খুশিতে ঝকঝকে। প্রেমে পড়লে যদি মানুষের মুখ অন্যরকম হয়ে যায় তাহলে মানতেই হবে মুখ মনের আয়না। শুধু মুখ নয়, ওর কথাবার্তার ধরন এবং ব্যবহারও বদলে গেল। কিছু চাইলেই আপত্তি না করে দিয়ে দিচ্ছে। বেশ্ উদার হয়ে গেল সে।

এখন প্রশ্ন হল, প্রেমিকাটি কে? উত্তরটা কিছুতেই দেবে না মণ্টি, বলল, 'ওটা

আমার গোপন ব্যাপার।' শেষ পর্যন্ত চাপাচাপিতে জানাল মেয়েটি সদর গার্লস স্কুলের ক্লাশ এইটের ছাত্রী। আমাদের ইচ্ছে হল তাকে দর্শন করার। মন্টির তীব্র আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে আমরা ছুটির একটু আগে স্কুলের গেটের সামনে ব্রিজের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু বাদেই বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা বেরুল হৈ হৈ করতে করতে। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম অজান্তেই। ওরা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় গ্রাহ্যই করছে না। সবাই এক ইউনিফর্মে। আমরা মন্টিকে জিজ্ঞাসা করছি কোন মেয়ে তার প্রেমিকা কিন্তু সে জবাব দিচ্ছিল না। এইসময় এক দঙ্গল মেয়ে গেট থেকে বেরিয়ে এল হাসতে হাসতে। কিশোরীবেলা শেষ হচ্ছে ওদের। ওদের মধ্যে লম্বা সুন্দরী মেয়েটি যেন একটু বেশি হাসছে। কিন্তু যেই তার চোখ আমাদের ওপর পড়ল অমনি হাসি মুছে গিয়ে অন্ধকার নামল মুখে। পৃথিবীর সব গাম্ভীর্য মুখে এঁটে সে একটি রিকশায় উঠে চলে গেল। দ্বিতীয়বার তাকায়নি সে। যেন ছিল পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, হয়ে গেল কালবৈশাখী। এত দ্রুত যদি মুখের চেহারা বদলে যায় তাহলে কি বুঝতে পারি? মন্টি শ্বাস ফেলে বলল, 'রিকশায় যে উঠল সে-ই সুদর্শনা। রিকশাতেই যাতায়াত করে ও।' এক বন্ধু ফিসফিস করে বলল, 'একদম মধুবালার মতো দেখতে।'

দু'দিন বাদে মন্টি এলেই ওর মুখ দেখে মনে হল, আকাশজোড়া কালো মেঘ, যেকোনো মুহূর্তেই বৃষ্টি নামবে। এই বোঝাটা যে মিথ্যে হল না তাতে আমি খুশি হলাম। মন্টি জানাল সুদর্শনা আর তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। খবরটা পাওয়ার পর সে সারারাত ঘুমাতে পারেনি। সুদর্শনার ভালোবাসা ছাড়া বেঁচে থাকার চেয়ে আত্মহত্যা করা অনেক ভালো। কিরকম পাগল পাগল লাগছে তার।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'হঠাৎ সুদর্শনা এই সিদ্ধান্ত কেন নিল?'

পকেট থেকে একটা ছোট কাগজ বের করে ভাঁজ খুলে মন্টি আমাকে দিলে পড়লাম, 'আমি চিড়িয়াখানার জীব নই যে লোক জুটিয়ে দেখাতে আনবে! আমি কি বারোয়ারি দুর্গাপ্রতিমা? ছিঃ।'

মন্টি বলল, 'বাকিটা ও লেখেনি, বন্ধুকে বলতে বলেছে।'

আমি ওর কাঁধে হাত রেখেছিলাম, 'যে মেয়ে এক লহমায় নিজের মুখের চেহারা বদলাতে পারে সে খুব বিপজ্জনক। গেছে, ভালোই হয়েছে।' সেই বয়সে মেয়েদের সঙ্গে মেশার সুযোগ না পেয়েও একজন বিশেষজ্ঞের মতো কথা বলেছিলাম।

মাস দেড়েক বাদে মন্টি এক রবিবারের সকালে এল আমাদের বাড়িতে। ও এসেই বাইরে থেকে সাইকেলের বেল বাজাত, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখা করতাম। মা বলতেন, 'ওই যে শ্যামের বাঁশি বাজল।'

সাইকেলে হেলান দিয়ে মন্টি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এক জীবনে ক'জনকে ভালোবাসা যায়? ভালো করে ভেবে বল!'

'বোকার মতো প্রশ্ন। মাকে ভালোবাসি বলে পিসিমাকে ভালো বাসব না কেন? বোন কি দোষ করল? তাকেও তো ভালোবাসি। এতে ভাবাভাবির কি আছে?'

'আঃ! ওই ভালোবাসার কথা বলছি না। মায়ের সঙ্গে তো প্রেম করি না।'

'ও!'

'সেদিন বাংলা স্যার বলছিলেন প্রকৃত প্রেমের মৃত্যু হয় না। রাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন। কাজে ব্যস্ত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলে গিয়েছিলেন, আর কখনও বৃন্দাবনে আসার সময় পাননি। কিন্তু রাধা আর কাউকে ভালোবাসেননি।' মন্টি বলেছিল মুখ গম্ভীর করে।

সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, ওর ওই গাম্ভীর্য সুদর্শনার জন্যে নয়। হৃদয় আহত হলে মুখের যে চেহারা হয় সেরকম মুখ হয়নি। এখন ওর মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ।

'এর কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। ভালো তো জোর করে বাসা যায় না। হঠাৎ হঠাৎ মনে এসে জুড়ে বসে। কোনো সমস্যা হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করলাম।

নীরবে মাথা নাড়ল মন্টি, 'টিউলিপ।'

'টিউলিপ? মানে?'

'সুদর্শনা আর টিউলিপ একই ক্লাসে পড়ে।'

'এরকম নাম আগে শুনিনি।'

'তুই পারুল, চামেলি, বকুল, টগর, গোলাপী, রজনীগন্ধার নাম শুনিসনি?'

'শুনেছি। কিন্তু টিউলিপ তো বিদেশি ফুল।'

'ঠিক তাই। ওকে দেখলে তোর মনে হবে ও বিদেশিনী। খুব ফর্সা, চোখ নীল, হাঁটু অবধি ঢেউ খেলানো চুল কিন্তু কালো।'

'মুখ?'

হেসে ফেলল মন্টি। গালে লাল ছোপ পড়ল, বলল, 'কি করে বোঝাই!'

'একটু চেষ্টা কর।' বললাম আমি।

চোখ বন্ধ করে একটু ভেবে মন্টি বলেছিল, 'ও সামনে এসে তোর দিকে তাকিয়ে একবার হাসলে সব শোক ভুলে যাবি।'

'কিন্তু—!' আমি ওর আবেগের বহর দেখে চিন্তায় পড়লাম, 'ও যখন জানবে তোর সঙ্গে সুদর্শনার প্রেম-প্রেম সম্পর্ক ছিল তখন কি হবে? এক ক্লাসে পড়ে যখন তখন জানতেই পারবে।'

মন্টি আমার কাঁধে হাত রাখল, 'টিউলিপ ওসব নিয়ে মোটেই ভাবে না। আমাকে লিখেছে। এই দ্যাখ।'

পকেট থেকে খাম বের করে দিল সে। খামের ভেতর সুন্দর কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, 'ফুল ভেবে কাঁটায় হাত দিলে রক্ত তো ঝরবেই। কিন্তু সেই স্মৃতি মনে রাখলে আরও বেশি ভুল করা হবে। আপনার জন্যে আমারও কষ্ট হচ্ছে। সত্যি।'

মন্টি জিজ্ঞাসা করল, 'কি বুঝলি?'

'অসাধারণ।'

'ও হাসলে তাই মনে হয়। গজদাঁত আছে যে।'

'তোর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হয়েছে?'

'এখনও হয়নি। হবে। রাত ভোর হলে সূর্য তো উঠবেই।'

মুখ যদি মনের আয়না হয় এবং সেই মুখে যদি গজদাঁত থাকে তাহলে তার ব্যাখ্যা কি হবে? গজদাঁত সবার থাকে না। মাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সুন্দর গজদাঁত থাকলে হাসি খুব মিষ্টি হয়। টিউলিপের গজদাঁত সুন্দর কিনা আমি জানি না।

আমার অনুরোধে মন্টি এক বিকেলে নিয়ে গেল সদর স্কুলের সামনে। এদিন অন্য বন্ধুদের বলা হয়নি। শর্ত দিয়েছিল আমি যেন কখনও আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে না আসি। এক ভুল সে দ্বিতীয়বার করতে চায় না।

স্কুলে ছুটি হল। হাসতে হাসতে মেয়েরা বের হচ্ছে। আড়াল থেকে দেখতে পেলাম সুদর্শনা রজনীগন্ধার মতো ঝকঝকে হয়ে বান্ধবীদের সঙ্গ ছেড়ে রিকশায় উঠল তাদের হাত নাড়তে নাড়তে। ওর মুখে বিন্দুমাত্র বিষাদ নেই। আরও কয়েকটি মেয়ে বেরিয়ে আসার পরে যে মেয়েটি বই-এর ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বের হল সে তেমন লম্বা না হলেও দেখতে মিষ্টি। পাশে দাঁড়িয়ে মন্টি ফিসফিস করে বলল, 'টিউলিপ।'

স্বাভাবিক মুখে হেঁটে যাচ্ছিল টিউলিপ। ঠোঁট বন্ধ থাকায় আমি ওর গজদাঁত দেখতে পাচ্ছি না। রিকশায় উঠে সে যখন চলে গেল তখন মন্টি জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন দেখলি?'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।' সত্যি কথাই বললাম আমি।

'কেন?'

'ওর মুখ ভালো করে দেখতে পেলাম না যে।'

'আহা, মাথা থেকে পা অবধি তো দেখলি!' মন্টি বিরক্ত হল।

'হাত-পা দেখে মন বোঝা যায় না।' জবাব দিয়েছিলাম।

বাবুপাড়া পাঠাগার থেকে গল্পের বই আনার নেশা ছিল। সবই বাংলায়। হঠাৎ ইংরেজি বই-এর আলমারির সামনে গিয়ে দেখতে দেখতে বইটাকে পেয়ে গেলাম। ওটা বের করে যখন খাতায় লিখে নিচ্ছি তখন লাইব্রেরিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা তুমি পড়বে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। বুঝলাম তিনি বেশ অবাক হয়ে গেছেন।

বইটির নাম, দি ফেস। ইংরেজি বই পড়ার অভ্যেস ছিল না। পাশে অভিধান রেখে পড়তে গিয়ে দেখলাম অসুবিধে হচ্ছে না। পুরুষদের কপালের গড়ন, চোখের আকৃতি, চোখের তারার রঙ, ভ্রু, নাকের গঠন, ঠোঁট, চিবুক থেকে শুরু করে গাল এবং কান পর্যন্ত প্রতিটি অংশের ছবি এঁকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ওরকম যদি কোনো মানুষের সঙ্গে মেলে তাহলে তার স্বভাব কেমন হবে। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল আমি বেশ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি। কিন্তু মুশকিল হল, ওই বই-এ গজদাঁত নিয়ে একটি বাক্যও বলা হয়নি। অথচ টিউলিপের গজদাঁত রয়েছে।

এক রবিবারে বাবা আমাকে ডেকে বললেন, 'এই রেকর্ডগুলো অবনীবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। উনি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন, ওঁর জিনিস আর রাখা উচিত নয়।'

'অবনীবাবু কে?'

'দু-দিন এসেছিলেন এই বাড়িতে। বিকেলে বাড়িতে থাকলে তো জানতে পারবে? উনি ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার।' বাড়িটা বুঝিয়ে দিলেন বাবা।

মফস্বল শহরের ওইরকম পদাধিকারীরা নিজেদের কেউকেটা ভাবেন বলে আমি বা আমার বন্ধুরা খবর রাখতে চাই না। বাবার আদেশে যেতে হল। বিশাল লন, ফুলের বাগানের ওপারে দোতলা বাড়ি। মনে মনে বললাম, সরকারের টাকায় কি সুখে আছে!

বেয়ারা বলল, 'সাহেব একটু আগে বেরিয়ে গেলেন, ফিরতে রাত হবে।'

বললাম, 'এই রেকর্ডগুলো ওঁকে দিয়ে দিও।'

'একটু দাঁড়ান, কেউ কিছু দিলে সাহেব নিতে নিষেধ করেছেন। আমি ওপরে গিয়ে মেমসাহেবকে দেখাই, তিনি নিতে বললে আপনি চলে যাবেন।'

বেয়ারা রেকর্ডগুলো নিয়ে চলে গেলে মনে হল সাহেব লোকটা বোধহয় সৎ মানুষ। ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ব্যবসায়ীরা উপঢৌকন দিতেই চাইবে।

বেয়ারার সঙ্গে যে মেয়েটি নেমে এল তার পরনে রঙিন স্কার্ট। মুখে একটু গম্ভীর ছাপ থাকলেও 'দি ফেস' বলছে মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী এবং স্পষ্টবাদী।

'আপনি কি সুজনকাকার কেউ হন?' মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। উনি আমার বাবা।'

'বসুন। মা আপনাকে একটু বসতে বললেন। আপনার নাম আমি জানি, কাকার মুখেই শুনেছি। আমি টিউলিপ।' মেয়েটি হাসতেই গজদাঁত দেখতে পেলাম।

আমার বুকে তখন ঝড় উঠেছে। মন্টির দ্বিতীয় প্রেমিকা আমার বাবার পরিচিতজনের মেয়ে। কথা বলার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা এখান থেকে চলে যাচ্ছেন বলে শুনলাম।'

'রাইট। বাবা ট্র্যান্সফার হলে আমাদেরও সঙ্গে যেতে হয়।'

'এই শহরের কিছু মনে থাকবে তখন?' মন্টির জন্যে কষ্ট হচ্ছিল আমার।

'নিশ্চয়ই। এখানে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। আমাদের স্কুলটা খুব ভালো। স্কুলের বান্ধবীরাও চমৎকার। খুব মিস করব ওদের।' বলল টিউলিপ।

'আর কিছু মিস করবেন না?'

'নিশ্চয়ই। এখানকার নদী, চা-বাগান—অনেক কিছু।'

'কোনো মানুষকে মনে পড়বে না?'

টিউলিপ আমাকে স্পষ্ট দেখল, 'কয়েকজনকে মনে থাকবে। তবে ক'দিন থাকবে তা জানি না। কেউ অকারণে দুঃখ পেলে আমার খুব খারাপ লাগে।'

এইসময় টিউলিপের মা নেমে এলেন। বেশি বয়স বলে মনে হচ্ছে না, সুন্দরী। মুখ দেখলাম, সুখের ছবি সেখানে।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খারাপ লাগে তোর?' বলেই সামনে বসে বললেন, 'সুজনবাবুর ছেলে তুমি! কি নাম?'

আমি কিছু বলার আগেই টিউলিপ নাম বলে দিল।

মহিলা বললেন, 'কি খাবে বল? ঠাণ্ডা না গরম?'

মাথা নাড়লাম, 'এই সময় আমি কিছু খাই না। হ্যাঁ, কেন খারাপ লাগে?' আমি টিউলিপের দিকে তাকালাম।

টিউলিপ হাসল, 'আমার লেটেস্ট খারাপ লাগার ব্যাপারটা বলো মা।'

মহিলা বললেন, 'ও একদম পাগল। ওদের ক্লাশের একটি মেয়ের সঙ্গে কোনো একটা ছেলের আলাপ হয়েছিল। ছেলেটি তার বন্ধুদের নিয়ে এসেছিল দূর থেকে ওই মেয়েটিকে দেখাবে বলে। সেটা জানতে পেরে মেয়েটি রেগে গিয়ে সম্পর্ক রাখতে চায়নি। এটা শুনে আমার মেয়ের মনে দুঃখ হল। ভাবল ওই ছেলেটি অকারণে কষ্ট পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে দুই লাইন লিখে সান্ত্বনা দিয়ে দিল। এসব করলে যে লোকে অন্য মানে করবে তা মাথায় ঢুকল না।'

'অন্য মানে করবে মানে? আমি কাউকে স্বাভাবিক হতে সাহায্য করতে পারি না? আর যদি করে তো করুক। আই ডোন্ট কেয়ার। কাউকে সান্ত্বনা দেওয়া মানে নিশ্চয়ই প্রেম করা নয়।' বলে টিউলিপ আমার দিকে তাকাল, 'ওই ছেলে যাকে

চিনি না জানি না তাকে মনে রাখতে যাব কেন? বলুন।'

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওকে চিঠিটা দিলেন কি ভাবে?'

'আমার সঙ্গে একটা মেয়ে পড়ে যে কিনা ছেলেটির পাশের বাড়িতে থাকে। সেই মেয়েকে বলেছিলাম ওকে বল ভুলে যেতে। সে বলল, আমি বললে কানে তুলবে না, তুমি লিখে দাও। দিয়েছিলাম। এর মধ্যে অন্যায় কোথায়?'

টিউলিপরা শহর ছেড়ে চলে যাওয়াতে মন্টি খুব শোকার্ত হয়েছিল। কিন্তু সেটা চার সপ্তাহের বেশি নয়। তৃতীয় প্রেমিকার সন্ধান পেয়ে গেল সে। এসে বলল, 'ভালোবাসা হল মেঘের মত। বুকের আকাশে আসে আবার মিলিয়ে যায়। কোন মেঘ চিরকাল আকাশে এক জায়গায় আটকে থাকে বল? কিন্তু এটা অসাধারণ। তবে ওর মুখে নেপালি নেপালি ছাপ আছে। একটু দেখে বলবি?'

'দি ফেস' বইতে সব আছে, কিন্তু মঙ্গোলিয়ান মুখ নিয়ে কোনো ব্যাখ্যা নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওর পায়ের পাতা সমানভাবে মাটিতে পড়ে?'

'জানি না। কেন?'

'না পড়লে ও দুটো খড়ম পা। তুই দুঃখ পাবি।'

বিরক্ত হয়ে মন্টি বলল, 'তুই এতদিন বলতিস মুখ হল মনের আয়না।'

'ঠিক তাই। তবে আপাদমস্তক বলে একটা কথা আছে। তাতে পাকেও খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।'

তবু যেতে হল। এবার স্কুলে নয়। পুজোর প্যান্ডেলে। এটা বেশ ভালো দেখতে। কিন্তু চোখ চেরা, নাক চাপা। আমার জ্ঞানে এই মুখ সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। অন্যমনস্ক হয়ে প্রতিমার দিকে তাকালাম। ডাকের সাজের দুর্গা। নাক বোঁচা, চোখ চেরা। মায়ের এই মুখ দেখে কি মনের অস্পষ্টটা ধরা পড়বে? ওই মুখ দেখলে বিশ্বাসই হবে না ইনি যুদ্ধ করছেন!

মন্টিকে বললাম, 'খুব ভালো। ঠিক দুর্গা ঠাকুরের মতো।'

'তার মানে?' হকচকিয়ে গেল সে।

'দুর্গা তো পাহাড়ের মেয়ে। হিমালয়ে বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি কৈলাসে। তাই চোখ-নাক ওরকম। এটাও ওই দুর্গার মতো শান্তির পরিবেশ তৈরি করবে।' বললাম আমি।

বাড়িতে এসে 'দি ফেস' বইটা আবার পড়লাম। আগের বার পড়ার সময় শেষ করার পর পাতা ওল্টাইনি। আজ সেটা ওল্টাতেই একটা লাইন চোখে পড়ল, 'মুখ দেখে যে ব্যাখ্যা এই বইতে করা হয়েছে তা মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।'

মনোজ মাতাল

উত্তর বাংলার শেষ প্রান্তে এই ছোট্ট গঞ্জ এলাকায় দু-চারটে খবরের কাগজ অবশ্যই আসে। কিন্তু তাদের খদ্দের বেশি নয়। চৌমাথায় কানাই-এর চায়ের দোকানে সবচেয়ে সস্তার যে কাগজটা রাখা হয়ে থাকে সেটাকে নিয়ে সকাল থেকে একটার পর একটা দল রাজাউজির সারে। দুপুরের মধ্যেই কাগজটাকে ঠিকঠাক চেনা যায় না। কানাই-এর চায়ের দোকানের সামনেই বাস স্টপ। শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি থেকে যেসব বাস আরও দূরে যাচ্ছে তারা মিনিট পাঁচেকের জন্যে দাঁড়ায়। যাত্রীরা হুড়মুড়িয়ে নামে। তাদের ওপর ভরসা করেই কানাই ব্যবসা চালায়।

এই বিকেলে যখন ছেঁড়া কাগজ নিয়ে তিনটে বেকার যুবক খবর খোঁজার চেষ্টা করছিল তখন শিলিগুড়ির বাস এসে দাঁড়াল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কয়েকজন চা পান করে উঠেও গেল বাসে। তখনই ওই দোকানের একটি কর্মচারী চিৎকার করে বলল, 'আরে! বই ফেলে গেছে।' কানাই বলল, 'যা, তাড়াতাড়ি যা, বাসে দিয়ে আয়।' কিন্তু বাসের নাগাল পেল না ছেলেটা।

কানাই জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, বাংলা না ইংরেজি?'

কর্মচারী বলল, 'মনে হচ্ছে ইংরেজি।'

'রেখে দে ওপাশে।'

যে তিনজন ছেলে কাগজ নিয়ে বসে ছিল তাদের একজন শম্ভু। দশ ক্লাস পাশ করে বেকার বসে আছে। বলল, 'দেখি, কী বই!'

কর্মচারী যেটা দিয়ে গেল সেটা একটা রঙিন ইংরেজি পত্রিকা। ভেতরের পাতায় কিছু ছবি। বাবরি মসজিদ ভাঙার বিষয় নিয়ে কিছু লেখা। শম্ভু সরিয়ে রাখতে যাচ্ছিল মদন হাত বাড়িয়ে নিল। মলাটে বাবরি মসজিদ ভাঙার ছবি। কারও মুখ গামছায় বাঁধা কারও খালি। হঠাৎ উত্তেজিত হল মদন, 'আই, দ্যাখ দ্যাখ'। সে আঙুল রাখল যার ছবিতে সে এই গঞ্জেই থাকে। এককালে ভাল ছাত্র ছিল। ওর মতো ফর্সা সুন্দর চেহারা কারও ছিল না। এখন দিনরাত হাঁড়িয়া অথবা বাংলা খেয়ে পড়ে থাকে বলে ওর নাম হয়েছে মনোজ মাতাল। কেন সে মদ ধরল, ধরল তো কেন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেল তা নিয়ে অনেক গল্প আছে। মা মারা গিয়েছিল আগেই, বাবা মারা যাওয়ার পর ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। পৈতৃক ব্যবসা দাদা দ্যাখে বলে বাড়ির অন্যান্যদের অন্নের অভাব হয় না। শম্ভু এবং ছোটকা একমত হল। এই ছবি মনোজ মাতাল ছাড়া আর কারও নয়। কিন্তু কী করে সম্ভব? উত্তর বাংলার এই নিঝুম গঞ্জ থেকে মনোজ মাতাল কি করে অযোধ্যায় গিয়ে বাবরি মসজিদ ভাঙবে? এখানে সিপিএম, আর এস পি আর কংগ্রেস ছাড়া

কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। বিজেপি বা উগ্রবাদী হিন্দুদের কোন দলের সঙ্গে মনোজ মাতালের যোগাযোগ হওয়ার কথাই নয়। তাছাড়া এখান থেকে অযোধ্যা তো কম দূর নয়। অতটা পথ ট্রেনে চেপে মদ না খেয়ে সে যাবে কী করে? মদ ছাড়া যার এক বেলাও চলে না ট্রেনে সে মদ খাবে কী করে। কিন্তু ছবি বলছে এই লোকটা মনোজ মাতাল ছাড়া আর কেউ নয়। মনোজ মাতাল মসজিদ ভাঙছে। এরকম জঘন্য অপরাধ করল মনোজ মাতাল? পুলিশ জানতে পারলে নির্ঘাৎ দশ বছর জেল।

শম্ভু বলল, 'ওই অন্যায় কাজটা যখন করেছে তখন ওর জেলেই যাওয়া উচিত।' ছোটকা বলল, 'আচ্ছা, শুনেছি পৃথিবীতে একই রকম দেখতে দুটো লোক থাকে।' মদন মাথা নাড়ল, 'আমিও শুনেছি। আমার মনে হচ্ছে এই ছবিটা মনোজ মাতালের ডুপলিকেটের। আগে যখন মদ খেতো না তখন মনোজদা বলতাম। মনোজদা মহম্মদ রফি, তালাত মামুদের গান গাইত, মনে আছে?'

শম্ভু উঠে দাঁড়াল, এখনও ওকে বাড়িতে পাওয়া যাবে। পাঁচটার সময় বেরিয়ে রামচন্দ্রের ভাটিখানায় যায়। তার আগেই ওকে ছবিটা দেখাই, কী বলে শুনে আসি।'

বাজারের পেছনে মোটামুটি নির্জন এলাকায় বাড়িটা। গেট খুলতেই বিরাট উঠোন। উঠোনের দুপাশে দুটো কাঠের দোতলা। একটা লোক গরুকে খাবার দিচ্ছিল। শম্ভু তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মনোজদা বাড়িতে আছে?'

'এখনও আছে।' লোকটি জবাব দিল। তারপর বাঁ দিকের দোতলা দেখিয়ে বলল, 'ওপরে চলে যাও।'

কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতেই মনোজ মাতালকে দেখতে পেল ওরা। একটা ভাঙা বেতের চেয়ারে বসে আছে। আশেপাশে কেউ নেই। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে।

মদন ডাকল, 'মনোজদা!'

মনোজ মাতাল তাকাল, 'এখানে কেন? চাঁদা তো দাদাই দেয়।'

'আমরা চাঁদার জন্যে আসিনি। এই পত্রিকাটা একটু আগে পেলাম। দ্যাখো।'

'আমি দেখে কী করব?' হাত নাড়ল মনোজ মাতাল।

'তোমার ছবি ছাপা হয়েছে।' ছোটকা বলল।

'ভ্যাট। কই, দেখি!'

পত্রিকার মলাটে চোখ রাখল মনোজ মাতাল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট কামড়াল সে, 'না না এটা আমার ছবি না। কি যে দেখিস তোরা।'

'তোমার মুখের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই। ডান হাতে যে কোদালটা ধরেছ তার আঙুলের আংটিটা দ্যাখো।' শম্ভু বলল।

'কাকে কাকে দেখিয়েছিস পত্রিকাটা?'

'আমরা তিনজন ছাড়া কেউ দ্যাখেনি। তোমার ছবি নয় বলে যখন বলছ তখন কোন ভয় নেই। ঠিক আছে, চলি।' মদন বলল।

'দাঁড়া। ওটা রেখে যা। ভেতরের লেখাগুলো পড়ব।'

'কখন পড়বে? তোমার তো কাল দুপুরের আগে হুঁস ফিরবে না।'

'কি? এত বড় কথা বললি? বলতে পারলি?' চিৎকার করল মনোজ মাতাল।

ওরা আর দাঁড়াল না। পত্রিকাটা নিয়েই নিচে নেমে এল। ফেরার সময় ওরা তিনজনেই একমত হল, ছবিটা মনোজ মাতালের। সেই গরুর পরিচর্যা করা লোকটি একটা ব্যাগ নিয়ে ফিরছিল, যেচে জিজ্ঞাসা করল। 'কথা হয়েছে?'

শম্ভু বলল, 'হ্যাঁ।'

লোকটা হাসল, 'গত দুই বছরের মাত্র দুবার ওর কাছে লোক এল।'

'দুবার। আগেরবার কে এসেছিল।'

'ছোটোবাবুর কলেজের বন্ধু। দু'রাত ছিল। বাড়ি থেকে বের হয়নি। ওই দুদিন নেশা করেনি ছোটবাবু। তারপর বন্ধুর সঙ্গে কোথাও চলে গিয়েছিল। ফিরে এল কিছুদিন আগে। আচ্ছা, চলি।'

ওরা তিনজন পরস্পরের দিকে তাকাল। আর কোন সন্দেহ নেই।

শেষ পর্যন্ত ওরা একমত হল। এরকম জঘন্য অপরাধ যে করেছে তাকে ছেড়ে দেওয়া খুব অন্যায় হবে। হোক গঞ্জের ছেলে, মনোজ মাতাল বলে ক্ষমা করা উচিত নয়। ওরা পরের দিন সকালে থানায় গেল। থানা মাইল দশেক দূরের গঞ্জে। দারোগাবাবু সব শুনে চোখ কপালে তুললেন। মনোজ মাতালের নাম তিনি ভাল করে জানেন। ভাটিখানায় মারপিটের অপরাধে ওকে ধরে এনেছিলেন একবার। ভদ্র বাড়ির শিক্ষিত ছেলে বলে সতর্ক করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছবি দেখার পর তাঁর মনে হল মনোজ মাতালকে গ্রেপ্তার করলে সেটা জব্বর খবর হবে। সারা দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়বে। সময় নষ্ট না করে কয়েকজন সেপাইকে জিপে বসিয়ে ছুটে গেলেন গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও লোকটাকে বাড়িতে পেলেন না তিনি। শুনলেন রোজ যেমন পাঁচটা নাগাদ বের হয় গতকালও তাই বেরিয়েছে। বুঝলেন রামচন্দ্রের ভাটিখানায় আকণ্ঠ গিলে পড়ে আছে এখনও।

রামচন্দ্র পুলিশ দেখে হাতজোড় করল সে মাথা নেড়ে বলল, 'মনোজ মাতাল গতকাল তার ভাটিখানায় আসেনি। পরশু বারোটাকা আট আনা বাকি রেখে গিয়েছিল, বলেছিল গতকাল এসে শোধ করে দেবে কিন্তু আসেনি।'

তখন কয়েকটা মাতাল ইতিউতি বসেছিল। তারাও একই কথা বলল।

দারোগাবাবু ফাঁপরে পড়লেন। গেল কোথায় লোকটা।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর হাল ছেড়ে দিলেন দারোগাবাবু। সবাইকে জানিয়ে রাখলেন, মনোজ মাতালকে দেখলেই যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়। তারপর এস পি সাহেবের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন। বাবরি মসজিদ ভাঙার অন্যতম কালপ্রিট মিসিং।

কিন্তু মনোজ মাতালের আর খবর পাওয়া গেল না। গঞ্জে তাকে কেউ দেখতে পেল না।

এরপর বহুবছর কেটে গেছে। মনোজ মাতালের কথা ভুলেই গেছে গঞ্জের মানুষ। শম্ভু এখন ভাল ব্যবসা করে। চা-বাগানগুলোতে চা পাতা সাপ্লাই দেয় সে। দুটো পয়সা হয়েছে। বিয়ে থা করেছে। শম্ভুর মা অনেকদিন ধরে বায়না ধরেছিলেন তিনি তীর্থ করতে যাবেন। অন্তত হরিদ্বার-কনখল-ঋষিকেশটা দেখার খুব ইচ্ছে। এই বছর লাভ একটু বেশি হওয়াতে শম্ভু মা বউ বাচ্চাকে নিয়ে তীর্থদর্শনে বের হল। হরিদ্বার তাদের ভাল লাগল। দিদির হোটেলের নিরামিষ খাবার বেশ উপভোগ করল। তারপর টাঙ্গা ভাড়া করে গেল কনখলে। সেখানে অনেক আশ্রম, অনেক মন্দির। মা বললেন, 'শম্ভু রে, তুই আমাকে এখানে রেখে যা। মন ভরে পুণ্যি করি।'

শম্ভু বলল, 'পাগল নাকি!'

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা আসার পর গঙ্গার ধারে একটি মন্দিরের সামনে বেশ ভিড় দেখল ওরা। জিজ্ঞাসা করে জানল ওটা অন্নদামায়ের মন্দির। মা একেবারে ঘরের মেয়ের মতো। আজ মায়ের উৎসবতিথি। স্বামী মহানন্দ সিদ্ধ পুরুষ। তিনিই মায়ের প্রধান সেবক। তাঁর দর্শনেও মহাপুণ্যলাভ হয়।

ওরা, লাইন দিল। ঘণ্টা দেড়েক পরে ওরা পাঁচিল ঘেরা মন্দির চত্বরে প্রবেশ করল। পুরো চত্বরটা ভক্তদের ভিড়ে ভরে গেছে, মা অন্নদার মূর্তি দেখে ওরা খুব খুশি হল। ঠিক বাঙালি মায়ের ঘরোয়া মূর্তি। দেখলেই মনে শান্তি আসে। স্বামী মহানন্দের দর্শন পেল ওরা। মানুষটির শরীর থেকে যেন জ্যোতি বের হচ্ছে। অনেক বয়স হওয়া সত্ত্বেও শরীর এখনও টানটান। বললেন, 'কোন কিছু দরকার নেই। দুবেলা চোখ বন্ধ করে শুধু মা বলবেন। তাতেই হবে।'

ফেরার পথে টাঙ্গাওয়ালার খোঁজ করল শম্ভু। তাদের নামিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে যাওয়ার সময় বলেছিল অপেক্ষা করবে। লোকটার চেহারা ভাল করে মনে রাখেনি।

দূরে দাঁড়ানো একটা টাঙ্গাওয়ালার কাছে গিয়ে শম্ভু জিজ্ঞাসা করল, 'দিদির হোটেলের কাছে যাব। কত নেবে?'

লোকটার মাথায় টাক, চিবুকে দাড়ি। মুসলমান বলে মনে হচ্ছিল। হিন্দীতে বলল, 'পঞ্চাশ টাকা।'

শম্ভু বলল, 'আসার সময় তিরিশ দিয়েছি।'

'আপনার যা ইচ্ছে। হয় যাবেন নয় যাবেন না।'

অগত্যা উঠল ওরা। টাঙ্গাওয়ালার পেছনে বসেছিল শম্ভু। চলতে শুরু করামাত্রই তার নাকে গন্ধটা লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি মদ খেয়েছ?'

টাঙ্গাওয়ালা কথা বলল না।

'এই জায়গায় মাছমাংস ডিম মদ নিষিদ্ধ না?'

আচমকা বাংলায় কথা বলল লোকটা, ' তোমার এত মাথাব্যথা হচ্ছে কেন?'

চমকে উঠল শম্ভু। গলার স্বর বাংলা শোনার পর চেনা লাগল।

'আপনার নাম কি?'

লোকটা উত্তর দিল না।

দিদির হোটেলোর কাছাকাছি এসে বলল, 'নেমে যাও।'

পঞ্চাশটা টাকা বাড়ানো হাতে দিল শম্ভু। তারপর চাপা গলায় বলল, 'মনোজদা না?'

গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে লোকটা মাথা নাড়ল, 'মনোজ মাতাল।'

ভিসার নাম ভালবাসা

পোর্টঅথরিটি বাস টার্মিনাসের গায়েই ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটের রেল স্টেশন। অ্যাটালান্টিক সিটিতে সারা দুপুর কাটিয়ে নব্বই ডলার হেরে বাসে চেপে ফিরে এসেছিল রামানন্দ। বারো ঘণ্টার আসা-যাওয়ার জন্যে বাসের টিকিট কাটতে গায়ে লাগে না কারণ নামার পরই ওই অঙ্কের কুপন দেওয়া হয় জুয়ো খেলার জন্যে। আজ প্রায় আড়াইশো ডলার জিতেছিল সে, কিন্তু লোভই কাল হল। সেটা খেয়ে নিয়ে স্লট মেশিন খুশি হল না, পকেটের নব্বই ডলারও গিলে ফেলল। ফেরার পথে কেবলই মনে হচ্ছিল, প্রায় চার হাজার পঞ্চাশ টাকা নষ্ট করার গল্প দেশে ফিরে গিয়ে কাউকে বলা যাবে না।

রামানন্দ নিউইয়র্কে এসেছিল একটা সেমিনারে যোগ দিতে। আসা-যাওয়ার প্লেনভাড়া লাগেনি। দুদিন সেমিনারের আতিথ্য নেওয়ার পর সে চলে এসেছিল কুইন্সের ইউনিয়ন টার্নপাইকের এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধু ব্যস্ত মানুষ। সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যার ফেরে। তাতে কোনও অসুবিধা হয় না রামানন্দর। শহরটাকে সে মোটামুটি চেনে।

আজ প্ল্যাটফর্ম একদম ফাঁকা, ছুটির দিনে কেউ সন্ধের পরে বোধহয় এই

অঞ্চলে দরকার না পড়লেও আসে না। ট্রেনও চলাচল করে একটু সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই রামানন্দ লোকটাকে দেখতে পেল। খাটো চেহারা, বেশ রোগা, চোখে চশমা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, বগলে একটা জীর্ণ চামড়ার ব্যাগ। পরনের জামাটাও বিবর্ণ। লোকটাকে দেখামাত্র হরিপদ কেরানির কথা মনে এসে গেল। পশ্চিমবাংলার শহরে শহরে এইরকম চেহারার অনেক মানুষ ছড়িয়ে আছেন যাঁরা ভাগ্যের কাছে হেরে গিয়ে বাঁচার জন্যে বাঁচছেন। সে লক্ষ করল মানুষটা চারপাশে তাকাচ্ছে বেশ দুর্বল চোখে। চামড়ার রং বলছে ইনি সাদা আমেরিকান। লোকটির সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হল রামানন্দর। লোকটি যদি কেতাদুরস্ত এবং সচ্ছল চেহারার হত তাহলে ইচ্ছেটা হত না। বেশির ভাগ আমেরিকানের ইংরেজি উচ্চারণ সে বুঝতে পারে না। তাই বাধ্য না হলে কথা বলে না।

সে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইউনিয়ন টার্নপাইকের ট্রেন এখানেই পাব তো?'

লোকটি মুখ তুলে তাকে দেখল। চশমার কাচের তলায় চোখ কুঁচকে গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপর মাথা নেড়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, 'তাই তো পাওয়া উচিত?'

'আমি তো বাসের রাস্তা চিনি না, ট্রেনই ভরসা।' রামানন্দ বলল।

লোকটা কোনও কথা না বলে দাঁড়িয়ে থাকল।

'এখন ইন্ডিয়াতেও মাটির তলায় ট্রেন চলছে।' কথা খুঁজল রামানন্দ।

'ইন্ডিয়া!'

'হ্যাঁ, পৃথিবীতে ইন্ডিয়া নামে একটা দেশ আছে। আমার দেশ।'

লোকটা হাসল, 'আমি জানি। অবশ্য এদেশের অনেক মানুষ জানে না। ইন্ডিয়া, যার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা। কেন যে ওরা ওঁকে মেরে ফেলল! বেশ জোরে শ্বাস ফেলল লোকটি।

খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল রামানন্দ। ঠিক তখনই ট্রেন এসে গেল। দরজা খুলতেই ভেতরের খালি বেঞ্চির একটাতে বসতেই সে লোকটিকে দেখতে পেল। ট্রেনে উঠে এপাশ-ওপাশ দেখছে রামানন্দ। হাসল, মাথা নেড়ে তার দিকে আসতে বলল। লোকটি গুটিগুটি তার পাশে বসতেই ট্রেন চালু হল। কলকাতায় পাতাল রেল চললে ভেতরে বসে কথা বলা যায় না ভয়ঙ্কর আওয়াজের জন্য। এখানে এরা শব্দটাকে মেরে রেখেছে।

রামানন্দ জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম জানতে পারি?'

লোকটি মাথা নাড়ল, 'আমি হ্যারি।'

'আমি রামানন্দ। আপনি রাম বলতে পারেন,' বলেই তার বেশ মজা লাগল।

যাকে সে হরিপদ বলে ভেবেছিল তার আসল নাম টম ডিক অ্যান্ড উইলি যা

হোক একটা হতে পারত, হ্যারি কেন হল? হ্যারি আর হরিপদ একদম কাছাকাছি। সে জিজ্ঞেস করল, 'আজ তো ছুটির দিন। বেড়াতে বেরিয়েছিলেন?'

মাথা নাড়ল হ্যারি, 'না। এই সপ্তাহের কাজ কিছু বাকি ছিল, তা শেষ করে এলাম।'

'ওভারটাইম কাজ করলে নিশ্চয়ই বেশি রোজগার হবে?'

'না! আজ না গেলে মাইনের টাকা থেকে পেনাল্টি হিসেবে খানিকটা কেটে নিত! কেন সপ্তাহের কোটা আমি সপ্তাহে শেষ করিনি!' বলেই হ্যারি তাকাল, 'আপনাদের দেশে এই ব্যবস্থা নেই?'

'না। কাজ শেষ না করার জন্য কাউকে পেনাল্টি দিতে হয় না। বরং ছুটির দিনে কাজ করলে এক্সট্রা রোজগার হয়।' রামানন্দ বলল।

'আমি একজন অ্যাকাউন্টেন্ট। অ্যাকাউন্টেন্সি খুব ভাল জানি, কিন্তু এখানে যা রোজগার করি তাতে খরচ চালাতে পারছি না। খুব কষ্টের মধ্যে আছি।' বেশ জোরে শ্বাস ফেলল হ্যারি।

চমকে উঠল রামানন্দ। একজন আমেরিকান যে অ্যাকাউটেন্সি খুব ভাল জানে, কী কথা বলছে? চেহারা এবং পোশাকে এই কথার সমর্থন আছে। কিন্তু এমন হতে পারে লোকটা কোনও কাজই জানে না এবং করে না, সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। ইদানীং সেই সাহায্যের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করছেন ওবামা সরকার, তাই এই লোকটা বানানো গল্প বলছে। হ্যারি জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের দেশে বাড়িতে রান্না করে খেলে একটা মানুষের কীরকম খরচ হয়?'

'কী খাবে তার ওপর নির্ভর করছে।'

হ্যারি তার কাঁচাপাকা চুলে আঙুল বুলিয়ে ভাবল। তারপর বলল, 'ধরো, সকালে এক কাপ চা, ব্রেকফাস্টে একটা বয়েলড এগ অথবা ওমলেট আর দু'পিস ব্রেড, দুপুরে দুটো স্যান্ডউইচ আর রাত্রে—থেমে গেল হ্যারি।

'হ্যাঁ, বলো।'

'রাত্রে আমি একটু ভালো খেতে চাই। রাইস, ভেজিটেবল আর দুটুকরো মাংস দিয়ে অনেকখানি ঝোল। সব একসঙ্গে। এখন শুধু ভেজিটেবল স্টু খাচ্ছি।'

রামানন্দ হিসেব করে বলল, 'খুব বেশি হলে ফিফটি সেন্ট।'

'অ্যাঁ?' চমকে উঠল হ্যারি, 'কি বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি।'

'মাই গড!' চোখ বন্ধ করল হ্যারি, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'একটা ওয়ান বেডরুম ফ্ল্যাট ভদ্র এলাকায় কী রকম ভাড়ায় পাওয়া যায়?'

'মফসসলে অনেক কম, কলকাতায় মাসে একশো ডলার।'

'কী বলছ রাম, এ তো স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।'

'ভারতবর্ষে এটাই সত্যি।'

'তুমি এখানে আর কতদিন আছ?'

'আছি। ধরো, দিনসাতেক।'

নামবার আগে বন্ধুর দেওয়া মোবাইলের নাম্বার দিতে হল হ্যারিকে, হ্যারি বলল, 'আমি যদি তোমাকে ফোন করি তাহলে বিরক্ত হবে না তো?'

'বিন্দুমাত্র না।' ইউনিয়ন টার্নপাইক স্টেশনে নেমে পড়ল রামানন্দ।

স্টেশন থেকে বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছতে মিনিট বারো হাঁটতে হয়। ছবির মতো রাস্তা। তবে লোকজন নেই। মাঝে মাঝে গাড়ি যাচ্ছে জোর গতিতে। মাঝপথে ডান দিকে একটা কবরখানা পড়ে, বন্ধুর সঙ্গে একদিন গিয়েছিল ভেতরে। প্রচুর গাছগাছালির মধ্যে অজস্র মৃত মানুষকে নিয়ে রয়েছে ফলকগুলো।

বন্ধু হেসে বলেছিল, 'এখন এইরকম দেখছ, মাঝরাত্রে ওঁরা কবর থেকে বেরিয়ে এসে গল্প করেন।'

রামানন্দ জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাঃ! গল্পের সাবজেক্ট কী?'

বন্ধু বলেছিল, এক বৃদ্ধ সদ্য আসা একজন প্রৌঢ়কে জিজ্ঞেস করবে, ওহে এখন গ্যাসের দাম কত হয়েছে? প্রৌঢ় পাল্টা জিজ্ঞেস করবে, 'এখানে আসার আগে কত দেখে এসেছিলেন?' বৃদ্ধ বলবেন, 'বেড়েছিল, গ্যালনে ষাট থেকে সত্তর হয়েছিল।' প্রৌঢ় হাসবে, 'এখন এক গ্যালনের দাম চার ডলার নব্বই সেন্ট।' শোনামাত্র বৃদ্ধ তাঁর কবরে ফিরে যাবেন। সেখানে গ্যাসের দরকার হয় না। সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির মুখ মনে পড়ল। লোকটার যে গাড়ি নেই তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু একজন আমেরিকান কলকাতার বাজারার শুনে স্বপ্ন ভাবছেন একথা দেশের বন্ধুরাও বিশ্বাস করতে চাইবে না।

ঠিক দুদিন পরে হ্যারির ফোন এল। রামানন্দ তখন ইলিশের আঁশ ছাড়াচ্ছে। জ্যাকসন হাইটের এক বাংলাদেশির দোকানে ইলিশের দাম পাউন্ড প্রতি বারো ডলার। দুই পাউন্ড মানে আট ডলার, দেশের টাকায় তিনশো ষাট টাকা। আসার আগে মানিকতলা বাজারে গিয়ে শুনেছিল ইলিশ পাঁচশো টাকা কেজি, আর নিউইয়র্কে সে এককেজি কিনেছে তিনশো ষাট ভারতীয় টাকায়। কেনার সময় পাথরের চেয়ে শক্ত ছিল মাছটা, মাছওয়ালা বলেছিল, 'দশ মিনিট পানিতে রাখলে দেখবেন কী হয়।' সত্যি একদম টাটকা মাছ হয়ে গেল যেন। সেই মাছের আঁশ ছাড়াবার সময় ফোনটা বাজল।

'হ্যালো!' রামানন্দ জানান দিল।

'মিস্টার রাম?' হ্যারির গলা।

'হ্যাঁ! মিস্টার হরিপদ, আই থিঙ্ক, মিস্টার হ্যারি?'

'কী আশ্চর্য! আপনি আমাকে চিনতে পারলেন?'

'নিশ্চয়ই! বলুন, কী করতে পারি?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করে একটু কথা বলা যাবে?'

'কোথায় দেখা করলে আপনার সুবিধা হয়, বলুন।'

'আমরা এখন ইউনিয়ন টার্নপাইক স্টেশনের সামনে আছি।'

'আপনারা মানে?'

'আমি আর আমার স্ত্রী।'

'ওহো! ওখান থেকে আমি যেখানে থাকি সেখানে হেঁটে এলে বারো মিনিট লাগবে। চলে আসুন।' বাড়ির নাম্বার রাস্তার নাম বলে দিল রামানন্দ।

ইলিশ মাছের ভাপে ভাপে করা খুব সহজ। গোটা ছয়েক টুকরো ভাপেতে বসিয়ে দিয়ে সাবানে হাত ধুতেই নিচে বেল বাজল।

নিচে নেমে দরজা খুলতেই হ্যারি বলল, 'গুড মর্নিং। ইনি আমার স্ত্রী এলিজাবেথ।'

এলিজাবেথ মাথা নেড়ে বললেন, 'গুড মর্নিং।'

'মর্নিং। আসুন ওপরে চলে আসুন আমার সঙ্গে।' দরজা বন্ধ করে ওপরের বসার ঘরে নিয়ে এসে ওদের বসতে বলল রামানন্দ।

এলিজাবেথকে হ্যারির সমবয়সি বলে মনে হচ্ছে, বেশ রোগা কিন্তু চুল এখনও পাকেনি। চোখে চশমা, হাতের ব্যাগটি বেশ বড়। পরনে পা ঢাকা স্কার্ট।

'রাম।' একটু ঝুঁকে বসল হ্যারি, 'লিজের সঙ্গে আমি আলোচনা করে দেখলাম। আমরা তোমাদের দেশে গিয়ে থাকতে চাই। আমি ভাল অ্যাকাউন্টেন্ট, কম্প্যুটার ব্যবহার করছি বহু বছর ধরে। তুমি কি আমাদের সাহায্য করতে পারবে?' এতটা ভাবেনি রামানন্দ, 'তোমরা আমেরিকান হওয়া সত্ত্বেও ইন্ডিয়াতে গিয়ে থাকবে?'

উত্তর দিল এলিজাবেথ, 'এই দুইদিন আমরা ইন্ডিয়া সম্পর্কে অনেক খবর নিয়েছি। একজন ইটালিয়ান মহিলা এখন ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় পার্টির প্রেসিডেন্ট। তিনি যদি থাকতে পারেন তাহলে আমরা কেন পারব না?'

'কিন্তু কেন আমেকিায় থাকতে চাইছ না?'

'আমি আড়াই হাজার ডলার মাইনে পাই। আড়াই শো ডলার কোম্পানিতে নানান খাতে কেটে নেয়। বাড়িভাড়া দিতে হয় নয়শো ডলার। তারপর ইন্সিওরেন্স কোম্পানিকে প্রতিমাসে পেমেন্ট করতে হয়। আমার ছেলে মরে গিয়েছে। তার চার বছরের বাচ্চা আমাদের কাছে আছে। ওর মা আর একজনকে বিয়ে করে চলে গেছে। আগে জিনিসপত্রের দাম কম ছিল। কোনওরকমে ম্যানেজ করতাম। নাতির স্কুলের ফিজ দেওয়ার পরে চোখে অন্ধকার দেখছি। তুমি ইন্ডিয়ার কথা যা

বলেছিলে তাতে আমাদের মনে হয়েছে বাকি জীবনটা ভাল ভাবে বাঁচতে পারব।' হ্যারি বলল।

রামানন্দ বলল, 'কিন্তু ইন্ডিয়ার আর কিছু তোমরা জানো না।'

এলিজাবেথ মাথা নাড়ল, 'শুনেছি অনেক মানুষ সেখানে। কোনও ডিসিপ্লিন নেই। রাস্তাঘাট পরিষ্কার নয়। গ্রামের দিকে মেডিক্যাল ফেসিলিটিস নেই। কিন্তু ওখানকার মানুষদের মন খুব ভাল। জিনিসপত্রের দাম যতই বাড়ুক আমেরিকার তুলনায় কিছুই নয়, শুনেছি পাঁচ-ছয় সেন্টে এক কাপ চা পাওয়া যায়।'

'কিন্তু ওখানে তোমরা ডলারে রোজগার করবে না।'

'আমাদের আড়াইজনের থাকা-খাওয়ার জন্যে কত খরচ হবে ওখানে?'

'পঁচিশ হাজার। মানে সাড়ে পাঁচশো, পাঁচশো ডলার।'

হ্যারি হাসল, 'তাহলে কোনও চিন্তাই নেই, আমি চাকরি ছেড়ে দিলে অফিস আমাকে মাসে বারোশো ডলার পেনশন দেবে। তাহলে চারশো ডলার বেঁচে যাবে। আমার ওখানে একটু নিরিবিলি জায়গায় থাকতে চাই। বড় শহরেই।

'কিন্তু ইন্ডিয়াতে যাবে কী করে?'

হ্যারি হাসল, 'প্লেনের ভাড়া আমরা জোগাড় করে নেব।'

'না না। ইন্ডিয়াতে ঢুকতে তো ভিসা লাগবে?'

এলিজাবেথ অবাক হল, 'আমেরিকানদের কি ভিসা দরকার হয়?'

'ইন্ডিয়া তো কানাডা নয়? অবশ্য দরকার হবে।'

'ঠিক আছে, আমরা ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করব।'

'বেশ! অ্যাপ্লাই করলে তোমাদের ট্যুরিস্ট হিসেবে তিন মাস বা ছয় মাসের ভিসা দেবে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট। সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে চলে আসতে হবে। নইলে আইন তোমাদের বিরুদ্ধে যাবে।' রামানন্দ বলল।

স্বামী স্ত্রীর দিকে তাকাল। এলিজাবেথ কাতর গলায় রামানন্দকে বলল, 'শুনেছি ইন্ডিয়া অহিংসায় বিশ্বাস করে। ইন্ডিয়ানদের মন খুব বড়, আমরা যদি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাপিল করি, আমাদের থাকতে দাও, তাহলে কি দেবে না?'

রামানন্দ কী বলবে বুঝতে পারছিল না। এলিজাবেথ তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে বলল, 'অ্যাপিল নিশ্চয়ই করতে পারেন, তবে ওখানে গিয়ে করার চেয়ে যাওয়ার আগে করা ভাল।'

হ্যারি বলল, 'শুনেছি ইন্ডিয়াতে কয়েক কোটি মানুষ থাকে। আরও তিনজন যদি যোগ হয় তাহলে কী এমন তফাত হবে।'

রামানন্দ হেসে ফেলল। 'ঠিকই! আচ্ছা, আমি আমার প্রিয় মাছ রান্না করেছি। আসুন একসঙ্গে মাছভাত খাই।'

'ক্যাট ফিস?' এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল।

'না ইলিশ! অনেকটা আপনাদের সার্ডিন মাছের মতো।'

'কাঁটা আছে?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আছে। কিন্তু স্বাদ অতুলনীয়।'

'সরি রাম, আমি কাঁটাওয়ালা মাছ খেতে পারি না।'

'আমিও।' বলল এলিজাবেথ। 'তোমরা কি খুব মাছ খাও?'

'হ্যাঁ! তবে নিরামিষ খেতে অনেকে পছন্দ করেন।' রামানন্দ উঠে দাঁড়াল, 'ঠিক আছে, কাল রাত্রে চিকেন করেছিলাম। তাই দিচ্ছি ভাতের সঙ্গে।'

এলিজাবেথ বলল, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা এখানে খেতে পারব না। আমার নাতি এখন একা বাড়িতে আছে। ফিরে গিয়ে স্যান্ডউইচ বানিয়ে তিনজনে একসঙ্গে খাব।'

'একটু দাঁড়াও।'

রান্নাঘরে গিয়ে একটা বড় প্লাস্টিকের কৌটোয় অনেকটা ভাত, মুরগির মাংস ঝোল সমেত সযত্নে আর একটাতে ঢেলে ক্যারিব্যাগে ভরে নিয়ে এল সে, 'এইটা নিয়ে যাও প্লিজ! তোমাদের তিনজনের হয়ে যাবে।'

'কী আশ্চর্য! কেন?' এলিজাবেথ উঠে দাঁড়াল।

'আজ আমি ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাব আর তোমাদের নাতি শুকনো স্যান্ডউইচ চিবোবে, খুব খারাপ লাগবে আমার।'

ক্যারিব্যাগটা হাতে নিয়ে এলিজাবেথ বলল, 'রাম, আমরা এই পৃথিবীটাকে অনেক ভাগে ভাগ করে যে যার দখলে রেখেছি। কাউকে অন্যের ভাগকে নিজের ভাগ ভাবতে দিই না, অ্যাপিল করলেও ওরা দয়া করবে কি না জানি না, কিন্তু মানুষের মনে কোনও ভাগাভাগি নেই, সেখানে পৌঁছতে পাসপোর্ট বা ভিসার দরকার হয় না।'

হ্যারি বলল, 'ভুল বললে। হয়। সেই ভিসার নাম ভালবাসা। বাই রাম! তোমাকে আমাদের মনে থাকবে।'

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দুই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াকে ক্যারিব্যাগ হাতে হেঁটে যেতে দেখল রামানন্দ। আজ দুপুরে ওরা তিনজন নিশ্চয়ই খেয়ে তৃপ্তি পাবে।

কুদমা

চাকরিটা যে বড়বউদির মামার এক কথায় হয়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি শিবশংকর। ভদ্রলোকের নাম হরিচরণ শর্মা। ব্রেবোর্ন রোডের তিনতলা জুড়ে অফিসটার দরজার বাইরে সাতটা কোম্পানির নাম লেখা। ভিতরের ঘরগুলোতে প্রচুর লোক কাজ করছে। এরকম অফিসে চাকরি পেলে বউবাজার থেকে হেঁটে আসতে বাসভাড়াও লাগবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা তাকে বলেছে, কোনও আশা কোরো না, চেষ্টা করে যাও।

নিজের নামের তলায় বড়বউদির মামার নাম লিখে স্লিপ দিয়েছিল বেয়ারার হাতে। আধঘণ্টা বাদে ডাক পড়ল। চওড়া টেবিলের ওপাশে সাফারি স্যুট পরা প্রবীণ ব্যক্তিটি তাকে দেখে বললেন, 'অ্যাপ্লিকেশন এনেছেন?'

দ্রুত ব্যাগ থেকে খামটা বের করে এগিয়ে দিল শিবশংকর।

খাম খুলে কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে হরিচরণ শর্মা বললেন, 'শিবশংকর। ভগবানের নামে নাম। খুব ভাল। দেখুন ভাই, যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন তাঁর সম্মান আমার রাখা উচিত। কিন্তু আমার অফিসে নতুন লোক রাখলে তাকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিতে হবে। আপনি নিশ্চয়ই সেটা চাইবেন না!'

দ্রুত মাথা নাড়ল শিবশংকর, 'না।'

'গুড। আপনি যেতে পারেন, আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে নেব।'

শিবশংকর ঢোঁক গিলল। দরজার দিকে এগোতে এগোতে ভাবল, চেষ্টার বিকল্প যখন নেই, তখন চেষ্টা করেই যেতে হবে।

'ওহো, দাঁড়ান, এদিকে আসুন।' হরিচরণ শর্মার গলা শুনতে পেল সে।

আদেশ মান্য করতে হরিচরণ শর্মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিয়ে করেছেন?'

'না।' অদ্ভুত প্রশ্ন, মনে মনে বলল শিবশংকর।

'কলকাতা থেকে দূরে গেলে থাকতে পারবেন?'

কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে যখন, তখন কি কোনও আশা আছে? সে মিথ্যে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তা হলে আপনাকে এখনই চাকরি দিতে পারি। আপাতত মাসে পাঁচ হাজার পাবেন। এক বছর কাজ করে দেখান, তারপর মাইনে ঠিক করব। রাজি?'

'হ্যাঁ।' গলার কাছে হৃৎপিণ্ড উঠে এসেছিল শিবশংকরের।

'বাইরে গিয়ে পিওনকে বলুন পাণ্ডেজির কাছে নিয়ে যেতে। আমি ওঁকে সব বলে দিচ্ছি।' হরিচরণ শর্মা হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুললেন।

বড়বউদি চোখ কপালে তুলেছিলেন, 'সে কী? তুমি কলকাতার বাইরে চলে যাবে?'

'চাকরি তো পাচ্ছিলাম না, তোমার মামার জন্যে যখন পেলাম তখন যা পেয়েছি তাতেই খুশি থাকতে হবে।'

'ভাগ্যিস তুমি প্রেম-টেম করোনি—!' বড়বউদি হেসেছিল।

মাঝরাতে জংশন স্টেশনে নেমে ভোর অবধি অপেক্ষা করে লোকাল ট্রেনে উঠেছিল শিবশংকর। পাণ্ডেজি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কীভাবে পৌঁছতে হবে। খরচ বাবদ দুই হাজার টাকা অগ্রিমও দিয়েছেন। ওটা নাকি হরিচরণ শর্মার নির্দেশ। লোকাল ট্রেন যাচ্ছিল প্রায় শামুকের মতো। সারারাত জেগে কাটানোয় ভোরের বাতাসে তার ঘুম পাচ্ছিল। ফাল্গুনের শুরুতেও বাতাসে ঠাণ্ডা ভাবটা রয়ে গিয়েছে। ছত্তিসগড়ের এই দিকটায় বোধহয় দেরিতে শীত যায়। শিবশংকর সোজা হয়ে বসল। ঘুমিয়ে পড়লে নামার স্টেশনটা পেরিয়ে যাবে ট্রেন। কামরায় এখন দশ-বারোজন যাত্রী। বেশিরভাগের চেহারা এই জীর্ণ লোকাল ট্রেনের মতন। শুধু উল্টোদিকের কোণে যে বৃদ্ধ বসে আছেন তাঁর পোশাক ও মুখ বলে দিচ্ছে তিনি বাকিদের থেকে আলাদা। বেশ খাটো, রোগা শরীর। তাঁর পাশে যে মহিলা বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছেন তিনি বেশ স্বাস্থ্যবতী। মাথায় ঘোমটা থাকায় মুখ দেখা যাচ্ছে না। হয়তো বাপ-মেয়ে, নয়তো শ্বশুর-পুত্রবধূ। দ্বিতীয়টা না হওয়ারই কথা।

শিবশংকর বাইরে তাকাল। এখানকার মাঠ বুনো ঝোপ আর নুড়িপাথরে ভরা। বোঝাই যায় চাষ করা হয় না। দূরে দূরে কিছু গাছ যেন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ দেখলে আর তাকাতে ইচ্ছে করে না।

সকাল আটটা নাগাদ ট্রেনটা হাঁপাতে হাঁপাতে যে স্টেশনে থামল সেখানেই নামতে বলেছিলেন পাণ্ডেজি। বড় ব্যাগটা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শিবশংকর দেখতে পেল বৃদ্ধ ও মহিলা নামার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। স্টেশনটি খুব ছোট।

পাণ্ডেজি বলেছিলেন, 'খবর পাঠাচ্ছি যাতে কেউ এসে স্টেশন থেকে আপনাকে নিয়ে যায়। ওখানে আমাদের টাঙা আছে, তাতেই যাবেন।'

কোনও চেকার নেই, রেলের সাধারণ কর্মচারীকেও প্ল্যাটফর্মে দেখা গেল না।

অল্প কয়েকজন ট্রেন থেকে নামল, উঠল তারও অর্ধেক। শিবশংকর বাইরে এসে কোনও টাঙা দেখতে পেল না।

এর মধ্যে রোদের তেজ বেড়ে গেলেও সেটা সহ্যের সীমা ছাড়ায়নি। কোনও রিকশা নেই, ট্যাক্সিওয়ালাদের হাঁকাহাঁকিও নেই। নিশ্চয় যে আসছে সে একটু দেরি করে ফেলেছে। সে চারপাশে তাকাতেই গাছটাকে দেখতে পেল। লম্বা গাছ, পাতার ফাঁকে ফাঁকে টকটকে লাল ফুল ফুটতে শুরু করেছে। বউবাজারের পার্কে কৃষ্ণচূড়া এবং রাধাচূড়া গাছ আছে। তাদের ফুলের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। সে গাছটার নীচে পড়ে থাকা একটা ফুল তুলে নিল। নাম না জানা এই ফুল কি শুধু বসন্তকালেই ফোটে?

'আপনি বাঙালি?'

মুখ ফিরিয়ে সে বৃদ্ধকে দেখতে পেল। কাছে এসে গিয়েছেন। সে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

'ওই ফুলের রস খুব বিষাক্ত, হাতে লাগলে ঘা হয়ে যেতে পারে।'

শোনামাত্র শিবশংকর ফুলটাকে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ফুল এটা?'

'এখানকার দেহাতিরা বলে কুদমা। যারা আত্মহত্যা করতে চায় তারা এই সময় ওই ফুল তিন-চারটে খেয়ে নেয়। হাসপাতাল তো সেই জংশন স্টেশনে, নিয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ পাওয়া যায় না। কোথায় যাবেন?'

'সুখাইচক।'

'এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। পাণ্ডববর্জিত জায়গা।'

'আপনি? মানে, আপনারা?'

'বাবা সদানন্দের আশ্রমে যাব। প্রত্যেক বছর, তা ধরুন বছর তিনেক হয়ে গেল, এই সময়ে আসছি। তিন-তিনটে বছর আমাদের দেখেছেন তিনি, এবার সদয় হয়ে বলেছেন দীক্ষা দেবেন।' হাতজোড় করে কপালে ঠেকালেন তিনি।

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'ব্রজবল্লভ ঘোষ।'

এই সময় দূরে একটা টাঙা দেখা গেল। স্টেশনের দিকে আসছে। শিবশংকর খুশি হল। পাণ্ডেজির পাঠানো খবর তা হলে এখানে পৌঁছেছে। চালকের পাশ থেকে নেমে এল রোগা লম্বাটে এক প্রৌঢ়, হাতজোড় করে বলল, 'নমস্কার ঘোষসাহেব, সর্বাঙ্গীন কুশল তো?'

ব্রজবল্লভ হেসে বললেন, 'একটু বাকি আছে, সেটা গুরুর আশীর্বাদে পূর্ণ হবে।'

প্রৌঢ় বলল, 'গুরুদেব বলেন, ভক্তই ভগবানকে প্রতিষ্ঠা দেয়, আপনাদের আশা পূর্ণ হবে। আমি কি খুব দেরি করে ফেললাম?'

ব্রজবল্লভ বললেন, 'না না। ট্রেন তো এইমাত্র এল।'

প্রৌঢ় এবার ভদ্রমহিলার সামনে গেল। 'মায়ের কি কোনও অসুবিধে হয়েছে?'

মাথা নেড়ে 'না' বললেন মহিলা। ঘোমটায় এখনও মুখ ঢাকা।

প্রৌঢ় বললেন, 'তা হলে চলুন, এমনিতেই বিলম্ব হয়ে গিয়েছে।'

বৃদ্ধ সযত্নে মহিলাকে টাঙায় তুলে দিয়ে নিজে উঠতে গিয়ে না পেরে প্রৌঢ়ের সাহায্য নিলেন।

শিবশংকর দেখল টাঙা ঘুরিয়ে নিয়ে চালক ফিরে গেল। প্রথমে মনে হল, বৃদ্ধ তো তাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না এগিয়ে দিতে হবে কি না। তারপরেই সে ভাবল, হয়তো ওঁরা সুখাইচকের বিপরীত দিকে যাচ্ছেন।

আরও মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে থাকার পরেও যখন সে কাউকে আসতে দেখল না, তখন ঠিক করল হেঁটেই যাবে। বৃদ্ধ বলেছেন পাঁচ কিলোমিটারের পথ। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় থেকে মেট্রো সিনেমা। কী আর এমন। শিবশংকর রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল। দু'পাশে ফাঁকা মাঠ, এক আধটা গাছ যৌবন পার হব-হব আইবুড়ো মেয়ের মতো দাঁড়িয়ে। রাস্তার লালচে ধুলো একটু বাদেই জুতোর বারোটা বাজিয়ে দিল। কিন্তু আকাশ অপূর্ব মায়াময় নীলে মাখামাখি। হাঁটতে ভাল লাগছিল শিবশংকরের। অনেকটা হাঁটার পরে সে ফাঁপরে পড়ল। রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। কোন দিকে হাঁটলে সুখাইচকে পৌঁছনো যাবে? দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোনও মানুষ নেই। আচ্ছা, ওরা তো তাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে বলে দিতে পারত কোন পথে যেতে হবে! আশ্চর্য মানুষ!

মিনিট দশেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মানুষ দেখার আশায়। তারপরে মনে হল ডানদিক থেকে একটা কিছু এগিয়ে আসছে। আর একটু স্পষ্ট হলে বুঝতে পারল সাইকেল চালিয়ে কেউ আসছে। একদম কাছে এসে গেলে শিবশংকর আবিষ্কার করল সাইকেল চালাচ্ছে একটি মেয়ে। পরনে জিন্‌সের ওপর গেঞ্জি। এই পোশাক এখন কলকাতার সর্বত্র দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তা বলে এরকম জায়গায় দেখবে ভাবতে পারেনি সে। তাকে ডিঙিয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে সাইকেল দাঁড়াল। তারপর ফিরে এল কাছে, 'এনি প্রবলেম?'

'হ্যাঁ।' ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করল শিবশংকর, 'সুখাইচকের রাস্তা কোনটা?'

এবার হিন্দিতে বলল মেয়েটি, 'সুখাইচকে কেন যাবেন?'

'ওখানে আমার চাকরি হয়েছে।'

'শর্মা'জ আইল্যান্ড-এ?'

'হ্যাঁ।'

'পিছনে উঠে বসুন।'

এক সেকেন্ড দেরি না-করে সুটকেস সামলে সাইকেলের ক্যারিয়ারে উঠে বসল সে। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'বাঙালি?'

'হ্যাঁ।'

সাইকেল চলল। এরকম জায়গায় এই মেয়ে কী করছে? বোঝাই যাচ্ছে পেটে বিদ্যে আছে। হয়তো বাপের জমিদারি আছে এখানে, ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে। মেয়েটি চুপচাপ সাইকেল চালাচ্ছিল। বাতাস লাগছিল শরীরে তাই রোদের তাপ খারাপ লাগছিল না। কিন্তু মেয়েটা জিজ্ঞাসা করল, 'শর্মা'জ আইল্যান্ড'? এখানে দ্বীপ আসবে কী করে? চারধারে তো শুকনো মাঠ। আরও খানিকটা যাওয়ার পথে দূরে টিনের চালওয়ালা কয়েকটা বাড়ি দেখতে পেল সে। বাড়িগুলো ঘিরে রেখেছে অনেক গাছ। তারপরই চোখে পড়ল একটা টাঙা দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। ওটাই কি বাবা সদানন্দের আশ্রম! আশ্চর্য! এত জায়গা থাকতে এরকম উদ্ভট জায়গায় আশ্রম করলেন কেন বাবা সদানন্দ?

অনেকটা সময় যাওয়ার প'রে আচমকা চোখ জুড়ানো জলরাশি ছবির মতো সামনে ভেসে উঠল। একে কি বিল বলে? পুকুর বা হ্রদের চেয়ে এর ব্যাপ্তি অনেক বেশি। জল স্থির। তবে বাতাস ছোট ছোট ঢেউ তুলছে।

খানিকটা যাওয়ার পর মেয়েটি সাইকেল থামাল, 'এখানে নেমে যেতে হবে।'

'সুখাইচক?' সাইকেল থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করল শিবশংকর।

'এইটে। ওই যে দ্বীপ দেখছেন ওটাই আপনার গন্তব্যস্থল।'

'কিন্তু কী করে যাব।'

সাইকেলটাকে স্ট্যান্ডের ওপর রেখে পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে এগিয়ে ধরল মেয়েটি। দ্রুত মাথা নাড়ল শিবশংকর। একটা সিগারেট ধরিয়ে মেয়েটি বলল, 'এখানেই আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। নৌকো দেখলে চেঁচিয়ে ডাকবেন, চলে আসবে। আবার দেখা হবে।'

'আপনি কি এখানে থাকেন?'

'মাস ছয়েক হল আছি। আরও মাইলখানেক দূরে আমার অফিস। আমি এখানকার ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার। আমি কুসুম ভার্গব।'

'ভার্গব?'

হাসল কুসুম, 'ইউপি-র ব্রাহ্মণের মেয়ে। বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন জামশেদপুর। আপনি?'

'শিবশংকর।'

'ওয়েল শিব, যখন একলা লাগবে আমার মোবাইলে ফোন করবেন। নাম্বার নিন।' তারপরে মাথা নাড়ল কুসুম, 'আপনার মোবাইলের নাম্বার বলুন। কল করলে নাম্বার পেয়ে যাবেন।'

মাথা নাড়ল শিবশংকর। 'আমার সঙ্গে মোবাইল নেই।'

'ওঃ। তা হলে চললাম। বাই শিব।' আধখাওয়া সিগারেট মাটিতে ফেলে জুতোয় নিভিয়ে সাইকেলে চড়ে চলে গেল কুসুম।

একজন বিডিও সাইকেলে ঘুরছে, ওর তো জিপে ঘোরার কথা। তাছাড়া ওইরকম অল্পবয়সি মেয়ে চাকরির জন্যে এখানে একা রয়েছে ভাবতেও অবাক লাগছে। তবে মেয়েটা খুব স্মার্ট তাতে সন্দেহ নেই।

আধঘণ্টা বাদে নৌকো দেখা গেল। তাকে ডাকাডাকি করে জল পেরিয়ে দ্বীপে পৌঁছল শিবশংকর। দ্বীপটি গাছগাছালিতে ভর্তি বলে ভিতরটা ওপার থেকে দেখা যায় না। ভিতরে এসে দু'টো ইটের দেওয়াল আর টিনের চাল-ওয়ালা বাড়ি দেখতে পেল সে। একটা বেশ লম্বা, দ্বিতীয়টা ছোট। পাণ্ডেজি বলেছিলেন এখানকার কেয়ারটেকারের নাম লছমন। সেই নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডাকার পরও কারও সাড়া পাওয়া গেল না। শিবশংকর দেখল ঘর দু'টোর দরজা ভেজানো। প্রথমে বড় ঘরটায় ঢুকল সে। ঘরের কোণে খাটিয়ায় বিছানা, পাশে রান্নার সরঞ্জাম এবং প্রচুর বস্তা পাহাড় হয়ে আছে। দ্বিতীয় ঘরটি পরিষ্কার সেখানেও খাটিয়াতে বিছানা পাতা, টেবিল চেয়ার এবং একটা বেশ বড় হ্যারিকেন ছাড়া টর্চ রাখা আছে। বাইরে বেরিয়ে এসে আবার লছমনের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে কিছুক্ষণ ডাকল সে।

লোকটা গেল কোথায়? পাণ্ডেজি বলেছিলেন লছমন এখানে পঁচিশ বছর ধরে আছে। কিন্তু বয়স এবং অসুস্থতার কারণে সে ভালভাবে কাজ করতে পারছে না। এটা যে একটা দ্বীপ তা পাণ্ডেজি বলেননি। বলেছিলেন, 'ওখানে প্রচুর গাছ আছে, আমেরই বেশি। মাস দু'য়েক পরে কয়েক কুইন্টাল আম পাওয়া যাবে। সেগুলো আধপাকা হতেই প্যাক করে রাখবেন। লছমনই দেখিয়ে দেবে। আমাদের লোক ট্রাক নিয়ে যাবে আনতে। চাষের জমি আছে। দু'টো ফসল হয়। যারা চাষ করে তারা প্রতিবছর ঠিক সময়ে এসে যায়। এবার তারা টাকা বাড়াতে বলেছে। কথাবার্তা বলে আমাদের জানালে আপনার কাছে টাকা পাঠিয়ে দেব। প্রচুর দামি গাছ আছে ওখানে। সেগুলো যাতে কেউ চুরি করে কেটে নিয়ে না যায় তা লক্ষ রাখতে হবে আপনাকে। আপনার মোবাইল আছে? নেই! ঠিক আছে, লছমনের মোবাইল ব্যবহার করবেন।'

সেই লছমনকেই পাওয়া যাচ্ছে না! দ্বীপটাকে ঘুরে দেখতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। বিশাল সম্পত্তি। এতক্ষণে খিদে পেয়ে গিয়েছে তার। সেই শেষরাতে জংশন স্টেশনে মুখ ধুয়ে এক কাপ চায়ের পর পেটে কিছু পড়েনি। লোকটাকে না পেলে কতক্ষণ অভুক্ত থাকতে হবে তা কে জানে। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে গিয়ে বস্তুটিকে দেখতে পেয়ে সজাগ হল শিবশংকর। বিলের জল খানিকটা খাল হয়ে জমিতে যেখানে ঢুকেছে তার কাছে যেটা পড়ে আছে সেটা যে মোবাইল ফোন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দ্রুত পৌঁছে সেটা তুলে নিয়ে দেখল ব্যাটারি ডাউন হয়ে গিয়েছে। এটা নিশ্চয়ই লছমনের সম্পত্তি। কিন্তু এখানে পড়ে আছে কেন?

অসতর্ক অবস্থায় ওর পকেট থেকে পড়ে যাওয়ায় টের পায়নি! কিন্তু এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই, মোবাইলের ব্যাটারি চার্জ করে কীভাবে? কয়েকবার বোতাম টেপার পরে যখন আলো জ্বলল না তখন মনে হল, যন্ত্রটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় লছমন ফেলে দেয়নি তো! সে জলের দিকে তাকাল। তখনই মনে হল লছমনকে কেউ মেরে ফেলেনি তো? মেরে এই বিলের জলে ফেলে দিলে ভেসে না ওঠা পর্যন্ত, তার খোঁজ পাওয়া দায়। বয়স্ক অসুস্থ মানুষকে মারতে কোনও সমস্যা নেই। সে জলের কাছে এগিয়ে গেল। না, কোনও চিহ্ন নেই।

দ্রুত বিলের সেই জায়গায় শিবশংকর চলে এল যেখানে সে নৌকা থেকে নেমেছিল। লছমনের নিরুদ্দেশের খবরটা পুলিশকে এবং পাণ্ডেজিকে জানানো দরকার। এখানে থানা কোথায়? তার মনে হল কুসুম ভার্গবের কাছে তার যাওয়া উচিত। বিডিও কিছু বললে থানা নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। দূরে একটা নৌকো দেখতে পেয়ে সে হাত নেড়ে চিৎকার করতে লাগল। প্রথমে সেই চিৎকার উপেক্ষা করলেও শেষ পর্যন্ত কাছে চলে এল নৌকো। শিবশংকর তার বাজারি হিন্দিতে অনুরোধ করল ওপারে পৌঁছে দিতে। নৌকোয় দু'জন মানুষ, একজনকে দেখলেই বোঝা যায় মালিক শ্রেণির, অন্যজন কর্মচারী। যার হাতে বৈঠা। বৈঠাধারী বলল, 'আমাদের খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। আমরা আশ্রমে যাচ্ছি। সেখানে আপনাকে নামিয়ে দিতে পারি।'

আশ্রমটা যেহেতু ওপারেই তাই নৌকোয় উঠে বসল শিবশংকর। মালিক ব্যক্তিটি চুপচাপ লক্ষ করছিলেন। এখন ডিবে থেকে পান বের করে মুখে পুরলেন। শিবশংকর দেখল নৌকোর খোলে প্রচুর উপঢৌকন রাখা আছে। সম্ভবত আশ্রমের জন্যেই।

দূর থেকেই কাঁসরঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ঘাটে নৌকো লাগতেই দু'জন লোক লম্বা তক্তা নিয়ে এল মালিক ব্যক্তিকে নামানোর জন্য। মোটাসোটা মানুষটির শরীরে প্রচুর গহনা। কোনওমতে তক্তা বেয়ে নীচে নামলেন তিনি। তাঁকে চোখের আড়ালে যেতে দিয়ে শিবশংকর দু'জনের একজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে থানা কোথায়?'

'থানা? বিশ মাইল দূরে। থানায় গিয়ে কী হবে? যদি কোনও সমস্যা হয়ে থাকে তা হলে বাবার কাছে যান। এখানে বাবাই শেষ কথা।' লোকটা জানাল।

শব্দ অনুসরণ করে শিবশংকর যেখানে পৌঁছল সেখানে জনাষাটেক মানুষ বাবু হয়ে বসে আছেন। উল্টোদিকের বেদিতে যিনি বসে আছেন তাঁর মাথায় জটা, সাদা দাড়ি নাভি স্পর্শ করেছে। চট করে বয়স বোঝা মুশকিল। চমৎকার হিন্দিতে বাবা সদানন্দ বলছিলেন, 'তুমি যেভাবে জীবনযাপন করে সুখ পাও তা অনায়াসে করতে পারো। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে যদি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-

প্রতিবেশীদের দুঃখের কারণ হও তা হলে পরমাবতার তোমাকে স্নেহ করবেন না। তোমরা বলছ নতুন বিডিও মেয়েমানুষ হয়েও সিগারেট খায়, শার্ট-প্যান্ট পরে। সে যদি পুরুষ হত তা হলে কি তোমরা বিরক্ত হতে? হতে না। এখন দেখতে হবে নতুন বিডিও এলাকার মানুষের বিপদে আপদে কতটা সাহায্য করছেন! সরকার তাঁর ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা তিনি পালন করছেন কি না। তাতে যদি কোনও ফাঁকি না থাকে তা হলে প্যান্ট আর সিগারেট নিয়ে তোমরা কেন এত দুশ্চিন্তায় পড়েছ? নাগা সন্ন্যাসীরা কুম্ভমেলায় যোগ দিতে হিমালয় থেকে যখন নেমে আসেন তখন কি সরকার তাঁদের প্রকাশ্য স্থানে উলঙ্গ থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার করেন? করেন না।' বলতে বলতে শিবশংকরের ওপর নজর যেতেই থেমে গেলেন বাবা সদানন্দ, 'পরমাবতার অনুগ্রহ করে আমাকে যে স্মরণশক্তি দিয়েছেন তাতে কাউকে একবার দেখলে আমি ভুলি না। তোমাকে নিশ্চয়ই আমি আগে দেখিনি।'

'না। আমি আজ সকালের ট্রেনে এসেছি।' শিবশংকর উত্তর দিল।

'ও হো! তা হলে তো তুমি নিশ্চয়ই এখন ক্ষুধার্ত। বিশ্রামের প্রয়োজন। বাবা যাদব, যাও, এই আগন্তুককে ভিতরে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করো।'

'যথা আজ্ঞা বাবা।' একজন লোক এগিয়ে এল শিবশংকরের দিকে।

শিবশংকর দেখল বাবা সদানন্দ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছেন। সে মরিয়া হয়ে লছমনের ব্যাপারটা তাঁকে জানাল। চোখ বন্ধ করে একটু ভাবলেন বাবা সদানন্দ। তারপর হেসে বললেন, 'ভবিতব্য কে খণ্ডাবে? তার যদি যাওয়ার হয় তা হলে চলেই গেছে। কী বলো, কিষেণচাঁদ? সামনে বসা সেই ধনী মালিক, যাঁর নৌকোয় শিবশংকর এসেছিল, মাথা নাড়লেন সমর্থনে। যাদব শিবশংকরকে বলল, 'চলুন।'

ভিতরের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে লোকটা তাকে ফল এবং পায়েস খেতে দিল। শিবশংকর জেনারেটরের শব্দ পেয়ে যাদবকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের কাছে মোবাইল চার্জার আছে?'

যন্ত্রটাকে দেখে হাসল যাদব, 'এটা তো লছমনের মোবাইল। দু'দিন অন্তর ও এখানে এসে চার্জ করিয়ে নিয়ে যেত। দিন, বসিয়ে দিচ্ছি।'

পেট ভরে গেল খেয়ে। এখন কী করা উচিত? বিশ মাইল হেঁটে থানায় যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। লছমনকে যে পাওয়া যাচ্ছে না এক দঙ্গল মানুষের সামনে বাবা সদানন্দকে সে জানিয়েছে কিন্তু তিনি একটুও গুরুত্ব দেননি। উল্টে তাঁর কথায় ওই কিষেণচাঁদ মাথা নেড়ে হেসেছে। ব্যাপারটা পাণ্ডেজিকে জানানো দরকার।

আধঘণ্টা পরে যাদব এসে মোবাইল ফেরত দিয়ে বলল, 'যা হয়েছে তাতে কথা বলা যাবে।'

বোতাম টিপতেই আলো জ্বলল। কিন্তু পাণ্ডেজির নাম্বার সে তো জানে না। সে বোতাম টিপে দেখল ওই মোবাইলে একটাই নাম্বার স্টোর করা আছে। সেই নাম্বার থেকে ফোন এসেছে এবং গিয়েছে। সেই নাম্বারটাই টিপল শিবশংকর। একটু পরেই রিং শুনতে পেল সে এবং তারপর গলা, 'হ্যালো। কী ব্যাপার? বাঙালিবাবু পৌঁছে গিয়েছে?'

গলাটা পাণ্ডেজির বুঝতে পেরে শিবশংকর বলল, 'আমি শিবশংকর। লছমনকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। ওর মোবাইল জলের ধারে পড়ে ছিল। কী করব?'

'সে কী! আপনি এক কাজ করুন, ওখানে একটা আশ্রম আছে। গিয়ে দেখুন সেখানে তাকে পান কি না! না পেলে থানায় খবর দিতে হবে।'

'আমি আশ্রম থেকে বলছি। এখানে লছমন নেই। আর থানা অনেক দূরে।'

'তা হল বিডিও অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করুন। খুব দরকার না থাকলে লছমন ওখান থেকে বের হয় না। আর যদি যায় সঙ্গে মোবাইল রাখে। কী হল জানাবেন।' লাইন কেটে দিলেন পাণ্ডেজি।

যাদব চুপচাপ শুনছিল। বলল, 'ওই বাগানের ওপর অনেকের লোভ আছে। লছমন বলেছিল ওকে নাকি ভয় দেখানো হচ্ছে। ভগবান ওকে রক্ষা করুন।'

'আচ্ছা, এখান থেকে বিডিও অফিস কতদূরে?'

'এক মাইল হবে। বেরিয়ে ডানদিকের রাস্তা।' তারপর হাসল, 'কিষেণজির সঙ্গে আজই আলাপ?'

'আলাপ হয়নি। ওঁরা দয়া করে নৌকোয় তুলে নিলেন। উনি যে বাবা সদানন্দর শিষ্য তা বুঝতে পারলাম। খুব ধনী মানুষ?'

'খু-উ-ব। আর কিছু জানতে চাইবেন না ওঁর সম্পর্কে।'

'আমি এখন বিডিও অফিসে যাব। বাবা সদানন্দকে দয়া করে বলে দেবেন।'

যাদব ঘাড় নাড়ল।

বলেছিল এক মাইল, বিডিওর অফিসে পৌঁছতে যে সময় লাগল তাতে শিবশংকরের মনে হল অন্তত আড়াই কিলোমিটার সে হেঁটেছে। তা হলে থানায় যেতে হলে যা বলেছিল তার ডবল পথ হাঁটতে হত।

এখন ভরদুপুর। দুটো অফিসঘর। একটাতে কয়েকজন কর্মচারী গুলতানি করছে। বিডিও মেমসাহেবের খোঁজ করতে তারা প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করতে লাগল কী দরকার, সমস্যা কী? একজন বলল, বিডিও মেমসাহেবের ভীষণ রাগ, তাঁর কাছে যাওয়ার দরকার নেই। তারাই তাকে সাহায্য করতে পারে।

শিবশংকর বুঝতে পারল এরা বেশ লোভী মানুষ। সে বলল, 'উনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে চুপসে গেল লোকগুলো। পিওন গোছের একজন লোক বলল, 'ওই বাড়িতে ওঁকে পাবেন। যান।'

দরজা ভেজানো ছিল, শব্দ করতে কুসুম বেরিয়ে এল, 'এ কী! আপনি?'

দ্রুত কথাগুলো বলল শিবশংকর।

'আপনার কি মনে হচ্ছে লোকটা খুন হয়েছে?'

'আমি জানি না। কোথাও গেলে মোবাইল মাটিতে ফেলে যাবে কেন?'

কুসুম একটু ভাবল। তারপর ভিতরে চলে গেল। ওর পরনে একটা লুঙ্গি এবং ফুলহাতা জামা। বোধহয় এখন ওর বিশ্রামের সময়।

কয়েক মিনিট পরে সে বেরিয়ে এল সকালের পোশাকে। বারান্দা থেকে হাত নেড়ে বেয়ারাকে কাছে ডেকে বলল, 'আমি একটা এনক্যুয়ারিতে যাচ্ছি। কোনও প্রব্লেম হলে ফোন করবে।' তারপর শিবশংকরকে বলল, 'আসুন।'

যে পথ দিয়ে শিবশংকর এসেছিল সেই পথ না ধরে পেছনে একটা পথে হাঁটতে লাগল কুসুম। মেয়েটা বেশ লম্বা। পাঁচ ফুট সাত তো বটেই।

সে যে ওর চেয়ে চার ইঞ্চি বড় তা এখন মনে হচ্ছে না। লম্বা পা ফেলে হাঁটছে সে গাছগাছালির ভিতর দিয়ে। মিনিট দশেক যাওয়ার পর সেই বিলটার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। একটা নৌকো বাঁধা আছে ঘাটে। কুসুম জিজ্ঞাসা করল, 'নৌকো বাইতে পারেন?'

'কখনও করিনি।'

দু'জনে নৌকোয় ওঠার পর কুসুম দাঁড় হাতে নিয়ে বাইতে বাইতে জিজ্ঞাসা করল, 'আর কী কী করেননি?'

কী জবাব দেবে বুঝতে পারল না শিবশংকর।

'কাউকে খুন করেছেন কখনও? করেননি। ড্রাগ বা গাঁজা খেয়েছেন? খাননি? হুইস্কি বা ভদকা? তাও না। বাঃ।'

নৌকো চালাতে লাগল কুসুম। শিবশংকর বুঝতে পারছিল না ওকে। খুনের কথা কেন জিজ্ঞাসা করল? ও কি ভাবছে সে লছমনকে খুন করেছে? শিরশিরিয়ে উঠল মেরুদণ্ড।

'আপনি বিয়ে করেছেন?' আচমকা প্রশ্ন এল।

'না।' দ্রুত মাথা নাড়ল শিবশংকর।

'প্রেম? প্রেম করেছেন?'

একটু কুঁকড়ে গেল শিবশংকর, মাথা নেড়েই নিঃশব্দে না বলল।

'সাবাস। সাঁতার কাটতে পারেন?'

'না, মানে শেখা হয়নি।'

'ও। তা হলে যদি এখন নৌকোটাকে উল্টে দিই তা হলে আপনি কী করবেন?'

'ডুবে যাব। মরে যাব, যদি আপনি না বাঁচান।'

হাসল কুসুম। আর কিছু বলল না।

এখন সূর্য পশ্চিমের দিকে এগোচ্ছে। জলের ওপর চমৎকার বাতাস বইছে। বসন্ত ঋতুতে আকাশ যেমন হয় ঠিক সেইরকম। প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে নৌকো ভিড়ল দ্বীপে। কুসুম বিরক্ত মুখে বলল, 'ওদের বলেছিলাম নৌকোয় ফুটো সারাতে, যেমন ছিল তেমনই রেখে দিয়েছে। ফেরার সময় জল বের করে ফেলতে হবে।' শিবশংকর দেখল চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল ঢুকেছে নৌকোর খোলে।

এখন দ্বীপে গাছের ছায়া। কুসুমকে নিয়ে গোটা দ্বীপ ঘুরতে হল শিবশংকরকে। যেখানে মোবাইল পড়েছিল সেই জায়গাটা দেখাল সে। কুসুম খুঁটিয়ে দেখল। ঘাসের ওপর কাউকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও চিহ্ন নেই। নদীর গায়ের মাটি ভাঙা থাকা, তা নেই। রক্তেরও দাগ নেই। কুসুম বলল, 'লোকটাকে এখানে খুন করা হয়নি। ঠিক আছে, আমি থানায় ব্যাপারটা জানিয়ে দেব। কিন্তু আপনি এখানে একা থাকতে পারবেন? খাওয়াদাওয়া করতে তো হবে।' সে সিগারেট ধরাল।

'আমি বুঝতে পারছি না কী করব।' বিড়বিড় করল শিবশংকর।

ওরা ফিরে এল দ্বীপের ওদিকে। তখনই দেখা গেল নৌকোটাকে। যার একদিকে আয়েস করে বসে আছেন কিষেণচাঁদ। কর্মচারীটি নৌকো বাইছে। মাঝখানে বসে আছে ঘোমটা মুখ ঢাকা সেই স্বাস্থ্যবতী মহিলা। আর এপাশে বসে বৃদ্ধ মুখ তুলে আকাশ দেখছেন। কুসুম বলল, 'সোয়াইন!'

'আপনি কিষেণচাঁদজিকে চেনেন?' শিবশংকর অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'হাড়ে হাড়ে। আমাকে একলা থাকতে দেখে ভেবেছিল, যাক গে! আপনি ওকে চিনলেন কী করে? এই তো সবে এসেছেন।' কুসুম তাকাল।

'বাবা সদানন্দর আশ্রমে দেখা হয়েছিল। ওই যে মহিলা এবং বৃদ্ধ, ওঁর সঙ্গে যাচ্ছেন, ওঁরা আমার সঙ্গে একই ট্রেনে এসেছিলেন।'

'তাই বলুন। এর জন্য কিষেণচাঁদ বাবা সদানন্দর আশ্রমে অনেক টাকা প্রণামী দিয়েছে। ওই বুড়ো বছর খানেক পরে বউ-বাচ্চা নিয়ে এসে বাবা সদানন্দকে পুজো দিয়ে যাবে টাকা গহনা দিয়ে।' কুসুম বলল।

'ওদের সঙ্গে বাচ্চা নেই তো!'

'এখন নেই। এক বছরের মধ্যে হয়ে যাবে। কিষেণচাঁদের সেই খ্যাতি আছে।' কুসুম বলল, 'আপনি তা হলে এখানে থাকুন, আমি চলি।'

'আপনি চলে যাবেন?' কাতর গলায় বলে ফেলল শিবশংকর।

'না গিয়ে কী করব?'

'না, ঠিক আছে।'

'আপনি কখনও হ্যাঁ বলতে শেখেননি, না? 'হাসতে হাসতে বলে একটা গাছের দিকে তাকাল কুসুম, 'এই গাছটাকে এখানে রেখেছে এরা?'

শিবশংকর গাছটাকে দেখল। কুসুম জিজ্ঞাসা করল, 'এই গাছটাকে চেনেন?'

মাথা নেড়ে শিবশংকর বলল, 'হ্যাঁ।'

'চেনেন? পশ্চিমবাংলায় এই গাছ হয়? কী নাম বলুন তো?'

'কুদমা। ওই সুন্দর লাল ফুলগুলো খুব বিষাক্ত।' বলল শিবশংকর।

'বিষাক্ত?'

'হ্যাঁ, লোকে আত্মহত্যা করতে চাইলে ওই ফুল গোটাকয়েক খেয়ে নেয়।'

'অ্যাঁ? এ সব তথ্য কোথায় পেলেন?' চোখ বড় হয়ে গেল কুসুমের।

'কিষেণচাঁদজির নৌকোয় যে বৃদ্ধ বসে ছিলেন তিনি স্টেশনের বাইরে এসে এই গাছ দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন। রস লাগলে হাতে ঘা হয়ে যাবে।'

কুসুম এগিয়ে গিয়ে গাছের নীচে পড়ে থাকা একটা ফুল তুলে বলল, 'কথাটা সত্যি, এখানে এই ফুলকে কুদমা বলা হয়। কুদমা শব্দটার আর একটা মানে আছে। যে মেয়ের বিয়ের পরে বাচ্চা হয় না তাকে এরা কুদমা বলে। শুভকাজে তাদের ডাকা হয় না।'

'সে কী!'

'ওই বৃদ্ধ আপনাকে বিভ্রান্ত করেছেন। যে জন্য এখানে এসেছেন তা তাঁকে শান্তি দিচ্ছে না হয়তো তাই যা সুন্দর তাকেই বিষাক্ত বলছেন।' ফুলের পাপড়ি মুখে দিল কুসুম। চিবিয়ে বলল, 'বেশ মিষ্টি স্বাদ! এখানকার যারা খুব গরিব মানুষ তারা বসন্তকালে এই ফুল খেয়ে বেঁচে থাকে। খেয়ে দেখুন!' একটা পাপড়ি এগিয়ে ধরল কুসুম।

একবার চিবিয়েই বৃদ্ধের ওপর তার রাগ হল। এত বড় মিথ্যে বলল লোকটা। কুসুম বলল, 'আমি যাচ্ছি। আজ রাত্রে কিছু করার নেই। কাল দেখা যাবে।'

সে নৌকো থেকে জল বের করে উঠে বসল, 'কেমন লাগল কুদমা?'

'বেশ মিষ্টি।'

'কুদমা একটি কুসুম। কুসুম আবার আমারও নাম।'

সেই সময় লছমনের মোবাইল বেজে উঠল। দ্রুত কানে চেপে হ্যালো বলতেই শিবশংকর পাণ্ডেজির গলা শুনতে পেল, 'লছমনকে নিয়ে ভাবার দরকার নেই। ও খুব অসুস্থ বলে পাটনায় চলে গিয়েছে। মোবাইলের ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাওয়ায় কথা বলতে পারেনি। রাগে ছুড়ে ফেলেছিল ওখানে।'

'ও।'

'আপনার থাকার একটু অসুবিধে হলেও লছমন সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত মানিয়ে নিন। রাখছি।'

কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল কুসুম। শিবশংকর হাসিমুখে বলল ঘটনাটা। কুসুম বলল, 'থ্যাঙ্ক গড। এখানে আপনাকে ভূতের ভয় পেতে হবে না আবার পুলিশকে বলে ঝামেলায় জড়াতে হবে না। বাঃ, দেখছেন।'

শিবশংকর দেখল আকাশের কোণে আধুলির মতো চাঁদ লাফিয়ে উঠে বসল। চাঁদের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে কুসুমের দিকে তাকাতে সে দেখল ছিপছিপে লম্বা মেয়েটা নিঃশব্দে নৌকো বেয়ে চলে যাচ্ছে নদীর ওপারে। হঠাৎ মন ভাল হয়ে গেল শিবশংকরের। খু-উ-ব ভাল।

মোমবাতির দু'দিক

এক বছর আগে স্বামীকে সুস্থ করে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিল সোহাগ। মাত্র দিন দশেক হাসপাতালে ছিল অবনী। এই দশ দিন ঝড় বললে কম হয়, মনে পড়লে শরীর হিম হয়ে যায় এখনও। কলকাতার সেই হাসপাতালে ঈশ্বরের একজন পুত্র আছেন। সে সময় সোহাগের এমনই মনে হয়েছিল। কারণ যে মানুষটা আর বাঁচবে না বলে চেনাজানা ডাক্তার, আত্মীয়স্বজন রায় দিয়েছিল, তাকে উনি বাঁচিয়ে দিলেন।

অবনী স্কুলে পড়ায়। একদিন পড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময় মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সবাই ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসে। ধুম জ্বর চলে কিছুদিন। পাড়ার ডাক্তার জ্বর কমাতে না পেরে রক্ত পরীক্ষা করতে বললেন। পরীক্ষায় জানা গিয়েছিল অবনীর রক্তে ক্যানসার হয়েছে। কান্নাকাটি সামলে সোহাগ ছুটেছিল কলকাতার হাসপাতালে। অবনীর বন্ধু সতীশ সেই সময় অনেক করেছে। এ-ডাক্তার, সে-ডাক্তার, সোহাগ তো কিছুই চিনত না। সতীশই ঘুরে ঘুরে সন্ধান নিয়েছে। যে শুনেছে সে-ই বলেছে এই কেসে কিছু করার নেই।

সতীশ বন্ধু বটে কিন্তু বেশি মাখামাখি পছন্দ করত না অবনী। চল্লিশ পেরিয়েও বিয়ে-থা করেনি। রাতে একা একা মদ খায়। এমন লোক বাড়িতে যত কম আসে, তত ভালো। বাইরের বন্ধুত্ব বাইরেই রাখতে চেয়েছিল সে। কিন্তু অবনীর অসুখ হতে সতীশই ঝাঁপিয়ে পড়ল। সোহাগ আর তার ছেলে নবীনকে বলল, ভয় নেই, চেষ্টার শেষ দেখব।

লোকটা সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছিল, কিন্তু সেটা কাটতে সময় লাগল না। ওই সতীশই পার্ক স্ট্রিটের হাসপাতালের খবর আনল। সেখানে এই রোগের চিকিৎসা হয়। তিনজনে মিলে অনেক কষ্টে অবনীকে নিয়ে পৌঁছে গেল এক সকালে। টিকিট করে দোতলায় উঠতেই মনে হয়েছিল কোনও নার্সিং হোমে এসেছে। ডাক্তারবাবুর চেম্বারে তখন বেজায় ভিড়। সবাই একসঙ্গে নিজেদের অসুখের কথা বলছে। সুদর্শন বৃদ্ধ ডাক্তার হাসিমুখে সব শুনছেন, জবাব দিচ্ছেন। অবনী ভর্তি হতে গিয়েছিল এক শর্তে। কেনা রক্ত আনা চলবে না, নিজেদের রক্ত দিতে হবে আত্মীয়কে বাঁচাতে। তাতে টান থাকবে প্রাণের। দশ দিন রোজ দু'বেলা সোহাগ

গিয়েছিল সতীশের সঙ্গে হাসপাতালে। একটু একটু করে ডাক্তারবাবু আশার কথা বলেছিলেন। জ্বর কমে গেলে সতীশের হাত জড়িয়ে অবনী বলেছেন, আমাকে বাঁচাও সতীশ, আমি বাঁচতে চাই। সতীশ কথা দিয়েছিল। সে চেষ্টা করবেই। দশ দিনে আট হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। দু'হাজার ঘরে ছিল, বাকিটা সতীশ দিয়েছিল। ওই দশ দিনে একই সঙ্গে অবনীর জন্য আশঙ্কা আর সতীশ সম্পর্কে কৌতূহল বেড়ে গেল সোহাগের। কোনও কোনও দিন প্রয়োজনে দুপুরে থাকতে হয়েছিল হাসপাতালে। তখন সতীশ তাকে খেতে নিয়ে গিয়েছে পার্ক স্ট্রিটের চিনে দোকানে। কোনও দিন ওসব অভিজ্ঞতা ছিল না সোহাগের। সতীশ খুব গম্ভীর মুখে বসে থাকত, সঙ্গে হাঁটত। কোনওরকম তরল কথা বলত না। শেষ পর্যন্ত সোহাগ বলেছিল, 'আপনার অনেক টাকা বন্ধুর জন্য খরচ হচ্ছে, তার ওপর এসব—।' সতীশ জবাব দেয়নি। সোহাগ আবার বলেছিল, 'আমার ভালো লাগছে। আজকাল খুব কম ভালো লাগে, লাগে না বললেই হয়। এটুকু থেকে বঞ্চিত করবেন?'

'আপনি বিয়ে-থা করেননি কেন?'

'করা হয়নি। তাছাড়া করে ফেললে সে কি রোজ আপনার সঙ্গে আসতে দিত?'

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠেছিল সোহাগের। কিন্তু সেই সঙ্গে যে ভালোলাগা ছড়িয়ে পড়েছিল সেটাও সত্যি। মুখ নামিয়ে নিয়েছিল সে। খাবার গলায় আটকে যাচ্ছিল কিন্তু সতীশ আর কথা বাড়ায়নি। শুধু কথা নয়, ব্যবহারেও পরিবর্তন হয়নি তার।

বাড়িতে ফিরে বারো বছরের নবনীকে অকারণে জড়িয়ে ধরেছিল সোহাগ। এমন আদরে ইদানীং অভ্যস্ত নয় অবনী। জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বাবা কি বাঁচবে না মা?'

চমকে সোজা হয়ে সোহাগ জবাব দিয়েছিল, 'না, না। ডাক্তারবাবু বলেছেন তোর বাবার শরীরে ওষুধ ভালো কাজ করছে। বেঁচে যাবেই।'

'সতীশকাকুর জন্যে বাবা বেঁচে যাবে, না?'

'ভগবানের জন্যে রে। তিনি সব করেন।'

দশ দিন পরে ডাক্তার অবনীকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ওকে প্রতি মাসে একবার করে এখানে নিয়ে আসবে। আমি পরীক্ষা করব। এই চিকিৎসা তিন বছর ধরে চলবে। যে ওষুধগুলো লিখে দিয়েছি, তা নিয়ম করে খাওয়াবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, যেন তিনি দয়া করেন।'

বাড়িতে এসে খাওয়াদাওয়া ইত্যাদিতে বেশ তাজা হয়ে উঠল অবনী। কাজে যোগ দিল। যারা বলেছিল বাঁচবে না তারা এবার বলল নিশ্চয়ই ব্লাড ক্যানসার হয়নি, অন্য কিছু হয়েছিল। প্রথম মাসে কলকাতায় ওকে এনে দেখিয়ে গেল সতীশ। ডাক্তার উন্নতি দেখে খুব খুশি।

সতীশ বাড়িতে রোজ আসছে, সোহাগের সঙ্গে কথা বলছে এটা মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না অবনীর। সতীশের কাছে ধার হয়ে গিয়েছে অত টাকা, এটাও ভালো লাগছিল না। সে সতীশকে ডেকে একদিন বলল, 'তোমার টাকা কীভাবে শোধ করব—!'

'আমি তোমাকে শোধ করতে বলেছি? নিজের পরিবারের জন্যে লোকে কি করে না? আমাকে যদি বাইরের লোক বলে মনে করো, তা হলে অন্য কথা।'

হঠাৎ এক ধরনের স্বস্তি হল অবনীর। মনে যা-ই থাক, সে মুখে কিছু বলল না। যতই তাজা ভাব দেখাক, ভেতর ভেতরে সে বোঝে আগের মতো নেই শরীরটা। ডাক্তার যেসব নিষেধ করেছেন তার মধ্যে একটি হল যৌনসম্পর্ক করা। এ ব্যাপারে অসুখের আগেই আগ্রহ কমে গিয়েছিল। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। সোহাগকে যেহেতু স্পর্শ করতে হচ্ছে না, তাই সতীশ যদি ওর সঙ্গে দুটো কথা বলে, খুশি থাকে, তাতে আর আপত্তি করার কিছু নেই।

দ্বিতীয় মাসে অবনীকে তাড়া দিল সোহাগ কলকাতায় গিয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে আসতে। সতীশ সঙ্গে যেতে চাইল। কিন্তু যাওয়ার দিন সে খবর পাঠাল তার জ্বর হয়েছে। উঠতে পারছে না। অবনী তাকে দেখে এসে বলল, 'নিজেই যাব। এখন তো আর চলাফেরার কোনও অসুবিধে নেই।'

অবনী চলে গেল। নবনী স্কুলে। সোহাগের মন ছটফট করছিল। লোকটা অসুস্থ হয়েছে অথচ অবনী দেখে এসে বলল না কেমন আছে। মানুষটা তাদের জন্য এত করল আর তার অসুখের সময় চুপ করে থাকবে। হঠাৎ মনে হল অবনীর অসুখের সময় যেতে যেতে উদ্বেগ কমে গিয়ে এক ধরনের ভালোলাগা তৈরি হয়েছিল। সেইটে আর নেই। দুপুরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। সতীশের বাড়ি বেশি দূরে নয়।

একটা বুড়ো চাকর নিয়ে সতীশ থাকে। চাকরটিকে সে চিনত। প্রয়োজনে সতীশ অনেকবার ওকে বাড়িতে পাঠিয়েছে।

চাকর বলল, 'বাবুর খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকতে দিচ্ছেন না। আপনি একটু চলুন।'

সতীশ শুয়ে ছিল বিছানায়। চোখ বন্ধ। পায়ের শব্দেও চোখ খুলল না। কপালে হাত রেখে সোহাগ দেখল পুড়ে যাচ্ছে। চাকরকে বলে আর ন্যাকড়া এনে জলপটির ব্যবস্থা করল। মাথার পাশে বসে জলপটি দিতে লাগল। সতীশ কালো চোখ মেলে হাসল। সোহাগ জিজ্ঞেস করল, 'বাধালেন কী করে?'

'ঠাণ্ডা লেগে। কিছু না। সেরে গেলে ভালো হয়ে যাব।' তারপর হাসল, 'এখন আমার জ্বর কমে যাবে।'

একটু কাঁপুনি এল যেন শরীরে। সোহাগ ঠোঁট কামড়াল। বুড়ো চাকর ডাক্তার ডেকে আনল। তিনি ওষুধ দিলেন। এরকম জ্বর আজকাল খুব হচ্ছে। ভয়ের কিছু নেই। তবে মাথা ধুইয়ে গা মুছিয়ে দিতে হবে।

ডাক্তার চলে গেল। বুড়ো চাকর গেল ওষুধ আনতে। আর ওসব কাজ নিজের হাতে করল সোহাগ।

ঠিক এই সময়ে এ বাড়িতে এল অবনী। এসে দৃশ্যটা দেখেও রাগ করল না। বলল, 'বাড়িতে ফিরে বুঝলাম তুমি এখানে এসেছ, তা কেমন আছে ও এখন?'

'জ্বর আছে।'

'বেচারা। ভাগ্যিস তুমি এসেছ।' কিছুক্ষণ বসে রইল অবনী। সে আসার পর থেকে সোহাগ আবিষ্কার করল তার মধ্যে আড়ষ্টতা এসেছে। কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। সতীশ ওই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করল, 'কলকাতায় গিয়েছিলে?'

অবনী জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'ডাক্তার কী বলল?'

'উন্নতি হচ্ছে।'

'বাঃ, খুব ভালো খবর!' সতীশ হাসল।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর হঠাৎ সোহাগকে জড়িয়ে চুমু খেল অবনী। পাশের ঘরে নবনী শোয়। তার দরজা আলাদা। সোহাগ বলল, 'শুয়ে পড়ো।'

অবনী শুনল না। মরিয়া হয়ে সে তার স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠা করল। অনেক বাধা দিয়েছিল সোহাগ। ডাক্তারের নিষেধের কথা বলেছিল। অবনী জানিয়েছিল,আজ নাকি সে ডাক্তারের অনুমতি পেয়েছে। পেতে পারে, কিন্তু সোহাগের মনে হয়েছিল অসুস্থ সতীশকে সেবা করতে দেখার পর এই কাণ্ড করল অবনী। মন তেতো হয়ে গেল সোহাগের। আর সেই সঙ্গে অবনীর ওপর রাগ।

পরদিন সে ইচ্ছে করেই গেল না সতীশকে দেখতে। অবনী বিকেলে জিজ্ঞাসা করল, 'সতীশকে দেখতে যাওনি?'

জবাব দিল না সোহাগ। সেদিন রাতে অবনী তাকে স্পর্শ করল না। পরের দিন সতীশ নিজেই এল। রুগ্‌ণ শরীর নিয়ে তাকে আসতে দেখে রাগ করল সোহাগ। সতীশ হাসল, চা খেল, তারপর রিকশায় বাড়ি ফিরে গেল। সেই রাতে আবার জোর-জবরদস্তি। কোনওমতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ফোঁস করে উঠল সোহাগ, 'তুমি কী চাও? সতীশবাবু এ বাড়িতে না আসুক?'

'হঠাৎ সতীশের কথা?'

'তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো?'

'করি। তাই রোজ মনে করিয়ে দিতে চাই আমি তোমার স্বামী।'

ঘেন্নায় কথা বলতে ইচ্ছে করল না সোহাগের।

বাক্যালাপ বন্ধ। সতীশ নিয়মিত আসে। তার সঙ্গে কথা বলে অবনী। কিন্তু নিজেকে সরিয়ে রাখে সোহাগ। যতটা সম্ভব। অবনী সম্পর্কে সে নিস্পৃহ হয়ে পড়ল। সতীশ এসে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করে। তখন কথা বলতেই হয়। আর মনে মনে শঙ্কিত হয় রাতে আক্রমণ হবে। কিন্তু ইদানীং অবনীর প্রায়ই জ্বর হচ্ছে। মাথা ঘোরে। অবনীকে ডাক্তার দেখানোর কথা বললে সে জানায় কলকাতার ডাক্তারবাবু বলেছে উন্নতি হচ্ছে, এটা নেহাতই সাধারণ জ্বর।

সতীশের সঙ্গে সোহাগ কথা বলে না লক্ষ করেছে অবনী। এই নিয়ে সে রাগারাগি করে। আর এইটে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে সোহাগকে। তার মনে হয় অবনী তাকে ব্যবহার করতে চাইছে। একদিন এক জোড়া সোনার বালা বিক্রি করে জমিয়ে রাখল সে। সতীশ এলে ধারটা শোধ করবে। তার মুখের ওপর বলে দেবে আর এ বাড়িতে না আসতে। বলে দেবে অবনীর মনের কথা।

কিন্তু সেই দুপুরেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল অবনী। সেই সঙ্গে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। শুধু বলছে, মরে-যাব, মরে যাব। নবনীকে স্কুল থেকে ডাকিয়ে এনে সঙ্গে সঙ্গে অবনীকে রিকশায় তুলে কলকাতার ট্রেন ধরতে ছুটল সোহাগ। যাওয়ার সময় সতীশের জন্যে রাখা টাকাটা নিতে ভুলল না।

কোনওভাবে অবনীকে হাসপাতালে এনে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ছুটে গেল সোহাগ। ওই অসময়ে ডাক্তারবাবু রক্তের স্লাইড দেখছিলেন। চমকে উঠলেন কান্না শুনে, 'আমার স্বামীকে বাঁচান ডাক্তারবাবু?'

'তোমার স্বামী? কী হয়েছে তার?'

'আমাকে চিনতে পারছেন না ডাক্তারবাবু। এক বছর আগে ওঁকে নিয়ে এসেছিলাম। অবনী, অবনী দত্ত, ব্লাড-ক্যানসার পেশেন্ট।'

'ওঃ গড! এতদিন কোথায় ছিলে?'

'এতদিন আমি আসিনি, ও তো এসেছিল প্রতি মাসে।'

'মিথ্যে কথা। একবার এসেছিল এক বন্ধুর সঙ্গে। আর আসেনি।'

চমকে গেল সোহাগ, 'কী বলছেন! ও প্রতি মাসে আপনার কাছ থেকে ঘুরে গিয়ে বলত উন্নতি হচ্ছে।'

'তোমার স্বামী গত এগারো মাস আমার সঙ্গে দেখা করেনি। আমি পইপই করে বলে দিয়েছিলাম প্রতি মাসে চেক না করলে আমি বাঁচাতে পারব না। নিশ্চয় স্বামীর প্রতি তুমি কেয়ারলেস। আমি কিছুই করতে পারব না।'

'আপনার কাছে ও আসেনি?' বিস্ময় তখনও কাটছিল না। 'আপনি সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেননি?'

'কোন্ নিষেধাজ্ঞা? তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।'

ডুকরে কেঁদে উঠল সোহাগ। এই কান্নার অর্থ ভুল বুঝলেন ডাক্তারবাবু। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় সে?'

'নীচে।' কাঁদতে কাঁদতে সোহাগ বলল, 'আজ দুপুরে আবার ওইরকম হয়েছে, আপনি ওকে বাঁচান ডাক্তারবাবু। ওকে ভর্তি করে নিন।'

'আজ কোনও বেড খালি নেই। অসম্ভব। কাল নিয়ে এসো।'

'ওকে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।' সোহাগ কাঁদছিল।

ডাক্তারবাবু ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'কে ব্লাড দেবে? আমি ফ্রেশ ব্লাড নেব। কেনা ব্লাডে কাজ চলবে না।'

'আমি দেব। আমার ছেলে দেবে।'

'তোমাদের গ্রুপ কী?'

'তা তো জানি না।'

ডাক্তার নির্দেশ দিলেন ব্লাড ব্যাঙ্ক এদের রক্ত পরীক্ষা করতে। তারপর ছুটলেন পেশেন্টকে ভর্তি করতে। রক্ত পরীক্ষায় জানা গেল অবনীর সঙ্গে মা বা ছেলের রক্তের গ্রুপ মিলছে না। ডাক্তার আবার এলেন। এসে রাগত গলায় বললেন, 'তোমরা লোকটাকে প্রায় মেরে ফেলেছ। এক বছর এই রোগে চিকিৎসা ছাড়া থাকা মানে মরে যাওয়া। তোমরা আপাতত রক্ত দাও, আমি অন্য ডোনারের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করিয়ে দিচ্ছি। দেখি কী হয়!'

রক্ত দেওয়া হয়ে গেলে বসে ছিল ওরা ডাক্তারবাবুর প্রতীক্ষায়। নবনী ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, বাবা মরে যাবে না তো?'

'কেউ যদি আহত্মহত্যা করে তা হলে আমরা কী করব বাবা!'

'বাবা আত্মহত্যা করেছে?'

সোহাগ জবাব দিল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। হঠাৎ নবনী উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'মা, সতীশকাকু!'

চমকে মুখ তুলল সোহাগ। হন্তদন্ত সতীশ কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'অবনী কোথায়? কেমন আছে এখন?'

নবনী জবাব দিল, 'ডাক্তারবাবু বাবাকে স্ট্রেচারে করে ওপরে নিয়ে গেছে। আমরা রক্ত দিয়েছি কিন্তু রক্তের গ্রুপ মেলেনি।'

'সে কী! ঠিক আছে, তোমরা বোসো। আমি যাচ্ছি, অবনীর আর আমার রক্তের গ্রুপ এক। কোনও চিন্তা করতে হবে না।'

ব্লাড ব্যাঙ্কের দিকে চলে গেল সতীশ প্রায় দৌড়ে।

নবনীর হাত আঁকড়ে বসে ছিল সোহাগ। এবার ফিসফিস করে সে নবনীকে বলল, 'শোন!'

নবনী বলল, 'কী?'

সোহাগ আরও স্বর নামাল, 'আমি যে অত টাকা সঙ্গে এনেছি কাউকে বলার দরকার নেই। কেউ যেন না জানে।'

শিবেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'বুঝলাম না।'

'না বোঝার তো কিছু নেই। তুমি নাকি দু'জনকে স্কুলের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছ! আমি কিন্তু চাকরি করে তোমাদের সংসারে টাকা ঢালতে পারব না।'

নতুন বউয়ের নাম বেলা। মুহূর্তে মাথায় রক্ত উঠে গেলেও শিবেন্দু নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, 'এই বাড়িতে দাদা বউ এনেছেন, টাকা রোজগার করার মেশিন আনেননি।'

বেলা মাথা নেড়েছিল, 'তা হলে আমার বলার কিছু নেই।'

গরম হয়ে যাওয়া মাথা সে-রাতে ঠাণ্ডা হচ্ছিল না। শিবেন্দু দেখেন তার নতুন বউ দিব্যি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোবার আগে বাবু হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ বিড়বিড় করল। তারপর দু'টো হাত কপালে ঠেকিয়ে বালিশে মাথা রাখল।

বিয়ে করার বাসনা ছিল না শিবেন্দুর। তার রোগা শরীরটায় বয়স বাড়ছিল কিন্তু সে তার গ্রামের স্কুল নিয়ে এত ব্যস্ত যে শরীরের কোনও চাহিদা যেমন অনুভব করেনি তেমনই একাকিত্ব বোধ করেনি। প্রাথমিক স্কুলটাকে মাধ্যমিকে রূপান্তরিত করতে তিরিশের কোটা ছাড়িয়েছে বয়স। কিন্তু দাদা-বউদি দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর কৃষ্ণনগরের এই মেয়েটিকে তার কাঁধে চাপাতে পেরেছে। ফুলশয্যার রাতটা তাই এল আর গেল।

দু'দিনের বেশি কামাই করা কোনওমতে চলবে না বলে নতুন বউ বেলাকে দাদা-বউদির কাছে রেখে কর্মস্থলে চলে গেল শিবেন্দু। পশ্চিমবাংলার প্রায় অজ পাড়াগাঁয়ের নদীর পাশে স্কুল। সেখানেই তার দুই ঘরের বাড়ি। মাস্টারমশাইদের মিষ্টি খাওয়াতে হল। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগল নতুন বউকে?'

জবাবে হেসেছিল শিবেন্দু, উত্তর দেয়নি।

দশদিনের মাথায় দাদা এলেন বেলাকে অষ্টমঙ্গলা করিয়ে। বললেন 'তুই একা থাকতে পারিস, বউমা বিয়ের পর একা থাকবে কেন?' দাদা ফিরে গেলেন। দু'টো ঘর আর নদী দেখল বেলা, তারপর লিস্ট বানাতে বসল। তোমার বাড়িতে এটা নেই, ওটা নেই, এভাবে কি থাকা যায়? ম্যাগো! লিস্ট দেখল শিবেন্দু। তাতে সংসারের নানান কিছুর সঙ্গে রয়েছে, একটা বড় মজবুত ঠাকুরের আসন।

শিবেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী হবে?' 'আমার গোপাল থাকবে। ওর জন্যে দরকার।'

'গোপাল? তাকে কোথায় পাবে?'

গর্বিত হাসি হাসল বেলা, 'আমি সঙ্গে এনেছি। এখন ঘুমোচ্ছে।'

আবার মাথা গরম হয়ে উঠল। কিন্তু লিস্ট নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল শিবেন্দু। লোক পাঠিয়ে গঞ্জ থেকে যা যা চেয়েছিল বেলা, আনিয়ে দিল। সেই রাত্রে খেতে বসে শিবেন্দুর মনে হল মানুষের সব কিছু একদম খারাপ হয় না, একটু ভালও থাকে। বেলার একমাত্র প্লাস পয়েন্ট, রান্নার হাত বেশ ভাল।

গোপালের আসন থেকে যখন উঠে এসে বিছানায় বেলা দেহ রাখল, তখন রাত সাড়ে এগারোটা। পাড়াগাঁয়ে এটা অনেক রাত। তবু চেষ্টা করে জেগে ছিল শিবেন্দু। বউ পাশে শোয়ার পর তার মন ভাল হল কিন্তু কেমন কাহিল লাগছিল শরীরটা। সে পাশ ফিরে কাঁধে হাত রাখতেই বেলা চিত হল, 'জানো, এখানে এসে গোপাল খুব খুশি হয়েছে। খোলা মাঠে খুব খেলে বেড়াতে পারবে।'

'গোপাল, মানে, ওই মাটির পুতুল খেলে বেড়াবে?'

'এম্মা? ছিঃ। আমি যা বলি তা ও শোনে। বাপের বাড়িতে আমার আর একটা নাম ছিল। বলো তো কী?' বলেই হাসল বেলা, 'গোপালের মা।'

শিবেন্দু নিজেকে বলল, 'শান্ত থাকো, নো মোর রাগ।' তারপর বেলার শরীরটাকে কাছে টানতে চাইল—

বেলা বলল, 'এ কী! তুমি ওইসব করবে না কি?'

'কী সব?' হাসল শিবেন্দু।

'আমি জানি। বান্ধবীরা বলেছে। আমি তোমাকে ওইরকম লোক ভাবতেই পারি না যারা অচেনা মেয়ের জামাকাপড় খুলে আনন্দ পায়। তাছাড়া এখানে যদি তোমার দাদা বা দাদার ছেলে থাকত তা হলে কি তুমি এরকম করতে? বলো।' বেলা বলল।

'এখানে তো কেউ নেই।'

'বাঃ। ওই দ্যাখো, গোপাল বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে।' ছেলের সামনে মা-কে লজ্জায় ফেলবে তুমি? ছিঃ।' বেলা দু'হাতে মুখ ঢাকল।

'তা হলে পাশের ঘরে চলো!'

'পাগল না কি! গোপালের চোখ সব জায়গায়।' হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠল বেলা, 'আমাকে বিরক্ত কোনো না তো! আমাকে ঘুমোতে দাও।'

কয়েকদিন গুম হয়ে ছিল শিবেন্দু। তারপর জরুরি কাজে কলকাতায় যেতে হল। তার সঙ্গী শিক্ষকটি বটতলার চটি বই কিনে দেখালেন তাকে। বললেন, 'জাপানি তেলের চেয়ে বেশি কাজ দেয়। অথচ দাম খুব কম।' তার একটা পড়েই গা ঘিনঘিন করে উঠল। বমি পেল। সে বলল, 'এইসব বই গাঁয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

'আপনার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি?'

'না।'

'তা হলে জাপানি তেল কিনুন।'

নিজের সম্পর্কে একটা সন্দেহ দানা পাকাচ্ছিল, বেলার পাশে শুয়েও তার শরীর অস্থির হয় না অথচ মন চায়। লুকিয়ে তেলটা কিনে গাঁয়ে ফিরল সে। ঠিক করল আজ যতই আপত্তি করুক, সে কোনও কথা শুনবে না। রাত্রে শোওয়ার আগে তেলটা ব্যবহার করে যখন বিছানায় এল, তখন বেলা ঘুমোচ্ছে। ওর শরীরে হাত দিতেই শিবেন্দু বুঝল তেল কেনার টাকাটা জলে গিয়েছে। কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। ঘুমিয়ে ছিল বেলা, হঠাৎ পাশ ফিরল। তারপর উঠে বসে শিবেন্দুকে অপলক দেখতে লাগল। শেষে আঙুল বোলাল ওর চিবুকে, গালে। শিবেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'আমার কী ভাগ্য গো!' বেলা বলল, 'এইমাত্র স্বপ্ন দেখলাম। গোপাল আমাকে বলছে, আমি তোমার কাছে জীবন্ত থাকতে চাই। বলে তোমার শরীরে ঢুকে গেল গোপাল।'

'আমার শরীরে?'

'হ্যাঁগো। উঃ, কী আনন্দ হচ্ছে আমার। তুমি শোও, আমার কোলে মাথা রেখে শোও।' প্রায় জোর করে শিবেন্দুর মাথা টেনে নিল বেলা। তারপর ঝুঁকে পড়ে আদর করতে করতে বলল, 'আমার গোপাল সোনা, ঘুমোও, ঘুম পাড়িয়ে দিই তোমাকে। হাতের মৃদু আদর এখন শিবেন্দুর কাঁধ, মাথায়। চোখ বন্ধ করে শিবেন্দু পড়ে থাকল, তার শরীরে এখন বেলার বুকের চাপ, নরম অনুভূতি। বিয়ের পর এই প্রথম। গোপাল হয়ে থাকলে তাকে আর কোনও পরীক্ষা দিতে হবে না অথচ এই সুখটা নিয়মিত পাবে। শিবেন্দু সেই সুখ উপভোগ করছিল।

দিবা স্বপ্ন এবং হরিপদ

হাসপাতালের গেট দিয়ে ট্যাক্সি ঢুকতেই হরিপদ বাবু ব্যস্ত গলায় বললেন, 'এনক্যুয়ারি চলুন।'

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, তাই যাচ্ছি দাদা।

এনক্যুয়ারির সামনে ট্যাক্সি থামতেই দুজন উর্দিপরা লোক ছুটে এসে দরজা খুলে বলল, 'আপনি আগে নেমে আসুন, আমরা দিদিকে নামাচ্ছি।'

ট্যাক্সি থেকে নেমে হরিপদ বাবু দেখলেন ওরা খুব যত্নের সঙ্গে ওঁর স্ত্রীকে

নামিয়ে স্ট্রেচারে শুইয়ে ভেত.র নিয়ে গেল। তাঁর স্ত্রী তখনও ওমা, মাগো বলে কাতরে যাচ্ছেন।

তিনি ট্যাক্সিওয়ালার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই লোকটি হাসল, 'আপনি আগে ওঁকে ভর্তি করিয়ে দিন তারপর এসে ভাড়া দেবেন। আমি ওয়েটিং-এর জন্যে এক্সট্রা নেব না। মিটার দেখে যান।'

এরকম ট্যাক্সিওয়ালা যে কলকাতায় আছে হরিপদবাবুর তা জানা ছিল না। চট করে মনে পড়ল কিছুদিন আগে কাগজে পড়েছিলেন একজন ট্যাক্সিওয়ালা প্যাসেঞ্জারের ফেলে যাওয়া আশি হাজার টাকা থানায় জমা দিয়েছিলেন। তাহলে এই লোকটাও ওই রকম! তিনি ভেতরে দৌড়ে গেলেন। যে-ঘরে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে গিয়ে দেখলেন দুজন ডাক্তার ওঁকে পরীক্ষা করছেন। নার্স জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে?'

হরিপদবাবু বললেন, 'আজ্ঞে, ওঁর স্বামী।'

একজন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কি অসুবিধে হচ্ছে জানেন?'

'আজ ঘুম থেকে উঠে বলেছিল পেটে ব্যথা হচ্ছে। বেলা বাড়তে ব্যথাও বাড়ল। পাড়ায় ডাক্তারকে ডেকে আনলাম, তাঁর ওষুধে কাজ হল না। তাই এখানে নিয়ে এলাম।'

নার্স বললেন, 'নাম ঠিকানা বলুন।'

হরিপদবাবু জানালেন।

একমাত্র ভোট দিতে যাওয়ার সময় ছাড়া স্ত্রীর নামের প্রয়োজন হয় না। যে ডাক্তার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন্ন তিনি ততক্ষণে চলে গিয়েছেন একটা কম্প্যুটারের সামনে, 'এদিকে আসুন। আপনার নাম।'

'আজ্ঞে হরিপদ দত্ত।'

ডাক্তার বোতাম টিপলেন কয়েকটা, 'এদিকে তাকান। পেট সংক্রান্ত সমস্ত পেশেন্ট এই ওয়ার্ডে থাকেন। দেখতে পাচ্ছেন?'

কম্প্যুটারে ছবি ভেসে উঠল। সুদৃশ্য বিছানায় পেশেন্টরা শুয়ে আছেন। নার্স তাঁদের দেখাশোনা করছেন।

ডাক্তার বললেন, 'আপাতত এই তিনটি বেড খালি আছে।' মাউস টিপে ছবির তিনটে খালি বেড চিহ্নিত করলেন তিনি, 'কোনটা নেবেন?'

'আজ্ঞে চার্জ কি রকম?'

'জেনারেল বেডে কোন চার্জ লাগে না। এগুলো জেনারেল বেড।'

'ওই বাঁদিকের শেষ বেডটা।'

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার টাইপ করতেই পর্দায় ফুটে উঠল, 'বেড নাম্বার সেভেনটিন'।

তৎক্ষণাৎ দুজন লোক একটা চাকা লাগানো ট্রলিতে হরিপদবাবুর স্ত্রীকে শুইয়ে দৌড়াল।

ডাক্তার বললেন, 'এই কাগজটা নিয়ে ওদের সঙ্গে যান।'

বিশাল লিফটে ট্রলি তুলে তিনতলায় উঠে লোকদুটো সেই ঘরে ঢুকতেই হরিপদবাবু রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাজনা শুনতে পেলেন। একজন নার্স এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিসেস দত্ত?'

হরিপদবাবু কাগজটা এগিয়ে দিলেন। নার্স বললেন, 'বেড নাম্বার সতের।' ট্রলি চলল সেদিকে। এত পরিষ্কার ঘর হরিপদবাবু কখনও দ্যাখেননি। স্ত্রীকে বিছানায় শোওয়ানোমাত্র একজন ডাক্তার ওঁর পাশে চলে গেলেন, 'বেডে শোওয়ালেন কেন? একটা আলট্রা সোনোগ্রাফি করাতে হবে। এখনই কাজটা সেরে ফেলতে চাই। নিয়ে চলুন।'

হরিপদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন বিল্ডিং-এ নিয়ে যেতে হবে?'

'কোথাও নিয়ে যেতে হবে না। পেট সংক্রান্ত পেশেন্টরা এখানে থাকেন বলে পাশের ঘরেই ওই ব্যবস্থা করা হয়েছে।' নার্স হেসে বললেন।

মিনিট কুড়ি বাদে নার্স হরিপদবাবুকে ডেকে নিয়ে গেলেন একটা ঘরে যেখানে দুজন ডাক্তার তাঁর স্ত্রীর রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখছেন।

একজন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার স্ত্রী আগে কখনও বলেননি যে পেটে ব্যথা হচ্ছে?'

'আজ্ঞে না।'

'কোন অস্বস্তির কথাও বলেননি?'

'না।'

দ্বিতীয় ডাক্তার বললেন, 'বাঙালি মেয়েরা ভাবেন, বললে স্বামীকে সমস্যায় ফেলবেন। এটা ঠিক নয়। শুনুন, ওঁর গলব্লাডারে পাথর হয়েছে। একটা দুটো বড় পাথর হলে আমরা মাইক্রোসার্জারি করতাম। কিন্তু অনেকগুলো ছোট রয়েছে বলে পেট ওপেন করা দরকার। আমরা দেরি করতে চাই না। কিন্তু তার আগে কয়েকটা রুটিন পরীক্ষা করে নিতে হবে। সেই রিপোর্টও আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে পেয়ে যাব। অপারেশনের ব্যাপারে আপনার সম্মতি আছে তো?'

'যাতে ভাল হয় তাই করুন।' হরিপদবাবু বললেন।

'ঠিক আছে। আপনি ওপাশের ঘরে গিয়ে আপনার স্ত্রীর নাম বলুন। ওরা একটা ফর্ম দেবে, সেটা ভর্তি করে সই করে দেবেন।'

'কিন্তু আমি তো তৈরি হয়ে আসিনি।' হরিপদবাবু মিনমিনে গলায় বললেন।

'কিসের তৈরি?'

'আজ্ঞে, অপারেশনের জন্যে তো টাকা জমা দিতে হবে!'

'আপনি কি করেন?'

'ব্যবসা। ছোটখাটো।'

'প্যান কার্ড আছে?'

'আছে। প্রতি বছর ট্যাক্স জমা দিই।'

'তাহলে আবার অপারেশনের খরচ দেবেন কেন? যাঁরা ট্যাক্স দেন, প্যান কার্ড আছে, তাঁদের কোন চার্জ করা হয় না। এসব কথা আগে শোনেননি?'

'না তো!'

'খুব অন্যায় কথা। কাগজে সরকারি বিজ্ঞাপন দ্যাখেন না?'

'সরকারি বিজ্ঞাপনে সাজানো কথা থাকে বলে পড়ি না।'

'যান, পাশের ঘরে যান।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফর্ম ভর্তি করে দিলেন হরিপদবাবু। ভাগ্যিস প্যান কার্ডের নম্বর মনে ছিল। এখন হাতে কোন কাজ নেই। হরিপদবাবুর খেয়াল হল। দ্রুত নেমে এসে ট্যাক্সিওয়ালার সামনে দাঁড়ালেন। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'ভর্তি হয়ে গেছেন।'

'হ্যাঁ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' যা ভাড়া উঠেছিল তার থেকে তিরিশ টাকা বেশি দিলেন হরিপদবাবু।

টাকাটা গুণে লোকটা তিরিশ টাকা ফেরত দিয়ে বলল, 'এটা কেন দিচ্ছেন! ন্যায্য ভাড়া তো পেয়ে গেছি।' ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। হরিপদবাবু হতভম্ব!

অপারেশনের আগে সতের নম্বর বেডের কাছে এসে হরিপদবাবু দেখলেন একজন নতুন নার্স তাঁর স্ত্রীর কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার কোন ভয় নেই। ব্লাডপ্রেশার সামান্য বেশি। তাতো হবেই। যা ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু সুগার নর্মাল, এইটে সবচেয়ে ভাল খবর। আধঘণ্টার মধ্যে অপারেশন হয়ে যাবে। আজ রাত্রে বিশ্রাম। কাল সকালে আপনাকে হাঁটাবো। চাইলে পরশু বাড়ি যেতে পারেন।'

'সত্যি?' হরিপদবাবুর স্ত্রীর মুখে আলো ফুটল।

'হ্যাঁ। তবে বলি কি, বাড়ি গেলে তো কাজ না করে থাকতে পারবেন না, দুদিন আপনি বিশ্রাম নিয়ে যান, ভাল হবে।' বলতে বলতে নার্স হরিপদবাবুকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'নিন, আপনারা কথা বলুন, আর বেশী সময় নেই।'

নার্স চলে গেলে হরিপদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভয় লাগছে না তো?'

'না। কিন্তু তুমি কি খাবে? রান্না তো করতে পারিনি।'

'আঃ। আমার কথা ছাড়ো। যাহোক ম্যানেজ করে নেব।'

সন্ধের আগে ডাক্তার হরিপদবাবুকে ডেকে একটা ট্রে দেখালেন, 'এই দেখুন এত পাথর আপনার স্ত্রীর পেটে ছিল। ওই যে বলে না, পেটে পেটে এত!' হাসলেন ডাক্তার।

'কেমন আছে ও?'

'ভাল। এখন ঘুমের ওষুধে আছে। কাল এসে কথা বলবেন।'

'আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

'সে কি? কেন? আমরা আমাদের কাজ করেছি। এই কাজের জন্যে মাইনে পাই। সেই মাইনে আসে আপনাদের দেওয়া ট্যাক্স থেকে। তাই না?'

ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হরিপদবাবু বললেন, 'ওঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসগুলো নিয়ে এসে কার কাছে দেব?'

'কি সেগুলো? চিরুনি, পাউডার তোয়ালে? বা জামাকাপড়? এখানে যতদিন থাকবেন হাসপাতালের পোশাকে থাকবেন, যাওয়ার সময় নিজের শাড়ি জামা পরে যাবেন। বাকিগুলো এখান থেকেই দেওয়া হবে। যান, বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিন।' ডাক্তার বলে গেলেন।

নিচে নেমে এলেন হরিপদবাবু। কোথাও কেউ অলস হয়ে বসে নেই। তিনি চারপাশে তাকালেন। আজ যা ঘটল তা কি স্বপ্ন? বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে। জানাশোনা নেই। কাউকে ধরাধরি করে আসেননি, তা সত্ত্বেও সব বিনা পয়সায় ঠিকঠাক হয়ে গেল? এইসময় লোকটাকে দেখতে পেলেন তিনি। রেলিং-এ হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। শীর্ণ চেহারা। মুখটা বেশ করুণ। কাছে যেতে লোকটা তাকাল, 'হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল হয়ে যাবে।'

'আপনি কি অসুস্থ?'

'অ্যাঁ? সুস্থ তো নেই। তিনদিন পেটে কিছু পড়েনি, সুস্থ থাকব কি করে?'

'সে কি? খাননি কেন?'

'রোজগার নেই। তাই খাবার পয়সা নেই।'

'চাকরি চলে গেছে? কারখানায় লকআউট?'

'না। আগে হাসপাতালে চাকরি করতাম। পেশেন্ট পার্টিকে টুপি পরিয়ে মোটা রোজগার করতাম। এখন তো সেসব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমিও বেকার হয়ে গেছি। তবু এখানে আসি। অনেকদিনের অভ্যাস তো, না এসে পারি না।' লোকটি কাশল।

কিরকম মায়া জাগল মনে। এরাই তো রাজত্ব করত এখানে। আজ কি অবস্থা, লোকটার হাতে দশটাকা গুঁজে দিয়ে হরিপদবাবু বললেন, 'কিছু খেয়ে নিন ভাই।'

দু'জনে বড় সুখে আছে

বড় সুখে ছিল দু'জনে। সকালে কাজের লোক এসে বেল বাজালে অবিনাশ চোখ খুলতেই আরতির মুখ দেখতে পেত। ভাঁজ জমছে আরতির কপালে, নাকটা একবার কুঁচকে গেল, চোখ বন্ধ রেখেই প্রশ্ন করত, 'আটটা?'

অবিনাশ হ্যাঁ বলার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার বেল বেজে উঠত, চোখ খুলে উঠে বসে আরতি বলত, 'কেন যে এত তাড়াতাড়ি আটটা বেজে যায়?'

তাকে খাট থেকে নামতে দেখে অবিনাশ বলত, 'তুমি বাথরুমে যাও আমি...'

আরতি জানত এই সংলাপ শুনবে, তাই দিক পরিবর্তন না করে সোজা টয়লেটে ঢুকে যেত। ঘুমঘুম ভঙ্গিতে অবিনাশ দরজা খুলতেই কানে আসত, 'বাব্বা!'

ঝড়ের মতো যে ভেতরে ঢুকে যেত, কাজ করছে সে বছর দশেক। টুকটাক মন্তব্য করার অধিকার আদায় করে নিয়েছে সে।

মিনিট পনেরো বাদে মুখোমুখি চা খাওয়া। খাবারের কাগজ তখনও পাট-বন্দি। কুড়ি, কুড়ি বছর পার হয়ে গেলেও আরতি জিজ্ঞাসা করত, 'অ্যাই কী দেখছ, ওভাবে তাকালে লজ্জা লাগে না?'

'লজ্জা যখন লাগে, তখন তোমাকে আরও মিষ্টি দেখায়।'

'ধ্যাৎ, দিনকে দিন যা মুটোচ্ছি।'

'ভাগ্যিস।'

'তার মানে?'

'বাঙালি মেয়েদের শরীর এখন পাঁকাটির মতো হয়ে যাচ্ছে। তাদের দিকে তাকালে চোখে কাঁটা ফোটে। আর তোমাকে দেখলে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়।'

'কী রকম।'

'আমার মামার বাড়ির পেছনে একটা বিশাল বিল ছিল, জল, জল, আদিগন্ত শুধু জল, গহিন গাঙ। তোমাকে দেখলে সেই বিলের কথা মনে পড়ে।' হাসত অবিনাশ। 'তুই সেই গহিন গাঙ, আমি ডুবে মরি।'

'ছিঃ মরার কথা বোলো না।'

মাথা নাড়ত অবিনাশ, 'এ মরণ তো মরণ নয়, এর অন্য নাম জীবন।'

দু'জনে বড় সুখে ছিল। ঠিক পৌনে এগারোটায় খাওয়া শেষ করে দোকানে যাওয়ার সময় অবিনাশ আরতিকে চুমু খেয়ে যেত। কুড়ি বছরে ক'টা চুমু খাওয়াখাওয়ি হয়েছে? অবিনাশ অঙ্কে কাঁচা। আরতি হিসেব করে বলেছিল, 'বারো হাজার দুশো এগারোবার।'

অবিনাশ অবাক, 'অ্যাতো?'

'হিসেব করে দেখো।' আরতি হাসত।

সারাদিন দোকানে কেটে যেত। স্যানিটারি ইকুইপমেন্টের দোকান। কিন্তু ওই সময়ে অন্তত চারবার ফোন আসত। অবশ্যই সেই ফোনগুলোতে প্রয়োজন বা সমস্যার কথা বলা হত না। অথচ অন্তত চারবার আরতি ফোন না করলে মনে হত, কী যেন পাইনি। মাঝনদীর ঢেউগুলো যেমন অকারণেই ছলাৎ ছলাৎ শব্দ বাজায়।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে টিভি দেখা, নয়তো নতুন নতুন চিনে রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করে সেখানে যাওয়া। চিনে খাবার আরতির খুব প্রিয়। তারপর অনেক আদরের ঘুম।

দু'জনে বড় সুখে ছিল। কিন্তু গত আঠারো বছরে ছত্রিশবার ডাক্তার পরীক্ষা করেছে ওদের। একাধিক ডাক্তার। প্রত্যেকেই এক কথা বলেছেন, অনুসন্ধানে কোনও ত্রুটি পাওয়া যায়নি। দু'জনেই ত্রুটিমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনও দুর্বোধ্য কারণে আরতির শরীরে ভ্রূণ জন্মাচ্ছে না। প্রত্যেক ডাক্তার বলেছেন, হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। যেকোনও দিন আগমনী বার্তা পেয়ে যাবে ওরা। বাড়ি ফিরে এসে অবিনাশ বলেছিল মস্করা করে, 'চেষ্টার কোনও বিকল্প নেই। ফলের আশা না করে কাজ করে যাও। কোন মহাপুরুষ যেন এই কথাগুলো বলেছিল?'

আরতি গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'ওঁদের নিয়ে ইয়ার্কি করতে নেই।'

কিন্তু সংসারে তৃতীয় জন আসেনি বলে ওরা খুব একটা দুঃখে বাস করছে না। বরং একটি শিশু মাতৃগর্ভে আসার পর থেকে যেসব সমস্যা তৈরি হয়, তা বন্ধুদের কাছ থেকে শোনার পর মনে হচ্ছিল, এই বেশ আছি, ভালো আছি।

কিন্তু কয়েকদিন পরে অবিনাশের বাঁ হাঁটুতে একটা ব্যথা জানান দিল। সিঁড়ি ভাঙতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। আরতি জোর করে ডাক্তারের সামনে পেশ করল স্বামীকে।

ডাক্তার নানান পরীক্ষার পর এক্স-রে করালেন। সেই রিপোর্ট দেখে বললেন,

'আপনাকে পেইন কিলার দিতে পারি। কিছুটা সময়ের জন্য ব্যথা কমবে, পেইন কিলার বেশি খেলে পেটে আলসার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।'

'তাহলে?' ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করল অবিনাশ।

'আপনার শরীরের ওজন হাঁটু বহন করতে পারছে না।' ডাক্তার বললেন।

অবিনাশ চমকে উঠল, 'সেকী! ডান হাঁটু পারছে আর বাঁ হাঁটু পারছে না?'

'এখনও পারছে, ক'দিন বাদে আর পারবে না।'

'সর্বনাশ! একটা কিছু উপায় বলুন।'

'দুটো পথ আছে। আপাতত ওষুধ খাওয়াতে পারি, কিন্তু কাজ হবে বলে মনে হয় না। হাঁটু পাল্টে ফেলতেই হবে।'

'হাঁটু পাল্টে ফেলবেন?' অবিনাশ হতভম্ব।

'অনেকেই ফেলছেন। পাল্টালে দুটোই পাল্টান।'

'সেকী! একটায় ব্যথা হচ্ছে—'

'দাঁড়ান, গাড়ির দুটো চাকা খারাপ হলে সেই দুটোর জায়গায় নতুন চাকা লাগালে কতকটা কাজ হয়। চারটি চাকা একসঙ্গে পাল্টালে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।' ডাক্তার মোলায়েম গলায় বললেন, 'আপনার বাঁ হাঁটুর ভেতরটা শুকিয়ে যাওয়ায় হাড়ে হাড়ে লেগে ব্যথা হচ্ছে। ডান হাঁটুতে হল বলে। অপারেশন করে এগুলো ঠিকঠাক করে দেওয়া যায়। নব্বই কেজি ওজন ওদের পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না।'

'বললেন দুটো পথ আছে। সেকেন্ডটা কি?'

'ওজন কমাতে হবে। যত ওজন কমাবেন, ব্যথা তত কমবে। মেডিসিন উইদাউট প্রেসক্রিপশন হল ওয়াকিং। হাঁটুন। সকাল বিকেল মাইলের পর মাইল হাঁটুন। জিমে ভর্তি হন, যোগা করুন। কী খাবেন তার একটা লিস্ট তৈরি করে দিচ্ছি। বাধ্য ছাত্রের মতো এটা মেনে চলে তিন মাস পরে আমার কাছে আসুন।'

'ওজন কত হলে ব্যথা থাকবে না?'

'আপনার উচ্চতা কত?'

'পাঁচ দশ।'

'সত্তর কেজি। অন্তত কুড়ি কেজি কমাতে হবে।'

'কিছু মনে করবেন না, ও, মানে আমার স্ত্রী, বেশ স্বাস্থ্যবতী, ওর পায়ে তো ব্যথা হচ্ছে না, কোনও অসুবিধে নেই। ও কি আমার সঙ্গে হাঁটতে পারে?'

'আলবত পারে। ম্যাডাম, আপনি আপনার স্বামীর রুটিন ফলো করুন। দেখবেন, একেবারে ঝরঝরে লাগছে। বয়স কমে যাবে অনেক।' ডাক্তার বলেছিলেন।

আরতির উৎসাহ অবিনাশকে উৎসাহিত করল। ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়েই হাঁটার জুতো কিনে ফেলল। অবিনাশের জন্যে বারমুডা আর নিজের জন্যে থ্রি

কোয়ার্টার প্যান্ট পছন্দ করে নিয়ে বলল, 'আজ তাড়াতাড়ি ঘুমোব আমরা। কাল সূর্য ওঠার আগেই উঠতে হবে।'

অথচ আজও ঘুম ভাঙল কাজের লোকের বেল বাজানোর আওয়াজে। ঘুম ঘুম গলায় আরতি বলল, 'ওমা! আটটা বেজে গেল।'

'সর্বনাশ! সূর্য তো অনেক আগে উঠে গেছে।' অবিনাশ বিছানা ছেড়ে বাইরের ঘরে গিয়ে দরজা খুলল। কাজের লোক ঢুকতেই সে বলল, 'শোনো, তুমি একবার বলেছিলে আরও ভোরে এসে কাজ করে গেলে তোমার সুবিধে হয়। তাই না?'

'বলেছিলাম। কিন্তু দু'বাড়ির কাজ এসে গেছে এই সময়ে। আপনাদেরটা আমার থার্ড বাড়ি।' কাজের লোক ভেতরে চলে গেল।

চা খেতে খেতে অবিনাশ আরতিকে বলল, 'ভুলটা আমারই হয়েছে। আমার উচিত ছিল ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখা। টেলিফোনেও বলে রাখা উচিত ছিল।'

আরতি বলল, 'হ্যাঁগো, ডাক্তারকে একবার ফোন করে দেখো না!'

'কেন?'

'শুধু ভোরেই হাঁটতে হবে? অন্য সময় হাঁটলে কি উপকার হবে না?'

অবিনাশের মনে হল আরতির কথায় যুক্তি আছে। হাঁটার সময় শরীরের ব্যায়াম হবে, ক্যালরি কমবে, তার সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক কী? সে ডাক্তারকে ফোন করে শুনল, 'আপনি যেকোনও সময় হাঁটতে পারেন। বিদেশে সারাদিন সময় পায় না বলে কিছু মানুষ মধ্যরাতে মাইল তিনেক হেঁটে নেয়। তবে সারারাত ঘুমোনোর পর সকালে হাঁটলে মনটাও ভালো থাকবে।'

অতএব অ্যালার্ম বাজিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে পোশাক পরে দরজায় তালা দিয়ে ওরা বাড়ি থেকে যখন বের হল তখনও আলতো আঁধার পৃথিবীতে থেকে গেছে। বাড়ি থেকে মাত্র দশ মিনিট দূরে দেশবন্ধু পার্ক। ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগিয়ে অবিনাশ বলল, 'বেশ লাগছে। কত এইরকম ভোরকে আমরা এর আগে দেখিনি, বলো।'

হাঁটতে হাঁটতে আরতি বলল, 'সাত হাজার দুশো।'

অবাক হয়ে যায় অবিনাশ, 'উঃ! তোমার কত্ত এলেম।'

'এই হাঁটার সময় কথা বলতে নেই।' আরতি এগিয়ে যাচ্ছিল। যাবেই তো। ওর যে হাঁটুতে কোনও ব্যথা নেই। পার্কে ঢুকে অবিনাশ দেখল কয়েকজন মানুষ পাগলের মতো হেঁটে চলেছে। মেয়েদের সংখ্যা বোধহয় বেশি। একটু পরেই সে দেখল ওই ভিড়ে আরতি মিশে গেল।

এইটুকু হাঁটতেই হাঁটু জানান দিতে শুরু করেছিল। মিছিমিছি ব্যথা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। অবিনাশ ধীরে ধীরে হেঁটে মাঠের মাঝখানে চলে এল। বিশাল মাঠের চারপাশ দিয়ে হাঁটার পথ একটা রিং তৈরি করেছে। লোকে সেই পথ ধরেই

হাঁটছে। মাঠের মাঝখানে কিছু ছেলে ক্রিকেট খেলছে। খানিকটা পায়চারির পর একটা খালি বেঞ্চি দেখে অবিনাশ এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ে বলল, 'আহ!'

আরতি কোথায়? ওই চলন্ত ভিড়ে ওকে দেখা যাচ্ছে না। এখন না দেখতে পাওয়াই ভালো। তার বসে থাকাটাই ও সমর্থন করবে না।

'এই এদিকে আয়। এই বেঞ্চিটা খালি আছে।' মহিলা কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারিত হল। অবিনাশ মুখ ফিরিয়ে দেখল অতিরিক্ত স্বাস্থ্য নিয়ে এক মহিলা, যার পরনে শার্ট এবং প্যান্ট, তার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর পিছনে একটি অল্পবয়সি মেয়ে যার কাঁধে তিনটে ফ্লাস্ক ঝুলছে। প্রতি পদক্ষেপে মহিলার শরীর বিদ্রোহ করছে প্যান্টের বিরুদ্ধে।

সশব্দে বেঞ্চির অন্য প্রান্তে তিনি বসামাত্র অবিনাশ উঠে দাঁড়াল।

'একী!' মহিলা চেঁচালেন, 'আমাকে অপমান করছেন কেন?'

'অপমান? আমি? কেন করব?' ঘাবড়ে গেল অবিনাশ।

'আলবত করেছেন। আমি এই বেঞ্চিতে বসামাত্র আপনি উঠে দাঁড়াননি?'

'না না, আমি ভাবলাম আপনারা দু'জন আছেন।'

'থাক! ও বাচ্চা মেয়ে। এই বয়সেই তো দাঁড়িয়ে থাকবে। বসুন।'

অবিনাশ সন্তর্পণে বসল।

'নতুন মনে হচ্ছে। আগে তো এখানে দেখিনি!'

ভিড়ের মধ্যে আরতিকে খুঁজে না পেয়ে অবিনাশ বলল, 'আজই প্রথম এখানে।'

'চা না কফি?'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল অবিনাশ।

'দুটোই আছে। তবে আমি সাজেস্ট করব চা। তিনটে ফ্লাস্ক। একটায় রেগুলার চা, দ্বিতীয়টা চিনি দুধ ছাড়া চা, তৃতীয়টায় কফি। রিমকি, লিকার ঢাল।'

কাজের লোকের হাত থেকে কাগজের গ্লাসে চা নিয়ে অবিনাশকে দিয়ে মহিলা বললেন, 'আমি সন্ধ্যাতারা। আপনি?'

'অবিনাশ।'

'ম্যারেড?'

হাসল অবিনাশ, 'হ্যাঁ।'

'গুড। বয়স্ক অবিবাহিতদের আমি টলারেট করতে পারি না। ম্যারেডরা অনেক সফট হন, দাবিটাবি থাকে না। চা খান।'

'আপনি হাঁটবেন না?' অবিনাশ কথা বলার জন্যে কথা বলল।

'না। ওই জগা পাগলাদের দলে আমি নেই।'

'জগা পাগলা?'

'ওই যারা জগিং করার ভান করে হাঁটেন তাঁদের কথা বলছি। আপনার আইকিউ খুব কম? স্ত্রীর সব কথা আপনি বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ।'

হাসলেন সন্ধ্যাতারা, 'তিনি কি মুখরা?'

'একদম উল্টো, ওর ব্যবহার, কথা বলার ধরন খুব মিষ্টি।'

'আশ্চর্য! আপনি তাই বুঝেছেন?'

'বুঝব না?'

'এই যে বুঝব না বললেন, এটাই আপনার সমস্যা। রিমকি ওঁর চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে, কাপটা নে।'

কাজের মেয়েটি কাপ ফেরত নিতেই অবিনাশ বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'কেন?'

'এই যে চা খাওয়ালেন!'

'এত অল্পেই আপনি সন্তুষ্ট!' হেসে বললেন সন্ধ্যাতারা। হঠাৎ মনে প্রশ্নটা এল, না জিজ্ঞাসা করে পারল না অবিনাশ। 'আপনি ম্যারেড?'

এবার হেসে গড়িয়ে পড়লেন সন্ধ্যাতারা, 'ইস! আপনিও?'

'মানে?'

'যেসব বিবাহিত পুরুষকে আমি এই সময় চা খাইয়েছি তাদের সবাই একসময় জিজ্ঞাসা করে, আপনি ম্যারেড? আমি ম্যারেড হলে ওদের সুবিধে হয়। আসুন আপনি।' সন্ধ্যাতারা অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

হাঁটতে হাঁটতে অবিনাশের মন খারাপ হয়ে গেল। এইরকম মহিলা সে জীবনে দেখেনি। সকালে হাঁটতে এখানে এলে দেখা হবেই। একা দেখা হলে ঠিক আছে। আরতি সঙ্গে থাকলে ইনি কী বলবেন তা অনুমান করা যাচ্ছে না। আরতি ভেবে নেবে তার অনেকদিনের চেনা?

তখন সূর্য উঠছিল। হাঁটিয়েদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এইসময় দূর থেকে দেখেই বুঝতে পারল আরতি হাঁটছে। বেশ জোরে পা ফেলছে। কিন্তু ওর পাশের লোকটা কে? একই তালে হাঁটছে লোকটা। হাঁটতে হাঁটতে কথাও বলছে। তাই শুনে আরতি মিষ্টি হাসি হাসল। অন্য সময় হাসলে যত মিষ্টি দেখায় এখন তার চেয়ে অনেক বেশি লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ওরা চোখের আড়ালে চলে গেল। পাশে সেই নীল ট্র্যাকস্যুট পরা লোকটা।

আরতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য সে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। একদম অপরিচিত লোকের সঙ্গে ওইরকম হাসাহাসির কী দরকার? ভাবতেই পেটের ভেতরে একটা মোচড় টের পেল অবিনাশ। ওই গরম লিকার চা জানান দিচ্ছে।

বাড়িতে সে নর্মাল চা খায়। কখনোই লিকার নয়। কিন্তু চা খাওয়ার কথা বললে আরতি কীভাবে নেবে?

আবার আরতিকে দেখতে পেল সে। এবার ওর পাশে সবুজ ট্র্যাকস্যুট। নীলটা কোথায় গেল! ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল আরতি। পাশের সবুজ ট্র্যাকস্যুটকে বলল, 'আমার হাজবেন্ড। ইনি এখানকার মর্নিং ওয়াকার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি।'

'নমস্কার। নমস্কার।'

সবুজ ট্র্যাকস্যুট যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'কাল থেকে রোজ আসবেন, কামাই করবেন না। আপনাকে আমাদের চাই!'

'তোমাকে চাই মানে?' রেগে গেল অবিনাশ।

'আসোসিয়েশনের সভ্য হতে বলেছেন। চলো বাড়ি যাই।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'না গো, দেরি হয়ে যাবে তোমার ব্রেকফাস্ট করতে। তারপর বেরুবে। এই জানো, তোমাকে তখন দেখলাম, খুব স্মার্ট লাগছিল।'

'কখন দেখলে?'

'ওই যে একটা মুটকির পাশে বসে চা খাচ্ছিলে। আমি কিন্তু তোমাকে ডিস্টার্ব করিনি।' আরতি স্বামীর হাত ধরল।

ওরা দু'জনে বেশ সুখেই থাকল।

কেমন আছিস

তিরিশ তিরিশটা বছর আমি চা-বাগানের পুজো দেখিনি। কখন কেমন করে সেই দেখার ইচ্ছেটা উধাও হয়ে গিয়েছিল জানি না। বুবু আর জয়দীপ খোঁচাল।

আমি চা-বাগানের যে কোয়ার্টার্সে জন্মেছিলাম, আমার বাবার অবসর নেওয়ার পর যে বাড়িটার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই, সেই বাড়িতেই চাকরিসূত্রে থাকে জয়দীপ সস্ত্রীক। বেশ কয়েক বছর আগে ওরা আমাকে ফোন করে বলেছিল, 'আমরা আপনার বাড়িতে থাকি।'

হেসে বলেছিলাম, 'না। ওটা এখন তোমাদের বাড়ি।'

'একদমই নয়। আপনার সময়কার সব গাছ এখনও এ বাড়িতে দিব্যি আছে। উঠোনটাও। লোকে এসে জিজ্ঞাসা করে এই বাড়িটায় উত্তরাধিকার-এর অনি থাকত কি না।'

মাঝে-মাঝেই কথা হত ফোনে। ওরা বলত, আসুন না। আমার যাওয়া হয়নি।

পুজোর সময় চারদিন ধরে আমাদের বন্ধুদের অসামাজিক জীবন চুটিয়ে চলে। সকাল এগারোটা থেকে দুটো বিয়ার সহযোগে তাস, সন্ধ্যায় হুইস্কি দিয়ে গান। আমার এক খ্রিস্টান বন্ধু জিজ্ঞাসা করেই ফেললেন, 'আচ্ছা, হিন্দুদের ধর্মাচরণ করতে হয় না কেন? যখন মন্দিরে বা প্যান্ডেলে যাওয়ার কথা তখন তোমরা বেড়াতে যাও অথবা ঘরে বসে ওইসব করো?' মনে মনে বলেছিলাম, যদ্দিন ঠাকুর্দা বাবা পিসিমা বেঁচেছিলেন তদ্দিন ওইসব করিনি হে। সাহসেই কুলোয়নি।

তা এই সময় আবার ফোন এল, 'সমরেশদা, আমি বলছি।'

'আমিটা কে?'

'ভুলে গেলেন? এখানে শিউলি শিউলির মতো ঝরে।' হাসল বুবু।

'ও তুমি। কী খবর বলো? পুজো হচ্ছে তো?'

'অবশ্যই। এখন আর মাঠের মাঝখানে স্বর্ণচাঁপা গাছটার নীচে প্যান্ডেল বাঁধা হয় না। ঠাকুরবাড়ি তৈরি হয়েছে। আপনার বাড়ি থেকে কয়েক পা দূরে। রং দেওয়া হয়ে গিয়েছে। চুল আর চোখ বাকি। আর হ্যাঁ, আপনার সেই শিউলি গাছটা, এখন থেকেই প্রতি ভোরে ঘাসের ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে। তাই তো বললাম, এখানে শিউলি শিউলির মতো ঝরে। দেখতে ইচ্ছে হয় না?'

বললাম, 'দেখি।'

দু'দিন বাদে, কাল রাত্রে, মা এসে বললেন, 'যা না। দেখে আয়।'

পাশে দাঁড়ানো বড়পিসিমা বললেন, 'রাতের বেলায় ওখানে কি এখনও বাতাবিফুল ফোটে?' ঘুম ভেঙে গেল। কথাগুলো আঁচড়াতে লাগল আমাকে। ওঁরা চলে গেছেন কতকাল। তবু ঘুমের মধ্যে আমার কাছে এলেন, যেতে বললেন।

ট্রেনে কোনও জায়গা নেই। প্লেনের টিকিট শেষ মুহূর্তে হাতে পেয়ে বাগডোগরায় নামলাম দুপুর একটায়। যাদের গাড়ি নেই তারা ওই এয়ারপোর্টে নেমে ড্রাইভারদের খপ্পরে পড়ে। আমিও বাদ গেলাম না। অনেক দরাদরির পর ট্যাক্সিটা রাজি হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি করেন?'

'খাই দাই আর ঘুমাই।'

'এই কথাটা পাঁচ-পাবলিক বলতে পারবে না স্যার।'

শিলিগুড়ি শহরকে পাশ কাটিয়ে ট্যাক্সি ছুটছে। মাঝে মাঝে ঢাকের আওয়াজ পাচ্ছি। জলপাইগুড়ি শহরে না-ঢুকে তিস্তা ব্রিজে উঠে এলাম, দেখলাম, বালির চরে বাতাস সাদা ঢেউ তুলছে। আচ্ছা, কতকাল পরে কাশফুল দেখলাম? দোমহনী-র একটা একচালা মণ্ডপে কয়েকটা হাফপ্যান্ট পরা বালকের সামনে মা দুর্গা দাঁড়িয়ে। আজ পঞ্চমী, এখনও ঢাকি জোগাড় করতে পারেনি এরা।

ধূপগুড়ি পেরিয়ে গেল। দু'পাশে জঙ্গল। ডুডুয়া নদীর ওপর দিয়ে চলে এলাম আংরাভাসা নদীর ব্রিজের কাছে। ড্রাইভারকে বললাম, 'একটু দাঁড়াবেন ভাই।'

ডানদিকে সেই বটগাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তখনই আমরা ওকে বুড়োবট বলতাম। আমরা তিন-চারজন সাইকেলে চেপে ওই গাছের পেছনে এসে বসতাম সিগারেট খাওয়ার জন্যে। একটা কাঁচি সিগারেট ধরিয়ে প্রত্যেকে এক-একটা করে টান। এই গাছটা আমাদের আড়াল দিত। গাছটাকে ছুঁতে ইচ্ছে করছিল খুব। ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এই নদীর নাম জানেন?'

ঘাড় নাড়লাম। আংরাভাসা—যে আমার কাছে অলকানন্দার চেয়েও প্রিয়। তা বলে কী লাভ!

চা-বাগান শুরু হল। দূর থেকে অদক্ষ হাতে বাজানো ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে হাইওয়ে থেকে নেমে এলাম মাঠের মাঝখানে। ওপাশে পরপর গাছগাছালি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোয়ার্টার্সগুলো। মাঠের মাঝখানে স্বর্ণচাঁপা গাছ। এখানেই প্যান্ডেল বাঁধা হত। এই মাঠ আমার শৈশব এবং বালকবেলা দেখেছে। আমাদের কোয়ার্টার্সের কোনটায় কে থাকতেন আমি এখনও বলতে পারি। খানিকটা দূরে নতুন ঠাকুরবাড়ি। এখনও সেখানে ভিড় জমেনি। তার খানিকটা পেছনে আমাদের বাড়ির বারান্দা। যে বারান্দায় বড় পিসিমা আর মা মোড়া পেতে বসে থাকতেন বিকেলের ছায়ার সামনে।

হাতে ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি চারপাশ। এত নীল কি করে গড়াল আকাশে? হঠাৎ দেখলাম ঠাকুরবাড়ি ছেড়ে একজন ছুটে আসছে আমার দিকে। ফ্রকের নীচে সাদা পায়ের শেষ, কালো জুতো। বছর পাঁচেকের সেই মেয়ে, এটুকু দৌড়তেই যার নাকে মুক্তো টলটল, জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে গো? কার কাছে এসেছ?'

'আমি? আমি এখানেই জন্মেছিলাম। তোমার মতো ছিলাম একদিন। আজ তোমার কাছে এসেছি।'

'আমি? আমি এখানেই জন্মেছিলাম। তোমার মতো ছিলাম একদিন। আজ তোমার কাছে এসেছি।'

'সত্যি?' বলে আমার আঙুল ধরল সে, 'চলো, তোমাকে মা দুগ্গা দেখাই।'

সে আমায় টেনে নিয়ে গেল ঠাকুরবাড়িতে। ততক্ষণে আরও কয়েকজন নতুন জামাকাপড় পরা বালক-বালিকা সেখানে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। আঙুল ছেড়ে দিয়ে সে ধমকে উঠল, 'এ কী! তুমি প্রণাম করছ না কেন? প্রণাম করো।'

হেসে ফেললাম। কত বছর পরে জানি না, হাতজোড় করে দাঁড়ালাম দেবীর সামনে। দেবীর এখন মাথায় চুল পরানো হয়নি, চোখ আঁকা হয়নি।

'কিছু মনে করবেন না, আপনি কে?'

পেছন থেকে মহিলাকণ্ঠ ভেসে আসতেই ফিরে তাকালাম। একজন বিবাহিতা মহিলা, আটপৌরে পোশাকে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।

হেসে বললাম, 'পুজো দেখতে এসেছি।'

মেয়েটি বলল, 'আমি ওকে এখানে নিয়ে এসেছি মা।'

'কিন্তু তুমি আমাকে তোমার নাম বলোনি এখনও', বললাম।

'আমি অঞ্জনা।'

'বাঃ! কী সুন্দর নাম।' ভদ্রমহিলাকে বললাম, 'আপনার মেয়েটি খুব ভাল। ও হ্যাঁ, এখানে আমি বোধহয় একটাই পরিচয় দিতে পারি। এখন যেটা বুবু আর জয়দীপের বাড়ি সেটা একসময় আমাদের ছিল।' আমি হেসে বলতেই ভদ্রমহিলার চোখ বড় হয়ে গেল। তিনি দৌড়ে গেলেন যে-বাড়ির দিকে সেখানেই আমি জন্মেছিলাম।

দিকে দিকে রটে গেল, আমি এসেছি। সন্ধের মুখে যখন ঠাকুরবাড়ির সামনে আমাকে নিয়ে বেশ ভিড় জমেছে, তখন হাতজোড় করে বললাম, 'দেখুন, আপনারা যেমন এখানকার মানুষ আমিও তেমনি। বহুকাল দুর্গাপুজো দেখিনি। আমি আমার মতো করে এই পুজো দেখতে এসেছি। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, সেই সুযোগটা আমাকে দিন।'

বুবু পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, 'কথা দিচ্ছি, আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।'

বুবু আর জয়দীপ স্বচ্ছন্দে থাকবে বলে বাড়ির ভেতরটাতে অদলবদল করেছে। চট করে আমার ছেলেবেলার ঘরগুলোকে চেনা মুশকিল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রান্নাঘর, উঠোন, গাছগুলো একইরকম রয়ে গিয়েছে। ওরাও যেন আমায় চিনতে পেরে গেল। নইলে একটু হাওয়া বইতেই তালগাছটা ঈষৎ ঝুঁকে মাথা নেড়ে কেন বলবে, 'কেমন আছিস?' বুবু হেসে বলল, 'আপনারা লেখকরা কত কী শুনতে পান। অবশ্য পান বলেই আমরা জানতে পারি।'

পঞ্চমীর রাতেই দেবী কেশবতী হবেন, মধ্যরাত্রে চক্ষুষ্মতী। তৃতীয় নয়ন সমেত।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই বেরিয়ে এলাম বাইরে। আহা, মধুর দৃশ্য! সেই ছেলেবেলায় এই ভোর-ভোর সময়ে আমরা, ছোট ছেলেমেয়েদের দল, বেরিয়ে পড়তাম ফুল তুলতে। সেই শিউলি গাছটা এখনও ফুল ঝরাচ্ছে। বুবু ঠিকই বলেছে। ওই গাছ আমার থেকে বয়সে বড়। তার তলায় যারা ফুল কুড়োচ্ছিল তারা আমাকে দেখে সংকোচে পড়ল। বললাম, 'আমিও একসময় ফুল কুড়িয়েছি।

তোলো তোমরা।' গাছটার দিকে তাকালাম। যেন ফিসফিস করে কেউ বলল, 'কেমন আছিস?'

আরও একটু বেলা হলে হাঁটতে হাঁটতে বাজারে চলে এলাম। জয়দীপ বলেছিল, বাজারে এখন একাধিক পুজো হয়। তবে প্রধান পুজো হল ক্লাবের মাঠে, যেখানে একসময় পাঠশালা ছিল। ভবানী মাস্টারের পাঠশালা। ষষ্ঠীর সকালে সেখানে তেমন ভিড় নেই। সেই একই চেহারার দেবীমূর্তি। উদ্যোক্তারা ব্যস্ত। হঠাৎ তাঁদের একজন এগিয়ে এল, 'খুব ভুল যদি না করি, বাবলু না?'

'হ্যাঁ। খোকন তো?'

সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল খোকন। এখন তার চেহারা ভারী। গালে না-কামানো সাদা দাড়ি। বলল, 'তুমি তো আমাদের ভুলেই গেছ।'

বললাম, 'কী যে বলিস। এসব কি ভোলা যায়?'

দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে সে তুই-তে নেমে এল। জানলাম, এতদিন সে এখানে ট্যাক্সি চালিয়েছে। ট্যাক্সি কিনে ভাড়া খাটিয়েছে। নিজের বাড়ি তৈরি করেছে। জানতাম, তপন মারা গিয়েছে। শিবুও তো অনেকদিন চলে গিয়েছে, দীপু কোথায় তা খোকন জানে না।

'থাকবি ক'দিন?'

'হ্যাঁ।'

'চল, আজ সন্ধেবেলায় তোতে-আমাতে আশপাশের ঠাকুর দেখে আসি। সেই কলেজে পড়ার সময় যেমন যেতাম।' খোকন বলল।

জায়গাটা স্বাভাবিকভাবেই বড় হয়েছে। সেলুন ছিল না আমাদের ছেলেবেলায়, বাড়িতে হাজাম আসত। এখন সেলুন হয়েছে। নানান দোকান। তবে রেস্তোরাঁ চোখে পড়ল না।

চা-বাগানের দুর্গাপুজোয় মাইক বাজছে না। আজ ষষ্ঠী। খুব একটা তফাত চোখে পড়ছে না। আমাদের ছেলেবেলায় যাঁরা এই চা-বাগানে কাজ করতেন তাঁদের কেউ আর এখন নেই। যেমন বাতাবি গাছটাও নেই। বুবু বলল এক ঝড়ে ভেঙে গিয়েছিল গাছটা। কেটে ফেলতে হয়েছে।

বিকেলে খোকন এল গাড়ি নিয়ে। মনে পড়ছিল, কলেজে পড়ার সময়ও আমরা বাগান থেকে ঠাকুর দেখতে যেতাম লরিতে চেপে। মা-বাবা-ভাইবোনরা একসঙ্গে, কয়েকটা পরিবার দিব্যি একই লরিতে চেপে চল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে যত চা-বাগান ছিল তাদের পুজো দেখতে যেতাম।

খোকন গাড়ি চালাচ্ছিল। বলল, 'ক'টা ঠাকুর দেখবি?'

হেসে ফেললাম। বললাম, 'গত তিরিশ বছরে আমি একবারও ঠাকুর দেখতে বের হইনি। আজ কোনও বাধা নিষেধ নেই।'

'চল, বিনাগুড়ি দিয়ে শুরু করি।' খোকন বলল, একটা পুজো থেকে অন্য পুজোয় যেতে হলে জঙ্গল পেরোতে হবে, চা-বাগানও। আধঘণ্টা পরে পরে ঢাকের শব্দ অথবা মাইকের গান কানে আসছিল। লক্ষ করলাম, কলকাতার সাজসজ্জা, থিম অথবা আলোর মায়া এখানে এখনও সক্রিয় হয়নি।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'বানারহাটে এখনও মেলা বসে?'

'বিশাল মেলা। সবশেষে যাব।' খোকন বলল, 'তার আগে এথেলবাড়িতে যাব।'

'এথেলবাড়ি?'

'মনে আছে তোর?' হাসল খোকন।

আলাদা কিছু মনে এল না। খোকন বলল, 'একবার ঠাকুর দেখতে এসে তোর শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওখানে গিয়ে। পেটে ব্যথা হয়েছিল।'

মনে পড়ল, বিকেলে এথেলবাড়ির ঠাকুর দেখতে এসে প্রসাদ দিয়েছিল যে-মেয়েটি সে সত্যি রূপসী ছিল কি না মনে নেই, তবে বহুদিন তার কথা ভুলতে পারিনি। কিন্তু সেই প্রসাদ খাওয়ার পরে আমার পেটে এমন যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল যে ওরা চা-বাগানের ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল। আমাকে শোওয়ানো হয়েছিল মেয়েটির বাড়িতে। তার বাবা-মা খুব যত্ন করেছিলেন। ব্যথা কমে গেলে খোকন আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পরের বছর ঠাকুর দেখার নাম করে গিয়ে মেয়েটির দেখা পাইনি। ওর মা বলেছিলেন, 'খুকি তো দিল্লিতে আমার ভাইয়ের কাছে থাকে। এবার ওর স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা, তাই আসেনি।' ধীরে ধীরে হারিয়ে গিয়েছে তার মুখ।

এথেলবাড়ির পুজো প্রায় একই চেহারায় আছে। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় জমিয়ে ঢাক বাজছে। অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা সেজেগুজে পাক খাচ্ছে। আমাদের গাড়ি দেখে বয়স্করা তাকালেন। তাঁদের কেউ কেউ খোকনের চেনা। ওর মারফত আমার পরিচয় পেতে দেরি হল না। এক ভদ্রলোক এসে বললেন, 'আমাকে আপনার চেনার কথা নয়। আমার বাবা এই বাগানে কাজ করতেন। এখানে এসে আপনার যখন পেটে খুব ব্যথা হয়েছিল তখন আমি খুব ছোট। আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

'আচ্ছা!' আমি হাসলাম।

'আমার বাবা-মা-কে মনে আছে আপনার?'

'নিশ্চয়ই। ওঁরা খুব যত্ন করেছিলেন।'

'ওঁরা আজ নেই। কিন্তু, ভদ্রলোক পেছন দিকে ফিরে কোয়ার্টারগুলোর দিকে তাকালেন, 'আমার দিদি এসেছেন। দিদিকে মনে আছে?'

'খুব অল্প।'

ভদ্রলোক হাত নেড়ে ডাকতে একটি যুবতী এগিয়ে এল, 'কী মামা?'

'দিদি কোথায়?'

'ড্রেস করছে।'

ভদ্রলোক আমার নাম বলতেই যুবতী চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি? বাব্বা! আপনার কথা সবার মুখে কত শুনেছি। আপনার যে কোনও বই বের হতেই মা কিনে ফেলে। ওই তো, মা আসছে। মা, এদিকে এসো।'

ভারী চেহারার এক প্রৌঢ়া, সামনের চুল হালকা হয়ে এসেছে, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়াতেই মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। প্রৌঢ়া তাকে ইশারায় থামিয়ে বললেন, 'জানি।' তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন?'

কেমন আছেন? কেমন আছিস? তিরিশ বছর পরে এসে নিয়ত একই প্রশ্ন শুনে যাচ্ছি। আমি জানি, আমি বদলে গিয়েছি। বদলে যাওয়া মানুষ কতখানি ভাল থাকে? কিন্তু এখানকার গাছগাছালি, এখানকার মানুষ জানতে চায়, কেমন আছ?

কারণ এখানে শিউলিরা শিউলির মতো ঝরে। এখনও।

প্রতিক্রিয়া

মনের কথা তো চেঁচিয়ে দশজনের সাথে বলা যায় না। এই হয়েছে মুশকিল। কল্পনা বেঁচে গেল পাশের ফ্ল্যাটে নতুন ভাড়াটে আসায়।

স্বামী-স্ত্রী। রবিবারের বিকেলে নিজেই এসে আলাপ করল। তখন সুবীর বেরিয়ে গিয়েছে ছুটির দিনের তাসের আড্ডায়। বেল বাজলে দরজা খুলেছিল কল্পনা। খুলে মুগ্ধ হয়েছিল। মনে হয়েছিল হিন্দি ছবির একজন নায়িকা তার সামনে দাঁড়িয়ে।

'নমস্কার। আমি তৃষা। আপনার পাশের ফ্ল্যাটে এসেছি।'

'ওহো! আসুন আসুন। আমি কল্পনা।'

বসার ঘরে বসার পরেও কল্পনার মুগ্ধতা যাচ্ছিল না। কি ফিগার তৃষার! এক ফোঁটা মেদ নেই শরীরে, শাড়িটা যেন শরীরে জড়িয়ে থেকে ধন্য হয়েছে। মুখ এমন কিছু আহামরি নয় কিন্তু চটক আছে। চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা।

'পাশেই তো থাকব তাই আলাপ করতে এলাম।' তৃষা বলল।

'খুব ভাল লাগল। আপনারা আগে কোথায় ছিলেন?'

'দিল্লিতে। ওকে অনেকদিন কোম্পানি কলকাতায় পাঠাতে চাইছিল, আমিই আপত্তি করছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমিও কলকাতায় ট্রান্সফার নিয়ে নিলাম। তাবলে ভাববেন না আমরা একই অফিসে কাজ করি।' হাসল তৃষা, 'তোমরা?'

'আমার হাজব্যান্ড কাস্টমস্ অফিসার।'

'ও বাবা! সাবধানে থাকবেন।'

'কেন?'

'এখন তো অন্না হাজারে লোকপাল বিল পাশ করাতে মরীয়া। তাহলে এখন নজর পড়বে কাস্টমস্, ইনকামট্যাক্স, সেন্ট্রাল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের ওপর।

'আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না।' কল্পনা বলল।

'তুমি কি হোমমেকার?'

এই শব্দটি কয়েকদিন আগে টিভিতে শুনেছিল কল্পনা। এখন হাউজওয়াইফ শব্দটা বাতিল হয়ে গিয়েছে। তার বদলে হয়েছে হোমমেকার। সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'তিনি কোথায়?'

'তাস খেলতে গেছেন।'

'সেকি তাস? নিশ্চয়ই মোটা গ্যামব্লিং করেন। কাস্টমস্ অফিসার তো!'

'আমাকে কিছু বলে না।' কল্পনা বলল, 'কি খাবেন? চা না কফি?'

'আজ কিস্যু না। কিন্তু কল্পনা', হাসল তৃষা, 'কলকাতা শহরে আমার বেশি বান্ধবী নেই। তোমাকে বান্ধবী ভেবে নিতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'থ্যাঙ্কু। তাহলে এরপর থেকে আর আপনি নয়। ঠিক তো?'

'আচ্ছা।' হেসে ফেলল কল্পনা।

রাত্রে যখন সুবীর ফিরল তখন ওকে বিছানা ডাকছে। রোজই ড্রিঙ্ক করে ফেরে, আজ আকণ্ঠ খেয়ে এসেছে। ডিনার করবে না বলে শুয়ে পড়ল। পড়ামাত্র নাক ডাকতে লাগল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে কল্পনা ঠিক করল, তৃষার কথা ওকে বলবে না। এখন পর্যন্ত কোনদিন কোন কথা না বলে থাকেনি সে, সেই বলার জন্যে অনেকসময় অশান্তি হয়েছে। কিন্তু এখন মড়ার মত পড়ে থাকা লোকটার সাথে দূরত্ব তৈরি করতে চাইল সে।

এই সময় সুবীরের মোবাইলটা টেবিলের ওপর গোঙানি শুরু করে কাঁপতে লাগল। সাইলেন্ট মোডে ভাইব্রেশনে রেখেছিল নিশ্চয়ই। এই বাড়ির নিয়ম কেউ

কারো চিঠি খুলে পড়বে না, একজন অন্যজনের মোবাইল অন করবে না। এগিয়ে গিয়ে মোবাইলটা তুলতেই কল্পনা দেখতে পেল স্ক্রীনে ফুটে উঠেছে এস. জি! এর স্তিমিত আওয়াজ ঘুমন্ত সুবীরের কানে যাচ্ছে না। বাজতে বাজতে থেমে গেল যন্ত্রটা।

কে এই এস. জি? কিছুদিন আগে সুবীর যখন স্নানে গিয়েছিল তখন তার মোবাইল বেজে উঠতেই কল্পনা স্ক্রীনে দেখতে পেয়েছিল ডি. গুপ্তা। কেন পুরো নাম বা নামের প্রথম শব্দ মোবাইলে স্টোর করে না সুবীর বুঝতে পারে না কল্পনা। তখন সন্দেহ হয়। এসব কোন মহিলার ফোন নয় তো!

দশবছর বিয়ে হয়েছে, একবার কনসিভ করেছিল কিন্তু সেটা পৃথিবীতে আসেনি। যমে মানুষে টানাটানি হয়েছিল তখন। তারপর আর ও পথে হাঁটেনি সুবীর। বলেছিল, 'একগাদা টাকা ফালতু খরচ হয়ে গেল।'

এখন তৃষার সাথে ভাব হয়ে গেল কল্পনার। একদিন তৃষা বলল, 'তুমি এত সুন্দর দেখতে কিন্তু শরীরসচেতন নও কেন?'

হেসে ফেলল কল্পনা, 'কেন? কি করব? আমি খুব কম খাই।'

'দুর! তাতে কি হবে? তোমাকে জিমে যেতে হবে। এই যে কোমরে যে ফ্যাট জমেছে গায়ে গলায় যা বেড়েছে তা কমে গেলে তোমাকে দারুণ দেখাবে।' তৃষা বলল।

'দেখিয়ে কি লাভ হবে?'

'তোমার লাভ হবে। আয়নার সামনে যখন দাঁড়াবে মন ভাল হয়ে যাবে।' হাসল তৃষা।

'তাছাড়া সুন্দরী এবং ভাল ফিগারের মেয়েদের দেখার জন্যে সমস্ত পুরুষ জাতটাই হাঁ করে বসে থাকে।'

'ধ্যেৎ।' লজ্জা পেল কল্পনা।

পরের দিন সকালে সুবীরকে কথাটা বলল কল্পনা। শুনে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুবীর বলল, 'তুমি জিমে যাবে?'

'হ্যাঁ।' মাথা নেড়েছিল কল্পনা।

'হঠাৎ আজকাল টিভিতে এসব দেখাচ্ছে বুঝি। গিয়ে কি হবে?'

'অন্য মানুষের যা হয় তাই হবে।'

'হুঁ।' আর কথা বাড়ায় না সুবীর।

শব্দটা সম্মতির ভাবলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না। তৃষা কাছাকাছি যে জিমের ঠিকানা ফোন নাম্বার দিল তাদের কাছে জানল আট হাজার টাকা জমা দিতে হবে। এর পরে মাসের চাঁদা। সুবীরের ওই প্রতিক্রিয়ার পর টাকার জন্যে হাত পাতার কোন বাসনা হল না কল্পনার। বিয়ের আগে বাবা একটা অ্যাকাউন্ট

করে দিয়েছিলেন। সেই টাকা থেকে খুব সামান্য এতগুলো বছরে সে তুলেছিল। প্রতিবছরে দুবার। অ্যাকাউন্ট চালু রাখতে হলে সেটা করা প্রয়োজন। কল্পনা পরের দিন ব্যাঙ্কে গিয়ে দশ হাজার টাকা তুলে নিল। সে দেখল যে টাকা এত বছরে তুলেছিল তার সমান সুদ তাকে দেওয়া হয়েছে।

পরের শনিবারে তৃষাই তাকে নিয়ে গেল জিমে। ভর্তি হয়ে গেল কল্পনা। তিনটে থেকে বিকেল পাঁচটার সময়টা সে চেয়ে নিল। বাকি টাকায় সে ব্যায়ামের পোশাক কিনে ফেলল জিমের নিয়ম অনুযায়ী।

প্রথম সপ্তাহে শরীরে তীব্র ব্যথা। জিমের দেওয়া খাদ্যতালিকা অনুকরণ করতে গিয়ে সারাক্ষণ ক্ষিদে ক্ষিদে ভাব। কিন্তু মন শক্ত করল কল্পনা। তাকে ছিপছিপে হতেই হবে।

রবিবার বাজারে যাওয়া সুবীরের নেশার মত। সকালে বাজার থেকে ফিরে সে বলল, 'তোমার সঙ্গে পাশের ফ্ল্যাটের নতুন বাসিন্দাদের ভাল আলাপ হয়ে গেছে বলনি তো?'

'কখন বলব?'

'মানে?'

'রাত্রে যখন বাড়িতে ফেরো তখন কথা শোনার অবস্থা কি তোমার থাকে?'

'অ।'

'কিন্তু তোমাকে কে বলল?'

'ওরাই। বাজারে যাওয়ার সময় নিচে দেখা হল। ভদ্রমহিলাই হেসে আলাপ করলেন। দিল্লির মেয়ে তো, হেভি স্মার্ট! এই বয়সেও ফিগার দেখেছ? ফিল্মস্টারদেরকেও হার মানাবে। তোমার খুব প্রশংসা করল।' সুবীর বলল।

হতেই পারে। দেখা হলে কথা হতেই পারে। কিন্তু প্রশংসা করার কি দরকার ছিল। কল্পনার মনে হল তার উচিত ছিল তৃষাকে সতর্ক করে দেওয়া।

সুবীর বলল, 'ভাল ভেটকির ফিলেট এনেছি। বেসন দিয়ে ভেজে রেখো তো। আজ বিকেলে ওদের চায়ে ডেকেছি।'

বিকেলে ওরা এল। তৃষার স্বামীকে আজ প্রথম দেখল কল্পনা। তার খেয়াল হল, আজ পর্যন্ত একবারও তৃষা তাকে বাড়িতে যেতে বলেনি। ভদ্রলোকের মাথায় একটিও চুল নেই। ফর্সা, মুখে হাসি সেঁটে আছে।

ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে কিচেনের কাজ সারতে হচ্ছিল কল্পনাকে। মাছ খেয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ফ্যান্টাস্টিক। তবে যাই বলুন, এ জিনিস চায়ের সঙ্গে বেমানান।'

তৃষা ধমকালো, 'থাক। চায়ের সঙ্গেই খাও।'

সুবীর বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে একমত। আজই প্রথম আলাপ। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল, যদি আপত্তি না থাকে—!'

কল্পনা বাধা দিল, 'তুমি মায়ের কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে?'

'ওঃ! তা বটে।' সুবীর হতাশ হল।

ভদ্রলোক কৌতূহলী, 'ব্যাপারটা জানতে পারি?'

'আর বলবেন না। মা মদের গন্ধ সহ্য করতে পারতেন না। বলেছিলেন—খেতে হয় বাইরে গিয়ে খা, এই বাড়িতে কখনও খাবি না। প্রতিজ্ঞা কর।'

কাঁধ ঝাঁকালো সুবীর, 'মা নেই, তবু—।'

তৃষার স্বামী বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা অনুরোধ করছি। আজকের সন্ধেটা আমাদের ফ্ল্যাটেই আড্ডা মারুন।'

'না না। আপনাদের বিরক্ত করা ঠিক হবে না।'

'বিন্দুমাত্র বিরক্ত হব না। বরং খুশি হব।'

সেই সন্ধেতে তৃষার ফ্ল্যাটে যেতে হয়েছিল সুবীরের সাথে। দামী স্কচের বোতল খুলেছিলেন ভদ্রলোক। সুবীরকে ওখানে রেখে কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসেছিল কল্পনা। ওকে দরজা অবদি এগিয়ে দিয়ে তৃষা নিচু গলায় বলেছিল, 'তুমি কিছু মনে করনি তো? ও যে ফট করে নেমন্তন্নই করে বসবে আমি বুঝতে পারিনি।'

কল্পনা মাথা নেড়েছিল, 'না না।'

ছ'মাসের মধ্যে পাঁচ কেজি ওজন কমে গেল কল্পনার। এখন জিমের সবার সঙ্গে তার ভাল পরিচয় হয়ে গিয়েছে। যে মহিলা ইনস্ট্রাক্টর কল্পনাকে গাইড করেন তিনি বললেন, 'আপনি দারুণ ইমপ্রুভ করছেন। গুড। এর সঙ্গে একটু ক্যারাটে শিখে নিন। এখানেই ক্যারাটের ক্লাস শুরু হচ্ছে।'

'ওসব শিখে কি হবে?'

'আপনার শরীর এখন আগের থেকে ঝরঝরে। এখানে যারা আসে তাদের অনেকেই খাওয়ার লোভটা কমাতে পারে না। আপনি পেরেছেন। এবার ক্যারাটে শিখলে আপনি যে কোন বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবেন।

বারংবার শোনার পর রাজি হয়ে গেল কল্পনা।

রাত্রে পান করে ফ্ল্যাটে ফিরে সুবীর নিজের মনে গজ গজ করছিল। এই সময় ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তবু কারণ না জিজ্ঞাসা করে পারল না কল্পনা।

আধাজড়ানো গলায় সুবীর বলল, 'পাশের ফ্ল্যাটে থাকে, মাঝে মাঝে স্কচ খাওয়ায় বলে এখন অ্যাডভান্টেজ নিতে চাইছে। সম্পর্কটা এমন টাকা চাইতে অস্বস্তি হচ্ছে। আবার টাকা ছাড়া কাজটা করে দিলে কলিগরা ভাববে আমি একাই সব টাকা মেরে দিয়েছি। নাঃ টাকা চাইতেই হবে।'

'কি কাজ?'

'অ্যাঁ? ও। জাহাজে পাঁচশোটা ইতালিয়ান সু এসেছে। সব বাঁ পায়ের, ডান পায়ের কোন জুতো নেই। কেউ ছাড়াতে আসছে না। যার নামে এসেছে তার কোন অস্তিত্ব নেই। গোডাউনে পড়ে আছে ওগুলো। তোমার বান্ধবীর স্বামী চাইছেন ওগুলো আমরা নিলামে তুলি। এক পাটি জুতো কিনতে কেউ রাজি হবে না। উনি জলের দামে কিনবেন।'

'ওমা। কি করবেন শুধু বাঁ পায়ের জুতো কিনে?'

'জিজ্ঞাসা করলে হাসছেন, উত্তর দিচ্ছেন না। নিশ্চয়ই কোন বড় ধান্দা আছে। দুটো জুতো থাকলে হাজার দশেক দাম হত। দশ হাজার ইনটু পাঁচশো। ভাবো?'

দিন তিনেক বাদে আবার নেশার ঝোঁকে সুবীর বলল, 'শালা, পিঁপড়ের পেট টিপে মধু খাই আমি। যাবে কোথায়? নিলামে তুলে দিলাম পঞ্চাশ হাজার পেয়ে। একাই কিনে নিয়ে গেল লোকটা। মুখে বলল চামড়া কেটে দুজোড়া বানিয়ে নেবে। জলের দরে। পাঁচশ জুতোর চামড়া একশ টাকায় পেয়ে গেল।'

'তুমি ওদের কাছে টাকা নিয়েছ?'

'আলবৎ। কেন নেব না।'

'ছিঃ।'

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সরে গেল সুবীর।

মাসখানেক বাদে আকণ্ঠ মদ খেয়ে ফিরে সুবীর চেঁচাবে। 'আমাকে ছি বলেছিলে এ্যাঁ? চেন্নাই পোর্টে পাঁচশো পাটি ডান পায়ের জুতো এনেছিল। সেম ব্যাপার। যার নামে এসেছিল তার অস্তিত্ব নেই। ওখানেও নিলাম হয়েছে। পার পিস একশো টাকায় কিনে নিয়ে গেছে একজন। আমাকে পঞ্চাশ দিয়েছিল ওখানে এক লাখ দিয়েছে। একই পার্টি। দুটো জুতো জুড়লেই দশ হাজারে বিক্রি করবে। শালা চীট। খুব দরদ দেখাও। আমাকে ছিঃ বলা হয়েছিল?' বলতে বলতে কল্পনার ডান হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল সুবীর। পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল কল্পনা। নিজের অজান্তে সদ্য শেখা ক্যারাটে প্রয়োগ করল সে। সাথে সাথে ছিটকে দূরে পড়ে গিয়ে অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বিড় বিড় করল সুবীর, 'মেরো না, প্লিজ, মেরো না।'

ঘরে ফেরা দরকার

ছোট ভাই আলতাফ এসে বলল, 'আপনাকে সঙ্গে নিয়ে একবার কালিগঞ্জে যাওয়া দরকার।'

ভাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো কিন্তু বন্ধুর মতো নয়। সামনে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না সে। মতিন এতে অভ্যস্ত। আজ সরাসরি যাওয়া দরকার বলায় সে একটু অবাক হল। প্রশ্ন করল, 'যাওয়া দরকার মানে?'

'আপনি অনেকদিন ওখানে যাননি।'

'হঠাৎ একথা?'

'হঠাৎ কেন হবে? ঢাকাতে ব্যবসা ভালো যাচ্ছে না। প্রচুর ব্যাঙ্কলোন হয়ে আছে। তার সুদও ঠিকঠাক আমরা দিতে পারছি না। আপনাকে তো বলেছিলাম এবার গ্রামের দিকে তাকানো দরকার। আব্বা কিংবা আপনি গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলেন ব্যবসা করতে। আমাদের ভাগ্যে তেমন কিছু হয়নি। তাই এখন গ্রাম নিয়ে ব্যবসা করলে সব ঠিক রক্ষা পেতে পারে।'

মতিনের মনে পড়ল। গত তিন চার মাস আলতাফ প্রায়ই কালিগঞ্জে যাচ্ছে। সেখানে পুকুর সংস্কার করে অথবা খুঁড়িয়ে মাছের চাষ করতে চায় তাতে নাকি প্রচুর লাভ।

দাদাকে চুপ করে থাকতে দেখে আলতাফ আবার বলল, 'ওখানে আমাদের প্রচুর জমিজমা আছে। কত আছে তার রেকর্ড আমার জানা নেই। সেসব উদ্ধার করে যদি ফিশারি, ডেয়ারি আর পোলট্রি করতে পারি তাহলে ব্যাঙ্কলোন শোধ করতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

মতিন বলল, 'মাছ অথবা ছাগলের ব্যবসা আমরা আগে করিনি।'

'গারমেন্টের বিজনেস কি আমরা কখনও করেছি?'

'ঠিক আছে। তুমি যাচ্ছ, তুমিই যাও।'

'না দাদা। আপনি না গেলে কিছু হবে না। আপনাকে ওখানে থাকতে হবে না, মাঝে মাঝে যাবেন। যা করার আমিই করব।'

'আমাকে যেতে হবে কেন?'

'ওখানকার লোকগুলো আপনার কথা নরম গলায় বলে। ওদের হাতে রাখা দরকার।'

'হুম!' মতিন মনে করার চেষ্টা করল। অনেককাল গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। আব্বার ইন্তেকাল হওয়ার পর শেষবার গিয়েছিল। ছিল দু'দিন। তাও

অনেককাল হয়ে গেল। কারও মুখ স্পষ্ট মনে পড়ে না। কালিগঞ্জের বাড়ির পেছনে একটা বিশাল বিল আছে। দিগন্ত দেখা যায় না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'বিলটা পড়ে আছে। ওখানে কিছু করতে পারো না? ওটা তো আমাদেরই বিল!'

আলতাফ হাসল, 'বিল এখন নামেই, এক ফোঁটা পানি নেই।'

'সেকি?' চমকে উঠল মতিন।

'হ্যাঁ, অনেকদিন কালিগঞ্জে যাওয়া হয়নি তাহলে। ঢাকা শহরে একবার বাস করতে আরম্ভ করলে বড্ড বেশি শেকড় গজিয়ে যায়। এখন কালিগঞ্জে নিকট সম্পর্কের কেউ নেই। বাড়িঘর, জমি পুকুর সব পড়ে আছে আশ্রিতদের তত্ত্বাবধানে।'

মতিন জন্মেছিল কালিগঞ্জেই। শৈশবও সেখানে কেটেছিল। পড়াশুনার সুবিধের জন্য আব্বা ঢাকায় বাসা নিয়েছিলেন। তারপর কাকরাইলে জমি কিনে বাড়ি তৈরি হল। মতিন ক্রমশ ঢাকার লোক হয়ে গেল। আব্বা জীবিত থাকাকালীন কালিগঞ্জের সব খবর পাওয়া যেত। তখন যাওয়ার সুবিধে ছিল না। প্রথমে ট্রেন পরে নৌকা। এখন সরাসরি গাড়িতে যাওয়া যায়। ব্রিজ হয়ে গেছে শীতলক্ষার ওপরে।

মতিনের স্ত্রী আধুনিকা। কালিগঞ্জের আবহাওয়া তার পছন্দ নয়। মায়ের পছন্দ পেয়েছে ছেলেমেয়েরা। কিন্তু আজ আলতাফের কথা শোনার পর থেকে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল মতিনের। বিলটা শুকিয়ে গিয়েছে এটা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছিল। আদিগন্ত বিস্তৃত বিল ছিল বাড়ির পেছনে। একবার আব্বার সঙ্গে বোনের শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিল সে বিল পেরিয়ে। সেখানে দেরি হয়ে যাওয়ায় ফেরার সময় সন্ধে নামে। দুর্গাদাস নৌকো বাইছিল। সেই সময় ঝড় উঠল। বিলের ঢেউ সমুদ্রের চেহারা নিল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কোন কুলে তাদের বাড়ি বুঝতে না পেরে আব্বাকে জড়িয়ে ধরে বসে ছিল সে। হঠাৎ দুর্গাদাস চিৎকার করে অন্ধকারের আকাশ দেখ। বহুদূরে একটা আলো দুলছে। আব্বা বলেছিলেন বাড়ির কেউ শিমুল গাছে উঠে বাতি ধরেছে যাতে দুর্গাদাস দিক ভুল না করে। সেই বিল শুকিয়ে গেল এ কি রকম কথা!

আলতাফ গাড়ি চালাচ্ছিল। রিকন্ডিশন্ড জাপানি গাড়ি। তিন বছর বয়স হলেও ভালো ছোটে। মতিন বসে ছিল পাশে। তার অফিসে একটা বড় আড্ডা জমে। ঢাকার অনেক শিল্পী সাহিত্যিক সেই আড্ডায় হাজির থাকেন। ব্যবসাটা দেখে আলতাফই। অতএব ওর অনুরোধে একটা দিন আড্ডা কামাই করতে হল।

রাস্তা তো বেশ ভালো। রিক্সার উপদ্রব কম। ওই রিক্সার জন্য মতিন ঢাকাতে গাড়ি চালাতে চায় না। আজ ইচ্ছে হলেও ভাইকে স্টিয়ারিং ছাড়তে বলতে পারল না। বাল্যকালে ঢাকা থেকেও নৌকো চেপে গ্রামে যাওয়া যেত। তারপর ট্রেন এবং নৌকো। এখন নদীর ওপর ব্রিজ হয়েছে পথটাও ছোট হয়ে গেছে অনেক। ঠিক

আটান্ন মিনিট লাগল কালিগঞ্জে ঢুকতে। বাঁ দিকে তাঁতিপাড়া। শৈশবে ঘুম ভেঙে গেলে মাঝরাতেও তাঁতিপাড়া থেকে শখ ভেসে আসত। এখন মেশিনের আওয়াজ কানে এল। আলতাফ বলল, 'এরা এখন রকমারি তোয়ালে বানায়। ঢাকা থেকে এক্সপোর্ট হয়।'

'কামালচাচা এখনও বেঁচে আছে?'

'আছে। আগের বার দেখেছিলাম।'

'ডাক না একবার।'

গাড়ি থামাল আলতাফ। মাটির রাস্তা, পাশে বাঁশঝাড়, এঁদো পুকুর। বাঁ দিকে তাঁতিপাড়া। গাড়ি থেকে নেমে একটি বাচ্চাকে আলতাফ বলল কামালচাচাকে ডেকে দিতে।

গাড়িতে বসে মতিন দেখছিল বাড়িগুলো। একই রকম রয়েছে, শুধু আওয়াজটা আধুনিক হয়েছে। ওই কামালচাচা তাদের গামছা বুনে দিত, ছেলেটা ফিরে এসে বলল, 'তিনি নাই। গাজীপুরে আছেন।'

আলতাফ আবার গাড়ি চালু করল। একটু এগিয়ে বলল, 'বাঁ দিকের জমিগুলো নাকি আমাদের। এর আগের বার ইদ্রিশচাচা বলেছিল।'

'রেকর্ড নেই?'

'আমার কাছে নেই। আব্বা যদি রেখে গিয়ে থাকেন!'

'আমাকে কিছু দিয়ে যাননি।'

'এই বাড়িতে একটা আলমারি আছে তালা মারা। দুর্গাদাস বলে ওটা নাকি আব্বার আলমারি। আপনি কোনও দিন খুলে দেখেছেন?'

'না।'

সামনে বাজারমতো এলাকা। দশ বারো ঘর দোকান। ডানদিকে মসজিদ। এই মসজিদটার একটা ইতিহাস আছে। আগে এখানে বিশাল মাটির ঢিপি ছিল। বাচ্চারা খেলত। মতিনের ঠাকুরদা এই ঢিপি খুঁড়ে একটা বাড়ি আবিষ্কার করেন। পরে সেটাকে সংস্কার করে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। জমিটাও তাদের। মসজিদের পাশে বিশাল পুকুর। পুকুরের গায়ে ওদের পারিবারিক কারখানা। মতিন বলল, 'গাড়িটাকে এখানে একটু রাখ। গ্রামে ঢোকার আগে ঘুরে যাই।'

মসজিদের সামনে কয়েকজন বৃদ্ধ মানুষ বসে ছিলেন। প্রত্যেকের মাথায় টুপি এবং গালে দাড়ি। আলতাফকে দেখে সবাই অভিবাদন জানাতে লাগল। হঠাৎ একজন বলে উঠল, 'আমাগো মতিন না?'

মতিন একটু লজ্জা পেল। বৃদ্ধকে সে চিনতে পারছে না। নিশ্চয়ই বাল্যকালে সুসম্পর্ক ছিল। সে বলল, 'এত ঝামেলায় থাকি যে সময় পাই না।'

'এসবই তো তোমাগো জমি জায়গা, এই দীঘি, কবরখানা, মসজিদ, সবই

তোমার আব্বায় করছিলেন। তিনি এখন নাই, এখনও এই কথাটা ভাবতে পারি না।' বৃদ্ধ এগিয়ে এসে মতিনের হাত ধরলেন। মতিনের এবার অস্বস্তি হচ্ছিল। বৃদ্ধের পরিচয় সে আলতাফকে আলাদা পেলে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারত। ও দেখল আলতাফ জুতো মোজা খুলছে। একজন ঘটি করে জল দিয়ে গেলে আলতাফ ওজু করে নিল। তারপর সবাই মিলে ঘিরে দাঁড়াল আব্বার কবরস্থল।

মৌলবী সাহেব প্রার্থনা শুরু করলেন।

মতিন ভিড়ের মধ্যে হাত জোড় করে দাঁড়াল। সে মুসলমান, এই মুহূর্তে আলতাফ এবং অন্যান্যদের দুই হাত চিত করে আঁজলার মতো যেভাবে ধরে আছে তাই তার করা উচিত। কিন্তু আব্বার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সে বুকের ওপর নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত রাখাই সঙ্গত মনে করল।

হজ করে আসার পর আব্বাকে সে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'প্রার্থনার সময় ঠিক কোনভাবে হাত রাখা উচিত?'

আব্বা বলেছিলেন, 'যেভাবে তোমার মনে হবে আল্লাকে বেশি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে সেইভাবে।'

মতিনের কানে এল এক মৌলবী বলছেন, 'আমরা জানি না তিনি এখন কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন। শুধু জানি তুমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছ। তোমার পবিত্র স্নেহের ছায়ায় তিনি দিবারাত্র স্নান করছেন। দেশ থেকে কেউ যদি বিদেশে গমন করে তাহলে আমরা তার খবর টেলিফোনে, টেলিগ্রামে, চিঠিতে জানতে পারি। কিন্তু তিনি এমন স্থানে গমন করেছেন যে সেখানে এসব যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। অতএব তোমার ওপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের কোনও উপায় নেই। এই স্থানে মাটির নিচে তিনি এবং তাঁর মতো যাঁরা শায়িত তাঁদের প্রত্যেকেই তোমার অপার করুণা থেকে যেন বঞ্চিত না হয় আমাদের সকলেরই এই প্রার্থনা।'

মতিন প্রার্থনারতভাবে আলতাফকে দেখল। মৌলবীর শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ওর ঠোঁটও নড়ছে। আলতাফ অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। সে দিনে অন্তত তিনবার নামাজ পড়ে, প্রত্যেক বছর কঠোরভাবে রোজা পালন করে। এখন ওর চোখ বন্ধ। স্পষ্টতই তাদের আব্বার জন্য ও আল্লার কাছে যে প্রার্থনা করছে তাতে কোনও খাদ নেই। অনেকেই বলে আলতাফ নাকি খুব রাগী। কিন্তু তার সামনে কখনও আলতাফকে ক্রোধ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি।

প্রার্থনার পর মতিন আলতাফের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল, 'আব্বা এখানে একটা হাসপাতাল করেছিলেন না? ওটা ঠিকঠাক চলছে তো?'

'হাসপাতালটা আছে এই পর্যন্ত। এখন তো ওটা সরকার নিয়ে নিয়েছে।' আলতাফ জানাল।

'চল দেখে আসি।' মতিন এগোল।

সবাই তাদের দেখছিল। ছোট্ট হাসপাতাল বাড়িটা কাছেই। ওপরে সিমেন্টে লেখা, 'কালিগঞ্জের অসুস্থ মানুষদিগের সেবার জন্য হাজি খালেদ মোহম্মদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।'

আলতাফ আগে হাসপাতালের বারান্দায় উঠে পড়েছিল। মতিন দেখল জনা-চারেক মানুষ আউটডোর লেখা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে। প্যান্টশার্ট পরা যে লোকটি বেরিয়ে এলেন তাঁকে আলতাফ নিচু গলায় কিছু বলতেই তিনি কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম্।'

মতিন মাথা নেড়ে বলল, 'ওয়ালাইকুম্ আসসালাম্! আপনার হাসপাতাল কিরকম চলছে?'

'এই আর কি! আমি ডক্টর শফিকুল আহমেদ।'

'আমি মতিন। এই হাসপাতাল আমাদের আব্বা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন কি পেশেন্ট কম হয়? চারপাশে প্রচুর ধুলো দেখতে পাচ্ছি।' মতিন বলল।

'ঝাড়ুদারের শরীর খারাপ। পেশেন্ট মন্দ হয় না। সামনেই রোজা বলে বেশি ভর্তি করছি না।'

'আপনি কি এখানকার লোক?'

'না, না। সরকারি চাকরি করি, বদলি হয়ে এসেছি। এখন রাস্তাঘাট ভালো হয়ে গেছে। একটু ক্ষমতা থাকলে লোকে পেশেন্ট নিয়ে হয় গাজিপুর নয় ঢাকায় চলে যায়। লোকাল ডাক্তারের ওপর বাঙালি বেশি ভরসা করতে চায় না।' ডক্টর শফিকুল হাসলেন।

'হাসপাতালের যা হাল তাতে ভরসা করা মুশকিল।' মতিন বেরিয়ে গেল।

আব্বা চেয়েছিলেন মানুষের উপকার হোক। নৌকো, রেলে করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার আগে অনেক পেশেন্ট মারা যেত। গাজিপুরেও তখন হাসপাতাল তৈরি হয়নি। সেইসময় এই বাড়ি তৈরি করে ঢাকা থেকে স্বদেশি ডাক্তার আনিয়ে হাসপাতাল খুলেছিলেন তিনি। এক ফোঁটা ময়লা পড়ে থাকত না তখন। কিছু ওষুধ সরকারি অনুদানে পাওয়া যেত, বাকিটা আব্বা জোগাতেন। বিছানা দেখে ছেলেবেলায় মতিনের নিজেরই লোভ হত সেখানে গিয়ে শুয়ে থাকতে।

আলতাফ গাড়ি আনতে চেয়েছিল। বাড়ি এখনও মিনিট পাঁচেকের পথ। হাজি সাহেব সেই যে রাস্তা করে গিয়েছিলেন তা এখনও অটুট আছে। আলতাফকে নিষেধ করল মতিন। হেঁটে গেলে ভালো লাগবে তার। অতএব আলতাফ গাড়ি নিয়ে চলে গেল আগে।

মোড়ে এসে দোকানপাট দেখল মতিন। একই রকম আছে। এখানে এখনও লাল নীল লজেঞ্চুস বয়ামে বিক্রির জন্য রাখা হয়। শৈশবে এগুলো স্বপ্নের বস্তু

ছিল। এর স্বাদ কিরকম ভুলেই গিয়েছে সে। সামনের দোকানটায় একটা বাচ্চা খালি গায়ে বসে। মতিন তার কাছে গিয়ে বলল, 'গোটা চারেক লজেঞ্চুস চাই। কত দিতে হবে?'

'এক টাকা।'

মতিনের মনে পড়ল তখন এক আনায় আটটা পাওয়া যেত। পকেটে একটা টাকা নেই। তাই দশটাকার নোটটা বাড়িয়ে দিলে ছেলেটা দুবার মাথা নাড়ল, 'খুচরা নাই।'

'রেখে দাও। যাওয়ার সময় নিয়ে যাব।' কাগজে মোড়া চারটে লজেঞ্চুস নিয়ে হাঁটা শুরু করল মতিন। একটা মুখে দিলে কিরকম হয়? স্বাদ বিলকুল ভুলে গিয়েছে সে। চোরের মতো একটা মুখে পুরে বাকিগুলো পকেটে ঢোকাল মতিন। ডান দিকে বাঁশঝাড় আর বাঁ দিকে খালের মতো জলাশয়। দূরে একটা বাড়ির মাথায় টিভির অ্যান্টেনা। অর্থাৎ এখানে ঢাকা টিভির অনুষ্ঠান আসে। অবশ্য এটা খবর নয়। কালিগঞ্জের মানুষ টিভি কেনার সামর্থ্য রাখে এখন। মনে আছে প্রথম যখন তার বাড়িতে রেডিও আসে তখন এই গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। দিনরাত লোক লেগেই থাকত শব্দ শোনার জন্য। যে বাড়িতে টিভি এসেছে তার অবস্থাটা কি!

জিভে বিশ্রী স্বাদ, ক্যাটকেটে চিনিতে শরীর গুলিয়ে উঠল মতিনের। এ শালা লজেন্স নয় লবেঞ্চুস। বাল্যকালে কি আনন্দ পেত এতে? মুখ থেকে বস্তুটা ফেলে দিল সে। ধুলোয় পড়ে অন্য আকৃতি নিয়ে নিল সেটা। শরীর গোলাচ্ছে মতিনের।

এখন সবে সকালের মেজাজটা কেটেছে। দূর থেকে ওদের বাড়িটাকে দেখতে পেল সে। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে খুব ভুল হয়েছে। ইতিমধ্যেই জুতোর রং সাদাটে হয়ে গেছে। হঠাৎ হঠাৎ এইসব আবেগ যে কেন আসে? বাড়ির মুখে ছোট্ট মসজিদের ওপর মাইক বসানো দেখল মতিন। তাদের বাল্যকালে ওই মাইকটি ছিল না। ডান দিকের মাঠে চৈত্র মাসে জাম্বুরা নিয়ে ফুটবল খেলত ওরা। ওর সঙ্গে কারা? হরিপদ, অবনী, রাজু, কাউসার। কোথায় গিয়েছে ওরা তা তার জানা নেই। চল্লিশ বছর হয়ে গেল। একসময় ওই বয়সের মানুষকে বৃদ্ধ বলে মনে হত কিন্তু পঞ্চাশে পা দিয়েও মতিনের নিজেকে বৃদ্ধ বলে কিছুতেই মনে হয় না। বন্ধুবান্ধবেরা সেরকম কথাও বলে না।

বাড়ির সামনে গাড়িটাকে রেখেছে আলতাফ। ভিড়টা তার গায়ে। জনা দশেক মানুষ অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এদের অনেককেই মতিন চিনতে পারছে। আব্বার কাজের সময় পুরনো পরিচয় ঝালাতে হয়েছিল, যদিও এখন তার ওপর আবার ধুলো পড়ে গিয়েছে।

ভিড়ের সামনে পৌঁছে মতিন হাসল, 'কেমন আছেন সবাই?'

সঙ্গে সঙ্গে রিহার্সাল দেওয়া নাটকের অভিনেতাদের মতো একটা আওয়াজ একই সঙ্গে বেরিয়ে এল সবার মুখ থেকে। পৃথক করে শুনলে যার অর্থ হবে, আছি। একজন শুধু বলল, 'আসসালাম আলাইকুম।' মতিন বলল, 'ওয়ালাইকুম আসসালাম।'

তারপর ওরা আর কথা বলল না। পঞ্চাশ থেকে আশির মধ্যে বয়স নিয়ে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে মতিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এদের অধিকাংশের ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত, পায়ে চটি নেই। প্রত্যেকের শরীরে একটি মিল, কারও মেদ নেই। চামড়া এবং হাড়ের দোস্তি বড্ড চোখে পড়ছে। এইসব মানুষেরা মতিনের পরলোকগত পিতৃদেব হাজি খালেদ মোহম্মদের আশ্রিত, এই পাকা বাড়ির আশেপাশে যত মাটির ঘর সেখানেই এরা থাকে। যারা মুসলমান তারা ফজর থেকে মাগরিব নমাজ পড়ে। যাদের আরও ধর্মভাব তারা এশাকেও বাদ দেয় না। এখানকার গাছপালা, আকাশ, বাতাস, পানির ওপর এদের অবাধ অধিকার। শুধু অন্ন পর্যাপ্ত নেই। নেই যে সেটা এদের চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

এইসময় পেছন থেকে আলতাফের গলা ভেসে এল, 'আরে! এরা যে সব পুতুল হয়ে গেল। একটা চেয়ার এনে দিন। অদ্ভুত লোক সব।' সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরা প্রাণ ফিরে পেল যেন। ছুটাছুটি করে একের বদলে তিন তিনটে চেয়ার এনে বসাল আমতলায়। আলতাফ কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে গেল বাড়ির পেছন দিকটায়। তার কথাবার্তা এবং হাঁটাচলা এখন অন্যরকম। মানুষ কর্তৃত্বে থাকলে এরকম রুখো হতে পারে।

'আমারে চিনতে পারতেছেন ছায়েব?'

চেয়ারে বসে মতিন লোকটির দিকে তাকাল। না, সে চিনতে পারছে না। কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা কে জানে! সে বলল, 'হ্যাঁ, তবে...

'আমি কবির, দুলাভাই, মানে আপনার আব্বা আমারে জায়গা দিছিলেন।'

'ও। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনি মাকে আপা বলতেন।'

'ঠিক। তিনি ছিলেন একেবারে দেবীর মতো। আঃ কি সব দিন ছিল তখন।'

দেবী শব্দটা এখনও এখানে ব্যবহৃত হয়? মতিনের মনে পড়ল ওর স্ত্রী রেগে গেলে কাজের লোককে লক্ষ্মীছাড়া বলে গালাগাল দেয়। এই কবিরকে সে চিনতে পারছে না এখনও। তবে আব্বাকে যে দুলাভাই বলত সে নিশ্চয়ই খুব দূরের নয়। তখন কি এর এই রকম দড়ির মতো চেহারা ছিল?

'আপনার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে?'

'আর শরীর। আল্লার ইচ্ছা তাই এখনও বাইচ্যা আছি। কি খাইবেন কন? চা না ডাব?'

মতিন হাত নাড়ল, 'না না। আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না।'

কবির বলল, 'কন কি ছায়েব! আপনি হলেন গিয়া মেহমান। ডাবই আনি।' সে উঠল।

এই দুর্বল চেহারার বৃদ্ধ ডাব গাছে উঠবে নাকি! কিন্তু লোকটা ভিড়ের আড়ালে চলে গেল সট করে। এতক্ষণ কবির কথা বলছিল বলে অনেকেই মুখ খুলতে সুযোগ পাচ্ছিল না। দাড়িওয়ালা একজন এবার হাসল, 'আমারে চিনতে পারো?'

'করিমচাচা'—মতিনের মনে হল সে যেন ফুটবল ম্যাচে গোল দিয়ে ফেলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ পার্শ্ববর্তীদের উদ্দেশে মাথা নাড়ল, 'কী! আমি জানতাম ও আমারে চিনবে। এই করিমচাচার পিঠে পা রাইখ্যা আম গাছে উঠতা তুমি। এখন শুনি অনেক বড় হইছ। ঢাকায় নাম হইছে। আমি বলি তোমরা মতিসাহেব বল আর সার বল আমার কাছে সে মতিন।'

'নিশ্চয়ই।' মতিন হাসল। করিমচাচার অনেক কথা হুড়মুড়িয়ে আসছে মনে। আব্বার খুব প্রিয় ছিল এই করিমচাচা। আর মা দু'চক্ষে দেখতে পারত না। আব্বাকে লুকিয়ে লুকিয়ে আফিং এনে দিত লোকটা। মাঝে মধ্যে আফিং খাওয়ার শখ ছিল আব্বার। মায়ের অপছন্দ সেই কারণে।

'তোমার সেই উটটার কথা মনে পড়ে করিমচাচা?'

'জীবনে একবার তো উটের মাংস খাইছি। ভুলব ক্যামনে? তবে তুমি খুব কাঁদছিলা।'

'সেটা আপনার মনে আছে?'

ব্যাপারটা এইরকম। আব্বা একটা উট আনিয়েছিলেন। ঈদের সময় কুরবানি করবেন বলে তাকে ভাল খাওয়াবার দায়িত্ব ছিল করিমচাচার ওপর। মতিন তখন সাত বছরের বালক। করিমচাচার সঙ্গে ঘোরে আর উট দ্যাখে। অমন বদখত দেখতে প্রাণীটাও ধীরে ধীরে চোখ সওয়া হয়ে যাওয়ার পর ভাল হয়ে উঠল। আসলে মতিনের কথা শুনত উটটা। মতিন হাঁটতে বললে হাঁটত, মুখ নিচু করতে বললে সেটা করত। তারপর রোজার সময় এল। গ্রামসুদ্ধ মানুষ সেহরীর পর আর পানিস্পর্শ করে না। সারাদিন অভুক্ত থেকে মাগরিবের নমাজ পড়ে ইফতার করে। যদিও শিশু, অসুস্থ মানুষ, গর্ভবতী অথবা সদ্যপ্রসূতা এবং মুসাফিরদের রোজা করা বাধ্যতামূলক নয় তবু সাত বছর বয়সে মতিন প্রায়ই রোজায় থাকত। তার মাথায় হঠাৎ ঢুকল উটটা রোজা করছে না আর করিমভাই তাকে সেটা বোঝানো দূরের কথা প্রচুর খাওয়াচ্ছে। একদিন ফজরের পর মতিন এমনভাবে উটটার সঙ্গে লেগে রইল যাতে ও কিছু খেতে না পারে। করিমভাই তাকে যত বোঝায় আল্লা প্রাণীদের রোজা করতে নির্দেশ দেননি সে কানে নেয় না। তখন রেগেমেগে করিমভাই বলে

উটটাকে খাইয়ে মোটা না করলে ঈদের সময় ওর শরীরে মাংস জমবে না। এই নিয়ে খুব কান্নাকাটি শুরু করার পর আব্বা তাকে নিয়ে গিয়েছিল মাঠে। হাত তুলে গরু দেখিয়েছিল, তারা ঘাস খাচ্ছে। পাখিরা ফল ঠুকরাচ্ছে। যারা মানুষ নয় তাদের কাজকর্ম অন্য দিনের মত স্বাভাবিক। উটটাকে ওর মত থাকতে দেওয়া উচিত।

আজ এতদিন পরে ওই সব সরল কথা মনে আসতেই কি রকম বিষণ্ণ হয়ে গেল মতিন। সে নিজে কালেভদ্রে নমাজ পড়ে। বছরে ঈদের নমাজটা যা পড়া হয়। রোজার সময় রাস্তায় সিগারেট খায় না। কিন্তু নিজের অফিসঘরে বসে সিগারেট চা ঘনঘন ওড়ায়। এখন ঢাকায় অনেকেই রোজা রাখেন না এবং এটাকে অন্যায় বলে মনেও করেন না। মতিন নিজেকে অধার্মিক বলে কখনই মনে করে না।

'করিমচাচা! এখন আপনার অবস্থা কি রকম?'

'আছি এই পর্যন্ত। আল্লা যত দিন রাখবেন থাকব।'

'আপনার ছেলে মেয়ে?'

করিমচাচা আকাশের দিকে তাকাল। তারপর চোখের জল মোছার চেষ্টা করল।

প্রশ্ন করতে গিয়েও সামলে নিল মতিন। যেচে কারও দুঃখের কথা শুনে বিড়ম্বনা বাড়িয়ে লাভ কি! এইসময় কবির ডাব নিয়ে এল। কচি ডাব! এইসব শুকনো মুখগুলির সামনে বসে ডাবের জল খেতে তেমন ভাল লাগল না।

এইসময় তৃতীয় বৃদ্ধ খোলা গলায় বলল, 'বড়ো সাহেবের সঙ্গে কত মিল।'

সবাই মাথা নাড়তে লাগল কথাটায় সায় দিয়ে।

বৃদ্ধ আবার বলল, 'আমারে তুমি চিনতে পারো নাই।'

চুপসে যাওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে মতিনের স্মৃতি কোনও কাজ করল না।

'আমি যতীন। যতীন কৈবর্ত। মনে পড়ে?'

'আশ্চর্য! তুমি যতীনদাদা? কি চেহারা করে ফেলেছ?'

'আমি কি করছি। ভগবানের মার সাহেব, ভগবানের মার।'

'কি কর তুমি এখন?'

'কিছু না। বইস্যা বইস্যা খাই। আমার ছোট ছেলে গাজীপুরের দোকানে কাজ করে, মেয়েটা ঢাকার গারমেন্ট ফ্যাক্টরিতে যায়। ওরা টাকা দিলে পেটে ভাত পড়ে, না দিলে না।'

'এখন আর মাছ ধরো না?'

'মাছ কোথায় যে ধরব। বিল তো এখন বালুর চর। বাড়ির পুকুরগুলোয় হাত দেওয়া তিন মাস হইল নিষেধ। মাছও তেমন নাই।'

'নিষেধ কেন?'

এ ওর মুখের পানে চাইতে লাগল। কিন্তু কথা বলে না কেউ। মতিন বুঝল সত্যি কথাটা বলতে ভয় পাচ্ছে এরা। যৌবনে যতীন মাছ ধরত বলে বলে। কয় সের মাছ চাই সাহেব? দশ? জাল নিয়ে নেমে যেত পুকুরে। তারপরই দেখা যেত প্রায় সেই ওজনের মাছ ওর জালে। লড়াই করে খেলিয়ে তুলতে হিমসিম খেলেও জয় হত শেষ পর্যন্ত ওরই।

'আপনারা আমাকে নির্ভয়ে বলুন।'

এবার করিমচাচা কথা বলল, 'বড়সাহেব আমাদের জমি ঘর দিয়ে বলছিলেন নেমকহারামি করিস না কখনও। আমরা আজ পর্যন্ত সেটা করি নাই। তোমরা কেউ আসো না তবু এই বাড়িতে ধুলো জমতে দিই নাই আমরা। মাঠে লাঙল দিয়া যা উঠত তাই সবাই খাইত। পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরলে সেটা ভাগ হইত। আমরা সবাই জানি বড়সাহেবের জিনিস এগুলো আর আমরা হলাম পাহারাদার। কিন্তু—।'

'কিন্তু কি?'

'না, সাহেব। এটা বলা ঠিক না।'

হঠাৎ কবির বলে ফেলল, 'আলতাফ ছায়েবকে সবাই এখানে ভয় পায়।'

মতিন অবাক, 'আলতাফকে ভয় পায়। কি কাণ্ড? সে কি করল?'

কবির বলল, 'তিনি নিষেধ করেছেন পুকুরের পানিতে হাত দিতে। সামনের চাষের মরশুমের আগে তিনি স্থির করবেন চাষ হবে কিনা। কখনও তো কেউ আসতো না, হঠাৎ তিনি আসা যাওয়া শুরু করেছেন।'

'আপনারা ওর কাছে মাছ ধরার অনুমতি চাননি?'

'সাহস হয় নাই। ছোটছায়েব খুব রাগী মানুষ। এখানকার ইউনিয়ন পরিষদের নুরুউদ্দিন ভাই পর্যন্ত ওনারে ভয় পায়। তারে তো একবার বন্দুক দিয়া খতম কইর‍্যা ফেলত। সবাই বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করে।'

আলতাফের মাথা অল্পে গরম হয়ে যায় এখবর মতিনের অজানা নয়। কিন্তু সে কখনও তার সামনে বেয়াদপি দেখায়নি। এখানে আসা যাওয়া শুরু করার পর আলতাফ যে এমন কাণ্ড করে রেখেছে তা কে জানত। ওইটুকুনি ছেলে বন্দুক নিয়ে এখানে আসে নাকি। বন্দুক অবশ্য আব্বারও ছিল। মাঝে মধ্যে পাখি মারার কাজ ছাড়া সেটাকে ব্যবহৃত হতে দেখেছে বলে মতিনের মনে পড়ে না। একাত্তর সালের পর আব্বা সেটাকে থানায় জমা করে দিয়েছিলেন।

মতিন উঠে দাঁড়ালো। এইসব মানুজন আজ কোনও মতে বেঁচে আছে। অভাব এদের নিত্য সঙ্গী। অথচ এরা তার আব্বার আশ্রিত ছিল। আব্বার সঙ্গে যারা কখনও নিমকহারামি করেনি তাদের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করার সাহস আলতাফ পায় কি করে?

এবার করিমচাচা এগিয়ে এল সামনে, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'বলুন।'

করিমচাচা আশেপাশের মুখগুলোর দিকে তাকাল, 'ঠিক আছে, যাওয়ার আগে বলব।'

মতিন মাথা নাড়ল। সে দেখতে পেল আলতাফ কয়েকজনকে কিছু বোঝাতে বোঝাতে এদিকে আসছে। এখন ওকে দেখতে অন্যরকম লাগছে। খুব বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন ব্যবসায়ীদের চেহারা যেরকম হয়। যতদূর মনে হয় আজও সঙ্গে বন্দুক আনেনি। বন্দুক গাড়িতে থাকলে মতিন দেখতে পেত। তাহলে কি ওর সঙ্গে রিভলভার আছে। আলতাফ রিভলভার নিয়ে এখানে আসে? এটা তো এক কালে স্বৈরাচারী জমিদারেরা করত।

আলতাফ সামনে এসে দাঁড়াল, 'আপনি এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন? চলুন, একটু বিশ্রাম করে সব ঘুরে দেখবেন।' জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে আলতাফ পাশের পাকাবাড়ির বারান্দায় উঠে পড়ল। মতিনের মনে হল আলতাফ ঢাকায় তার সঙ্গে এভাবে কথা বলে না। এখন ওর ইচ্ছেটা অনায়াসে তার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। প্রতিবাদের ইচ্ছে হলেও এত মানুষের সামনে সেটা প্রকাশ করা ঠিক হবে না ভেবেই তিনি মতিন বাড়িটাতে ঢুকল।

সদ্য রং করা হয়েছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। একটা সুন্দর বিছানা, টেবিল চেয়ার এবং সোফা। বাথরুম লাগোয়া। আলতাফ বলল, 'আব্বা এ ঘরে থাকতেন। আপনি এখানে এলে যাতে অসুবিধে না হয় তাই ঠিকঠাক করিয়ে রেখেছি।'

'ভাল, খুব ভাল।' মতিন চেয়ারে বসল।

'এরা কি বলল আপনাকে?'

'সাধারণ কথাবার্তা। পুরনো দিনের পরিচয় নিয়ে আলাপ সালাপ।'

'শয়তানের দল সব। মিষ্টি কথা বললে পেয়ে বসে। আমি ঢাকায় জন্মেছি, ওখানে বড় হয়েছি বলে আমার সঙ্গে সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার করতে পারে না কিন্তু আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে চেষ্টা করবে।'

'শয়তান বলছ কেন?'

'বলব না? আমাদের জমিতে চাষ করছে সারা জীবন, ফসল ভোগ করছে নিজেরাই। পুকুরগুলো শুষে মাছ তুলে নিয়েছে। যখন আসতাম তখন ওসব করত, আমাদেরও দোষ ছিল এসে দেখিনি কিছু। কিন্তু আমি আসাযাওয়া শুরু করার পরও একই কাণ্ড? ওই যে জানলা দিয়ে পুকুরটা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে তিনশো রুই-এর বাচ্চা ছেড়েছিলাম। বলে গেলাম কেউ যেন জাল বা ছিপ না ফেলে। দুমাস পরে পরীক্ষা করে দেখলাম মাত্র কুড়িটা মাছ পুকুরে আছে। ভাল গলায় জিজ্ঞাসা করতে এমন ভান করল যেন কেউ কিছুই জানে না। তখন রাগ দেখালাম। গরমের মুখে পড়ে বলে ইউনিয়ন পরিষদের নুরুউদ্দিন সব জানে। সে

নাকি জাল দিয়েছিল। নুরুউদ্দিনকে ডেকে শাসাতে সে স্বীকার করল এদের দিয়েই কাজটা করিয়েছে। আর দেখুন কথায় কথায় আব্বার সঙ্গে এই সম্পর্ক ছিল, আব্বা কত ভালবাসত সেই কাহিনী বলে সিমপ্যাথি কাড়তে চায়।'

আলতাফের গলা চড়ছিল। এই গলায় সে মতিনের সঙ্গে কখনই কথা বলে না। তার কথাগুলোকে অস্বীকারও করা যাচ্ছে না। এতদিন ধারণা ছিল মানুষগুলো গরিব কিন্তু অসৎ নয়। এখন সেই হিসেব মিলছে না।

মতিন সিগারেট ধরাল, 'আসলে আব্বার সম্পত্তি ভোগ করে করে ওদের একটা অভ্যেস তৈরি হয়ে গিয়েছিল।'

'আব্বার সময় কি হয়েছিল তা আর ভাবার দরকার নেই। ঢাকায় আমাদের ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না। ব্যাঙ্কঋণ শোধ করতে পারছি না বলে সুদ বেড়ে চলেছে। অথচ আমরা তো টাকা রোজগারের জন্যেই শহরে গিয়েছিলাম। শহরের দেনা মেটাতে এখন গ্রামকে ব্যবহার করব।' আলতাফ বলল।

মতিনের মনে হল এর অনেকটাই তার উদ্দেশে বলা। ব্যবসা সে করে কিন্তু যাকে বলে প্রকৃত ব্যবসায়ী তা সে নয়। হলে ব্যাঙ্কের ঋণ কিছুটা শোধ করতে পারত। সেকথাটার প্রতিবাদ না করে বলল, 'এ ব্যাপারে কিছু ভেবেছিস?'

'হ্যাঁ'। পকেট থেকে একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বের করল আলতাফ, 'দেখুন এই হল আমাদের বাড়ি আর মসজিদ। এই ঘরটায় আমরা আছি। বাড়ির পাশে এটা হল এক নম্বর পুকুর। পিছনে দুটো বড় পুকুর পাশাপাশি। পুকুরের পর নিচু বিলের জমি। বিল তো শুকনো। বিলের তিনটে দিকে বাঁধ দিলেই এক একটা পুকুর তৈরি হয়ে যাবে। ওখানে ইতিমধ্যে আমি দুটো পুকুরের ব্যবস্থা করে ফেলেছি। তার মানে এখন আমাদের বাড়ির গায়েই পাঁচ খানা পুকুর। এই পুকুরে যদি আমি সিঙ্গাপুরী মাগুর, তেলাপিয়া, রুই ছাড়ি তাহলে তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে দশ থেকে কুড়ি গুণ টাকার মাছ তৈরি হয়ে যাবে। ধরুন পাঁচ পুকুরে কুড়ি হাজার টাকার মাছ অ্যাভারেজে পাঁচ মাসে প্রায় তিন লাখ টাকা রিটার্ন দেবে। বছরে দুবার এটা করব। ছয় লাখ ঘরে আসবে। পুকুর তো পড়ে আছে। এটা করতে নিশ্চয় আপনার আপত্তি নেই?'

মতিন বলল, 'তুই যেভাবে অঙ্কটা বলছিস সেটা শেষ পর্যন্ত মিলবে?'

'আমি আপনাকে কম করে বললাম।' আলতাফ অনেকক্ষণ পরে হাসল।

'কিন্তু তুই তো বললি চুরি হয়ে গিয়েছে।'

'আর হবে না। এরা সবাই বুঝে গিয়েছে আমি যা বলি তাই করি। কেউ অন্যায় করলে তাকে দয়া, মায়া, মমতা দেখাই না। এখন এরা আমাকে ভয় পাচ্ছে। চুরি করতে সাহস পাবে না।'

'কিন্তু [illegible] দেখিয়ে কতদিন কাজ হয়?'

'এদের এখানে হবে। সপ্তাহে দু'দিন আসব আমি। আপনি মাপে আসুন।'

'হুম।'

'তারপর, এই দেখুন, মোটামুটি যে চাষের খবর আমি পেয়েছি তাতে ঠিকঠাক লাঙল দিলে আর কোন চিন্তা থাকবে না। তবু সব জমি কোথায় কিভাবে আছে তা আমার জানা নেই। আব্বা আপনাকে কিছু বলতেন না?'

'না, সম্পত্তির ব্যাপারে তিনি কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না।'

'ওই তো মুশকিল। আমি তখন ছোট ছিলাম। আপনাকে বলে গেলে আজ এত প্রব্লেম হত না। ওই যে, ওইটে হল আব্বার আলমারি। কি আছে ওর ভেতর আমি জানি না। আজ আপনি একটু খুলে দেখুন।' আলতাফ ঘরের এককোণে জোড়া বড় কাঠের আলমারিটাকে দেখাল।

আব্বার এই আলমারিটা মতিনের চেনা। ওখানে কারো হাত দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। আলমারির গায়ে একটা বড় তালা ঝুলছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'তালাটা খুলব কি করে?'

'চাবি যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন ভেঙে দেখতে হবে।'

'এখানে তালা খোলার লোক পাওয়া যাবে না?'

আলতাফ হাসল, 'ঢাকার রাস্তায় যারা চাবির তোড়া নিয়ে ঘোরে তারা এখানে নেই। যে খুলতে পারত সে ছয় মাস হল জেলে। আমি খোঁজ নিয়েছিলাম।'

'ঠিক আছে। চল, বাড়িটাকে ঘুরে দেখি আগে।' মতিন দরজার দিকে এগোল।

ঘাস কম, লালমাটি এখন শক্ত। বাড়ি তৈরি হয় এই মাটিতেই। সিমেন্টের চেয়ে শক্ত হয়ে বসে। ডানদিকের পুকুরে এখনই অনেক ছায়া। পাশে দাঁড়িয়ে আলতাফ বলল, 'সব মাছ তুলে নিয়েছে ওরা।'

'নিষেধ যখন করেছিস তখন আর করবে না।'

'আমার বিশ্বাস নেই।'

মতিন আর একটু এগোতেই চমকে উঠল। বিল কোথায়? ধু ধু করছে একটা মরা মাঠ। নিচু সেই মাঠে আগাছার মত কিছু জন্মেছে। দূর, বহুদূরে দু-একটা গাছের আভাস। সে বলে উঠল, 'আমাদের বিলের এখন এই অবস্থা?'

'হ্যাঁ।'

'নদীতে পানি কমে যাওয়ায় বিলে পানি জমে না?'

মতিনের প্রশ্ন শুনে আলতাফ খানিকটা দূরে দাঁড়ানো জনতার দিকে তাকাল। এরা তাদের অনুসরণ করে আসছে। আলতাফ হাত নাড়ল, 'অ্যাই ভোলা! এদিকে আয়।'

যে লোকটি এগিয়ে এল তার চেহারা এদের সঙ্গে মেলে না। চওড়া কাঁধ, মুখে কাটা দাগ, শরীরের গঠনটিও মজবুত। পরনে টেরিলিনের পাঞ্জাবি এবং লুঙ্গি।

'বলেন সার।' ভোলা সামনে এসে দাঁড়াল।

'বর্ষাকালে বিলে পানি হয়?'

'হয় তবে নৌকা ভাসানো যায় না।'

'কেন?'

'হাঁটু তক ওঠে না।'

'সর্বনাশ।' মতিন বলল, 'এককালে সমুদ্র বলে মনে হত। দুর্গাদাসদা ছাড়া কারও হিম্মত ছিল না বর্ষায় ওপারে যাওয়ার। এখন দেখলে সেটা অবাস্তব বলে মনে হবে।'

'এই ভোলাকে চিনতে পারছেন?'

মতিন আবার লোকটার দিকে তাকাল। এখানকার মানুষগুলোর সঙ্গে চেহারায় কোনও মিল নেই। বোঝাই যায় বেশ শাঁসে জলে আছে। সে মাথা নেড়ে না বলল।

'আমার বাপের নাম দুর্গাদাস।' ভোলা হাসল।

'তাই নাকি? আরে, কি কাণ্ড।' মতিন আরও অবাক।

আলতাফ বলল, 'ওর হিস্ট্রি চমৎকার। ডাকাতি করত। এদিকে ওর ভয়ে সবাই কাঁপত। অ্যাই, তুই বল না নিজের মুখে। আমি একটু ঘুরে আসছি।'

আলতাফ যেদিকে গেল সেদিক থেকে শীর্ণ চেহারার একজন আসছিল। আলতাফ তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

'তুমি ডাকাতি করতে?' মতিন ভোলার দিকে তাকাল।

'ওসব অনেকদিন আগের কথা সার। অল্প বয়সে খারাপ পাল্লায় পড়েছিলাম।' ভোলা লজ্জা পেল যেন।

'কদ্দিন করেছ ওসব?'

'আট দশ বছর। তখন এই বিল ভরা থাকত।'

'এই বিলেই ডাকাতি করতে?'

'ডাকাতির জন্যে এর চেয়ে আর ভালো জায়গা কোথায় স্যার। বাপের কাছে নৌকা চালানো শিখেছিলাম ভালো। তখন বলছিলেন না বর্ষায় বাপ ছাড়া কেউ ওপারে যেতে পারত না। আপনি তো আমাকে দ্যাখেননি। একা দু-দুটো নৌকা নিয়ে পার হয়েছি।'

'একা দু-দুটো নৌকা মানে?'

'এই ডাকাতির পর মানুষদের জলে ফেলে দিলে নৌকাটাকে আমাকেই নিয়ে যেতে হত।'

'তোমার বাবা এসব জানত?'

'হুম। বুড়ো সেই থেকে আমার সঙ্গে কথা বলে না।'

'দুর্গাদাস কেমন আছে?'

'আছে। ওই হিন্দুপাড়ায় থাকে।' ডানদিকে কিছুটা দূরে গাছগাছালির মধ্যে মাটির ঘরগুলোকে দেখাল ভোলা, 'বড় সাহেবকে যেদিন কবর দেওয়ার জন্য আপনারা এখানে আনলেন সেদিন একটা ষাঁড় ওকে এমন গোঁতায় যে তিন দিন হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে ছিল। জ্ঞান হবার পর তার একটাই আফসোস, কবরে যাওয়ার সময় বড় সাহেবের মুখ দেখতে পায়নি।'

'তুমি কি এখনও ডাকাতি কর?'

দ্রুত মাথা নাড়ল ভোলা। 'না-স্যার। ওসব অনেককাল ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি কালিগঞ্জে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য।'

'কি করে হল ব্যাপারটা?'

'আমার স্টোরি কেউ যদি লিখত তা হলে সেটা বায়োস্কোপ হয়ে যেত।'

'তুমি বায়োস্কোপ শব্দটা দেখছি জান।'

'ছেলেবেলায় শুনতাম। সিনেমা বললে ফুড়ুত করে শেষ হয়ে যায়। বায়োস্কোপ অনেক ভারী।' ভোলা হাসল। মতিন দেখল দু'টো লোক বাড়ির দিক থেকে দু'খানা চেয়ার মাথায় নিয়ে এদিকে আসছে। ওরা দাঁড়িয়ে আছে বিলের বাঁধের ধারে গাছের ছায়ায়। লোক দু'টো সেখানে চেয়ার পেতে দিতেই ভোলা বলল, 'বসুন স্যার। বিলে পানি নেই, কিন্তু হাওয়া আছে, আরাম হবে।'

এরকম খোলা আকাশের নিচে গাছের ছায়ায় ভর দুপুরে চেয়ার পেতে বসলে যে কি আরাম তা ভাল করে অনুভব করতে পারছিল না মতিন ভোলা সামনে দাঁড়িয়ে থাকায়।

সে চেয়ারে বসে বলল, 'দুর্গাদাস বিলের ডাকাতদের যম ছিল। কত ডাকাত যে সে ধরেছে তার ইয়ত্তা নেই। একবার দারোগাবাবু তাকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। তার ছেলে হয়ে তুমি এই বিলে ডাকাতি করে বেড়াতে এ আমি ভাবতে পারছি না।'

'সার। অতীতে অন্যায় করেছি বলেই এখন মানুষের ভাল করার চেষ্টা করি। বাপের তো নৌকা ছাড়া কিছু ছিল না। বড় সাহেবের দয়ায় সংসার চলত। আমার বুনের বিয়ার ঠিক হল মুন্সিগঞ্জের কালু কৈবর্তের ছেলের সঙ্গে। বিয়ের দিন এসে তারা দু হাজার টাকা নগদ চাইল। বাবা অনেক অনুরোধ করেছিল, পা ধরেছিল তবু দেড় হাজারের নিচে নামল না কালু। তখন বড় সাহেব ঢাকায়। হাত পাতার মত কেউ নেই। কালু বিয়েবাড়ি থেকে ছেলে তুলে নিয়ে মুন্সিগঞ্জে ধাওয়া হতেই আমার মাথায় খুন চেপে গেল। বাপের নৌকো নিয়ে পেছনে রওনা করলাম। তিন নৌকোয় লোক এসেছিল। তখন সন্ধ্যারাত পার হয়ে গিয়েছিল। কালুর নৌকোয় লাঠি নিয়ে লাফিয়ে পড়লাম মাঝ বিলে। ওরা ভাবল ডাকাত। বাকি দুটো পালাল

যে যেদিকে পারে। কালুকে জলে ডোবালাম, ছেলেটাকেও। ঠিক তখনই আর একটা নৌকো আমাদের ওপর চড়াও হল। কালুর নৌকোর মালপত্র তুলে নিয়ে আমাকেও বেঁধে ফেলল তারা। আব্বাস ডাকাতের তখন খুব নাম। সে ভেবেছিল আমি তার এলাকায় ডাকাতি করছি। কিন্তু সব শুনে সে বলল, 'যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে কিন্তু তোমাকে বাবা এখন থেকে নৌকায় থাকতে হবে। এই হরেন মৃধা, এর শালা ডাকাতিতে মন নাই, এরে গ্রামে নিয়ে যাও। বুনের সঙ্গে বিয়া দাও আজই। ছেলেটা ভাল। এরে ত্যাগ করতেছি, তোমারে চাই।' ভোলা হাসল. 'ব্যস! ওই শুরু হয়ে গেল। আমার বুন লগ্নভ্রষ্টা হল না বলে বাবা খুশি হয়েছিল। হরেন তাকে নিয়ে গিয়েছে নিজের বাড়িতে। কিন্তু পরে যখন বাপ জানতে পারে ও একসময় আব্বাসের দলে ছিল তখন থেকে আর মুখ দেখে না। বুনও আর বাপের কাছে আসতে পারে না। না পারুক, কিন্তু ওরা সুখে আছে। আমার ওপর তার কোনও রাগ নেই। হরেন এখন মুদির দোকান চালায়।'

'তোমাকে কখনও পুলিশ ধরেনি?'

'তিনবার। দু'বার তারা ধরেছিল। ছয় মাস আর দেড় বছর জেল হয়। থার্ড টাইম আমি নিজে ধরা দিই। আড়াই বছর জেলে ছিলাম। সেই শেষ।'

'নিজে ধরা দিয়েছিলে কেন?'

'তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। খানসেনারা নেই। শেখ সাহেব অল্পদিন হয় ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কিন্তু দেশে শান্তি হয়নি। যে যেভাবে পারে কামাই করে নিচ্ছে। সেই সময় আতাউর হোসেন সাহেব খুন হন। কে খুন করে কেউ দ্যাখে নি। আতাউর হোসেন সাহেবকে মানুষ খুব শ্রদ্ধা করত। ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন তিনি। আওয়ামি লিগ করতেন। যুদ্ধের সময় আমাদের বলেছিলেন, তোরা ডাকাতি করিস আর যাই করিস দিনে দুবার জয়বাংলা বলবি। বাংলা মা এখন বিপদে, খানসেনারা তার ওপর অত্যাচার করছে, ওদের সাহায্য করিস না। আমি কথাটা শুনেছিলাম।

সেই মানুষ স্বাধীনতার পর খুন হয়ে গেল কিন্তু পুলিশ কাউকে ধরতে পারল না। আমি খবর নিতে লাগলাম। পুলিশ যা পারে না তা আমরা অনেক সময় পারি। লোকটাকে খুঁজে বের করতে দেরি হল না। সে এমন চালাক যে কোনও প্রমাণ রাখেনি। কোনও মামলা টিকবে না। আমি নিজেই লোকটাকে খুন করলাম। পুলিশ আমাকেও ধরতে পারল না। রাজাকারটাকে খুন করে মনে হল ভাল কাজ করেছি, তাই নিজেই ধরা দিলাম। সাক্ষীর অভাবে আমার অল্পদিন জেল হল। জেল খেটে বেরিয়ে এসে সেই যে ডাকাতি ছাড়লাম আর ও পথে যাইনি। এখন মানুষের জন্যে কাজ করি।'

'তুমি নিজে কত খুন করেছ?'

'হিসেব করিনি। তবে মুক্তিযুদ্ধের সময় কত খানসেনা মেরেছি তার ইয়ত্তা নেই। তাদের কাটা মুণ্ড নিয়ে ফুটবল খেলেছি।'

'সেকি?'

'চমকাচ্ছেন কেন। শালারা আমাদের দেশে যে অত্যাচার করেছে তার তুলনায় আমি তো কিছুই করিনি। রাত্রে নৌকো বাইতাম মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করব বলে। তারা যেসব গল্প বলত তা শুনে রক্ত গরম হয়ে যেত। দিনে একটা খানসেনা খুন না করলে আমি ঘুমোতে পারতাম না। ওই যে ছোট সারের সঙ্গে যিনি কথা বলছেন, মুজিব ভাই, উনি সব জানেন।' ভোলা বলল।

'উনি কে?'

'মুজিবভাই-এর নাম শোনেননি? ফ্রিডম ফাইটার।'

'এখন কি করেন?'

'কিছু না। ছাত্র পড়ান। দশ বিশ যা পান তাই দিয়ে চলে। অথচ উনি ইচ্ছে করলে এখান থেকে সাংসদ নির্বাচিত হতে পারতেন। তামাম মানুষ ভোট দিত ওঁকে।'

ভোলা যখন একথা বলছিল তখন ওদিকে উত্তেজনা দেখা গেল। আলতাফই উত্তেজিত, তাকে চিৎকার করে বলতে শোনা গেল, 'আমার ব্যাপারে আপনি নাক গলাবেন না। আমার বাড়ি, আমার ব্যবসা, আমি যেমন ভাল বুঝি সেভাবেই বানাব।'

ভদ্রলোক নিচু গলায় কি বললেন তা এতদূর থেকে বোঝা গেল না।

মতিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'আলতাফ।' তার গলা উঁচুতে উঠল।

ভোলা বলল, 'ছোট সারকে ঠাণ্ডা হতে বলুন সার।'

'এই মাত্র আপনার পরিচয় পেলাম। কোন বাড়ি আপনার?'

'এই বড় রাস্তার ওধারে। বাড়ি বলা উচিত নয়, মাথা গোঁজা যায় আর কি! আপনি ঢাকায় থাকেন তাই এতকাল যোগাযোগ হয়নি। আমিও একটু অলস।'

মুজিবর হাসলেন। শীর্ণ চেহারা হলেও প্রৌঢ় মানুষটির মুখে নম্র ছাপ আছে।

মতিন আলতাফকে জিজ্ঞাসা করল, 'চেঁচাচ্ছিলি কেন?'

'কি বলব? আমরা পয়সা খরচ করে ব্যবসা করছি। এখানে দান করতে তো আসিনি। আর ইনি সেই কথাটা বুঝতে পারছেন না।' আলতাফ বলল।

'ব্যাপারটা কি হয়েছে?'

মুজিবর বললেন, 'ব্যাপারটা খুব সাধারণ, আমি বলছি। আপনার আব্বা এখানে কিছু পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন যাদের এখন কিছু করে খাওয়ার ক্ষমতা নেই। এতদিন তারা আপনাদের সম্পত্তির ওপর নির্ভর করে কোনমতে

বেঁচে ছিল। আমরা বাংলাদেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম। খান সেনাদের তাড়াতে পেরেছি কিন্তু অভাবকে পারিনি। উনি মাস তিনেক আগে এসে হুকুম করেছেন কেউ যেন জমি বা পুকুরে হাত না দেয়। এটা বলার অধিকার ওঁর নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমি এই সঙ্গে মানবিক দিকটা ভেবে দেখার অনুরোধ করছিলাম।'

মতিন হাত তুলে মুজিবরকে থামিয়ে বলল, 'দেখুন, আব্বার সময়টার সঙ্গে এখন কোনও মিল নেই। তখন যা সম্ভব হত এখন সেটা অবাস্তব। ওঁরা তো অনেক দিন আমাদের সম্পত্তি ভোগ করেছেন আমরা কিছু বলার চেষ্টাও করিনি। কিন্তু এখন আমাদেরই অর্থের প্রয়োজন। আমরা ব্যবসা করতে চাই এখানে। আর সেই প্রয়োজনেই পুকুরগুলো দরকার। আপনি নিশ্চয়ই সমস্যাটা বুঝতে পারছেন।'

'পারছি। কিন্তু এতকাল যারা আপনাদের সম্পত্তি পাহারা দিয়ে এল তাদের প্রতি আপনাদের কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত।'

'উচিত। আমার ক্ষমতা নেই এতগুলো পরিবারকে বসিয়ে খাওয়ানোর।'

'আমি সেকথা বলছি না। আপনারা ওদের ব্যবসার কাজে লাগান।'

'কিছু মানুষকে নিশ্চয়ই কাজ দেওয়া হবে।'

'কিন্তু আপনার ভাই বলছেন যে ওদের তিনি বিশ্বাস করেন না। দরকার হলে ঢাকা থেকে কর্মচারী নিয়ে আসবেন। আমার আপত্তি এখানেই।' মুজিবর বললেন।

'আপনি আপত্তি করার কে?' ফস করে জিজ্ঞাসা করে আলতাফ।

মুজিবর বললেন, 'আমি আপনাদের প্রতিবেশী। এই মানুষগুলোকে অনেকদিন থেকে চিনি। যেহেতু এদের ভাল হলে আমার ভাল লাগে তাই—।'

আলতাফ বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকাল। মুজিবরকে উপেক্ষা করে দূরে দাঁড়ানো একজনকে হুকুম করল, 'হাত জাল নিয়ে আয়। একটা রুই ধরতে হবে।' লোকটা দৌড়ে চলে যেতেই মুজিবরের দিকে ঘুরে বলল, 'ওই পুকুর ভর্তি মাছ ছিল। সেসব যখন চুরি হয়ে যায় তখন আপনি কোথায় ছিলেন? ব্যবসা করতে গিয়ে কখন কাকে দিয়ে আমরা কাজ করাব সেটা আমরাই ঠিক করব।'

'একশোবার করবেন। আমি শুধু আমার আপত্তিটা জানিয়েছি। আর একটা কথা—।'

'বলে ফেলুন।' আলতাফ যেন কথা শেষ করতে চায়।

'আপনি তো এখানকারই ছেলে। সবাই আপনার আব্বাকে দেখেছে, আপনার আম্মাও এদের পরিচিত। তাই এদের কাছে আসার সময় রিভলভার নিয়ে আসার কোনও প্রয়োজন নেই। ওটা আপনি বহন করবেন না। মানুষকে অকারণে ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ হয় না। ওদের সঙ্গে তো সেই সম্পর্কও আপনাদের নয়।' মুজিবর হাসলেন।

মতিন দেখল আলতাফ যেন হঠাৎই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। অন্তত মতিনের

সামনে এই প্রসঙ্গ উঠবে তা সে আশা করেনি। কিন্তু দ্রুত সেটা কাটিয়ে সে গলা তুলল, 'আশ্চর্য। আপনাকে এই খবর দিল কে? এই তো আজ আমি ঢাকা থেকে এসেছি, আমার সঙ্গে রিভলভার আছে? দেখুন, হাত দিয়ে দেখুন।' সে রাগী ভঙ্গিতে শার্ট ওপরে তুলে দেখাল। কোমরে কিছু গোঁজা নেই। সে যেভাবে পকেট চাপল তাতে বোঝা গেল পকেটেও ওটা থাকতে পারে না।

'অনেক ধন্যবাদ। গতবার আপনি এনেছিলেন। অনেকেই সেটা দেখেছে। আপনি হয়তো নিছকই ভয় দেখানোর জন্যে এনেছিলেন, তবু কখন যে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে তা কে বলতে পারে। আপনি কি জানেন এরা সবাই আপনাকে খুব ভয় পায়?'

'ভয় না পাওয়ালে এদের দিয়ে কাজ তোলা যাবে না', আলতাফ এগিয়ে গেল। সেই লোকটি ততক্ষণে জাল নিয়ে ফিরে এসেছে। আলতাফ তাকে বলল, 'চল। ওই পুকুরে জাল ফেলে ঠিক একটা দেড়কেজি মাছ মারবি। তোর বাপের মত দশ কেজি চাই না।'

লোকটা ঘাড় নেড়ে এগোতে লাগল, পেছনে আলতাফ। মতিনের মনে হল যতীন কৈবর্তের সঙ্গে লোকটার চেহারার বেশ মিল আছে। অথচ যতীন বলছিল ওর ছোট মেয়ে টাকা পাঠালে তার খাবার জোটে। তাহলে এ কি করে?

এইসময় মুজিবর বললেন, 'আচ্ছা। আমি তাহলে যাই।'

'না,' মতিন মাথা নাড়ল, 'আপনার যদি খুব অসুবিধে না হয় আমার সঙ্গে একটু কথা বলুন। আসুন না ওই গাছের নীচে।'

মুজিবর হাসলেন, 'অসুবিধে কিসের। চলুন।'

ওরা গাছের নীচে ফিরে এলে মতিন মুজিবরকে বসার জন্যে ইঙ্গিত করল। ভোলা ওদের সঙ্গেই আছে। তার বসার যেন প্রয়োজন ছিল না। পাশাপাশি বসে মতিন বলল, 'আমার ভাইকে আপনি ভুল বুঝবেন না। ওর মাথা একটু গরম।'

'সেটা আমি বুঝেছি।'

'আমি ঢাকায় ওর এক চেহারা দেখি, এখানে অন্য রূপ দেখছি। আসলে ও খুব সিরিয়াসলি ব্যবসা করতে চাইছে। আমার আব্বার যারা আশ্রিত তারা এখন বেশ বয়স্ক মানুষ। ব্যবসার কাজে ওরা তেমন সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আমি তো কাউকে চলে যেতে বলিনি।' মতিন বলল।

'সেটাই তো সমস্যা। আপনারা ব্যবসা করবেন অন্য লোকের সাহায্যে। তাদের মাইনে দেবেন। আর ওরা আপনাদের সামনে শুকিয়ে থাকবে। এটা কি ভাল দেখাবে?'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু উপায় কি? আপনি কি করতে বলেন?'

'যাদের শরীরে শক্তি আছে তাদের দিয়ে কাজ করান। বাকিদের বলুন মাছ

যাতে চুরি না যায়, ফলন যাতে ঠিক থাকে সেটা নজর রাখতে। তারপর যখন লাভ হবে, তখন লাভের একটা সামান্য অংশ ওদের দিয়ে দিন যাতে সারা বছর খেয়ে পরে বাঁচতে পারে।' মুজিবর বললেন।

মতিন মাথা নাড়ল, 'আপনার প্রস্তাব খুব ভাল। বসে বসে যদি সবাই খায় তো রাগ হবেই।'

মুজিবর বললেন, 'আচ্ছা, এখন আমি উঠি।'

মতিন বলল, 'ঠিক আছে। খোদা হাফেজ।'

'খোদা হাফেজ।' মুজিবর চলে গেলেন।

মতিন শুকনো বিলের ওপর নজর লাগাল। এখন দিগন্তে গাছপালার রেখা দেখা যাচ্ছে। বোনের শ্বশুরবাড়ি ঠিক কোন জায়গায় ছিল সে ঠাওর করতে পারছিল না। অনেকদিন পরে এখানে এসে তার বেশ ভাল লাগছিল। শরীর মনে এক অন্যরকম আরাম অনুভব করছিল সে। ভোলা দাঁড়িয়ে ছিল পাশে, চুপচাপ।

মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার এখন চলে কি করে?'

'আমার? চলে যায়। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে রোজগার তো হয়ই।'

'সদস্য হিসেবে রোজগার হয়?'

'মিথ্যে বলব না। সবাই যখন রোজগার করছে আমি কেন চুপ করে থাকি।'

মতিন বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। সে দেখল একটা বাচ্চা ছেলে চায়ের কাপ প্লেট নিয়ে অতি সন্তর্পণে হেঁটে আসছে। অর্থাৎ তার জন্যে চা হচ্ছে। ছেলেটার পেছনে চার পাঁচজন বয়স্ক মহিলা ধীরে ধীরে আসছিল।

মতিন বিড়বিড় করল, 'আবার চা কেন?'

'খান সার। গ্রামের চা অবশ্য দুধের চা।' ভোলা বলল, 'আমি একটু ছোট সারের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

ভোলা চলে যাওয়ামাত্র ছেলেটি সামনে এসে নীরবে কাপ-ডিশ তুলে ধরল। ইতিমধ্যে অনেকখানি চা চলকে পড়েছে প্লেটে। মতিন ওটা নিয়ে প্লেটের চা মাটিতে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি নাম তোমার?'

'লিটন।' বলেই ছেলেটা দৌড়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে ফিরে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে মতিন বুঝল ভোলার কথাই ঠিক। ছেলেবেলায় মা অনেক বায়না ধরলে এইরকম চা মেশানো দুধ দিতেন। অমৃত মনে হত তখন। এখন গলা দিয়ে নামছে না। সে দেখল পাঁচজন মহিলা খানিকটা দূরে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে এগিয়ে গেল কাপ হাতে নিয়ে, 'আপনারা কি আমাকে কিছু বলবেন?'

প্রশ্নটা করা মাত্রই একজন শব্দ করে কেঁদে উঠে ময়লা আঁচল চোখে চাপা দিল। সেটা কানে যাওয়ায় কান্না ছড়াল দু-তিনজনের গলায়।

মতিন অপ্রস্তুত। সে লক্ষ করল এরা প্রত্যেকেই বিধবা। ওদের সামলে নিতে

কিছুটা সময় যেতে দিল সে। এই অবস্থায় চা খাওয়া যায় না। সে কাপ থেকে চা ফেলে দিল।

'চা ভাল হয় নাই, না?' পঞ্চমজন প্রশ্ন করল। তার গলায় কান্না আসেনি।

'না। ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।'

'আর এক কাপ বানাবো?' পঞ্চমজনকে এবার অনেক কমবয়সী বলে মনে হল।

'না। বলুন, আপনারা কি আমাকে কিছু বলবেন?'

এবার প্রথমজন মাটির দিকে তাকাল।

মতিন হাসল। পরিবেশটাকে হাল্কা করার জন্যে বলল, 'দোষ আমার। অনেকদিন এখানে না আসায় সবাইকে চিনতে পারছি না। আচ্ছা, আপনার পরিচয় দিন।'

প্রথমজন চোখ মুছল আবার। ধরা গলায় বলল, 'আমি তোমার ধাই মা।'

'ধাই মা?' চমকে উঠল মতিন।

পঞ্চমজন বলল, 'আমিনা খালা আপনার জন্মাবার সময় কাজ করছিলেন। তখন তো এ গ্রামে হাসপাতাল ছিল না। বাড়িতেই বাচ্চা হত।'

এসব তথ্য মতিন জানে। সে হয়েছিল মাঝরাত্রে, বৃষ্টির মধ্যে। গ্রামে তখন ডাক্তার নেই। একজন কবিরাজ ঘরের দাওয়ায় বসে ছিলেন। আমিনা নামের এক ধাই তার পৃথিবীতে আসার পথে সাহায্য করেছিল। মায়ের কাছে এই গল্প সে অনেকবার শুনেছে। এই বৃদ্ধা মহিলাই তাহলে সেই আমিনা। মতিন চঞ্চল হল। যিনি পেটে ধরেন, জন্ম দেন তিনি যদি গর্ভধারিণী মা হন যিনি পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করেন তিনি ধাই মা হিসেবে পরিচিত হন। অর্থাৎ তিনিও এক ধরনের মা। বৃদ্ধাকে তার প্রণাম করা উচিত।

'ওই বয়সের কথা কারও মনে থাকে না।' প্রথমজন নিচু গলায় বলল।

'আপনি কি আমাদের বাড়িতেই থাকেন?'

'আর কোথায় যাব, বাবা? সারাজীবন তো এই বাড়িতেই আছি। কথাগুলো ভারী নিশ্বাস-জড়ানো।

বৃদ্ধা কথা শেষ করামাত্র দ্বিতীয়জন বলে উঠল, 'ছোট সাহেব এখন আসতেছেন কিন্তু তার যা রাগ, কোনও কথা বলতে সাহস হয় না। আপনি আসছেন, আপায় কইল, বড় সাহেবের লগে মিল আছে আপনার। তাই—।'

'আপনার পরিচয়?' মতিন জিজ্ঞাসা করল।

'পরিচয় আর কি দিমু সাহেব। কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই বইল্যা পইড়া আছি এখানে।' এই বৃদ্ধার গলায় ঝাঁঝ আছে। কথা বাড়ালে আরও অনেক কিছু শুনতে হতে পারে।

সে ছোটর দিকে তাকাল, 'আপনারা মনে হচ্ছে আমাকে কিছু বলবেন। বলুন, কি বলতে চান?'

ছোট বলল, 'ও আপা আপনি বলেন না।'

বড় বলল, 'শরম লাগে।'

দ্বিতীয়জন মুখ করল, 'শরম? তুমি ওর ধাই মা, জন্ম দেখছ, ওর কাছে শরম কইর‍্যা কি লাভ? ও তো তোমারই পোলা।'

'তুমি কি বাবা আজ এখানে থাকবা?' বড়জন প্রশ্ন করল।

'না। আজই ফিরে যেতে হবে।'

'অ।'

এইসময় কবিরকে দেখা গেল। দ্রুত পা ফেলে আসে। দূর থেকেই সে চিৎকার শুরু করে দিল, 'আরে করো কি তোমরা? ওনারে ছাইড়্যা দাও। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব আইছেন দেখা করবার জন্য, ছাইড়্যা দাও।'

ছোটোজন বলল, 'হইয়্যা গেল। মেয়ে মানুষের কপালই এই রকম। আপনার সঙ্গে যে আপার কথা ছিল। কখন শুনবেন?'

মতিন মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, যাওয়ার আগে শুনব।'

ততক্ষণে কবির এসে গিয়েছে, 'আসেন। মেছবাহউদ্দিন সাহেব আইছেন।'

'কে তিনি?' মতিন মুখ ফেরাল।

'ওই যে কইলাম। কালীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব। আপনি আইছেন গেরামে, মানুষটা ভালো তাই আইস্যা পড়ছেন।'

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না মতিনের। কিন্তু তার মনে পড়ল ইউনিয়ন পরিষদের কে এক নুরুউদ্দিনের সঙ্গে নাকি আলতাফের ঝামেলা হয়েছিল। বন্দুক নিয়ে মারতে গিয়েছিল সে। এখন মিটমাট হয়ে গেলেও মেছবাহউদ্দিন নিশ্চয়ই ব্যাপারটাকে পছন্দ করেননি। সে কবিরের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। বিধবারা দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। কলাগাছে সাদা কাপড় জড়ালে যেরকম লাগত ওদের সেরকমই দেখাচ্ছে। এরাও কিছু বলতে চায় তাকে।

এরা ঠিক নয়, তার ধাই মা, যিনি তাকে পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করেছিলেন তিনি। মতিনের মনে হল ঢাকায় বসে অনেক কিছু ব্যাপার নিয়ে রোমান্টিক ভাবনা ভাবতে ভালো লাগে কিন্তু বাস্তবে সেই ব্যাপারটা হয়তো সম্পূর্ণ বিপরীত।

বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে পুকুরের দিকে নজর গেল। আলতাফ মাছ তোলাচ্ছে। কিছু ছেলেবুড়ো পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছে। যতীন কৈবর্তের মতো দেখতে ছেলেটা জাল ফেলেছে। পুকুরের ধারে দাঁড়ানো আলতাফ চেঁচিয়ে বলল, 'ঠিক দেড় কেজি, তার বেশি যেন ওজন না হয়।' মতিন দাঁড়াল না।

মতিনকে দেখতে পেয়ে ভোলা এগিয়ে এল, 'আসুন সার। ইনি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।'

ভোলার কথাবার্তার ধরন এখানকার সঙ্গে মেলে না। ব্যাপারটা পরে জানতে হবে। মতিন দেখল একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক মাথা নোয়াচ্ছেন, 'অসসালাম্ আলাইকুম।'

মতিন বলল, 'ওয়ালাইকুম আসসালাম।'

'আমি মেছবাহউদ্দিন আহমেদ। এখানকার মানুষ আমাকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বানিয়েছে। আপনি এসেছেন শুনে মনে হল একবার দেখা করা দরকার। কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'বিন্দুমাত্র নয়। অনেকদিন পরে এসে ভালোই লাগছে। বসুন।' গাছের তলায় তখনও পড়ে থাকা চেয়ারগুলো দেখাল মতিন।

মেছবাহউদ্দিন বসলেন। তাঁর পাশে মতিন। ভোলা দাঁড়িয়ে ছিল। মেছবাহউদ্দিন তাকে বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে কেন? চেয়ারটা টেনে নাও।'

মতিন দেখল ভোলা যেন লজ্জা পেল, ওর মতো এক ভয়ঙ্কর প্রাক্তন ডাকাত লজ্জা পেলে অন্যরকম দেখতে লাগে। সে বলল, 'না, ঠিক আছে। আপনারা কথা বলুন।'

মেছবাহউদ্দিন বললেন, 'আপনার সামনে বসতে সঙ্কোচ পাচ্ছে বোধহয়। দিন তো পাল্টেছে ভোলা। এখন তুমি পরিষদের সদস্য। আর চেয়ারে বসলে তুমি কোনও অন্যায় করছ না।'

মতিন বলল, 'সঙ্কোচ করতে হবে না ভোলা। বোসো।'

এরপর ভোলা বসল। বসা না বলে শরীরটাকে চেয়ারে ঠেকাল বলা যেতে পারে।

মেছবাহউদ্দিন বললেন, 'আপনি অনেকদিন পরে এলেন।'

'হ্যাঁ। আসলে ইচ্ছে থাকলেও আসা হয়ে ওঠে না।'

'কিন্তু আপনাদের মতো মানুষের আসা উচিত। ঢাকা তো এখন বেশি দূরের পথ নয়। আপনার বাবা হাজীসাহেব কালীগঞ্জের জন্য যা করে গেছেন আমরা সেইসব কথা কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রেখেছি। হাসপাতাল, মসজিদ, রাস্তা—এ সবই তাঁর দান, বড় ভালো মানুষ ছিলেন। আপনারা শহরে থাকায় গ্রাম আপনাদের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।'

মতিন স্নেহ শব্দটিকে খেয়াল করল। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কি তার কাছে অর্থ সাহায্য চাইতে এসেছে? কিছুই বলা যায় না।

মতিন বলল, 'না, এখন থেকে আমরা মাঝে মাঝেই আসব। আমার ভাইয়ের ইচ্ছে এখানে মাছ আর মুরগির ব্যবসা চালু করার। চাষবাস নিয়েও ভাবতে হবে।'

'খুব ভালো কথা। আপনারা এসব করলে গ্রামের কিছু বেকার মানুষ চাকরি পাবে। কিন্তু একটা কথা, আপনি প্রতি সপ্তাহে একবার অন্তত আসবেন।'

মেছবাহউদ্দিন হাসলেন, 'আপনার ভাই মানুষ ভালো হতে পারেন কিন্তু বড্ড রগচটা। উনি সাহেবকে শাসন করতে পছন্দ করেন। আসলে দিন তো পাল্টে গিয়েছে। বাবা বাছা বলে কাজ করানোর সময় এখন। সবসময় চোখ রাঙানো কে সহ্য করবে?'

'আমি শুনেছি ও খুব রাগারাগি করে,' মতিন বলতে বাধ্য হল।

'রাগারাগি? আমাদের সদস্য নুরুউদ্দীনকে তো রিভলবার নিয়ে মারতে গিয়েছিল। আমাকে অনেকেই বলেছিল আলতাফের বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করতে। আপনাদের পারিবারিক সম্মানের কথা ভেবে আমি সেটা করিনি।'

ভোলা বলল, 'এইসব আমি সারকে বলেছি।'

মতিন মাথা নাড়ল, 'আলতাফ অন্যায় করেছে।'

মেছবাহউদ্দিন বললেন, 'অল্প বয়স। ঢাকায় শুনেছি পনের ষোল বছরের ছেলেরা অস্ত্র নিয়ে ঘোরে। ব্যাপারটা যে ভাল নয় তা সবাই স্বীকার করছে কিন্তু কাজ হচ্ছে কোথায়? ওর ওই অস্ত্র আইনসম্মত কি না একবার দেখবেন?'

মতিন বলল, 'আমি জানি ওটা সম্পূর্ণ আইনসম্মত।'

'ও হ্যাঁ, আলতাফ দাবি করেছে যে বিলের জমি আপনাদের। ওপাশে কেদোপাড়ার জমিগুলিও নাকি এই পরিবারের। আমি তাকে বলেছি কাগজপত্র দাখিল করতে। যদি সেগুলি, লিখিত নথিতে থাকে তাহলে কোন অসুবিধে হবে না।' মেছবাহউদ্দিন গলা নিচু করলেন, 'দিন বদলে গিয়েছে। এখন যদি কেউ এসে বলে ও জমি আমার তাহলে তাকে ঠেকাতে কাগজপত্র দরকার হবে। আছে তো সব?'

মতিন বলল, 'আব্বা তো কোনও অন্যায় কাজ কখনও করেননি। ব্যাপারটা দেখতে হবে।'

'হ্যাঁ দেখুন। মুশকিল হল, আজকাল এ ও এসে দাবি করে সে ফ্রিডম ফাইটার ছিল। যেন এ কথা বললেই তার অনেক কিছু পাওনা হয়ে যায়। আরে কে কত বড় ফাইটার ছিল তা আমি জানি না? তামাম দেশের মানুষ যদি একসঙ্গে ফাইট করত তা হলে রাজাকাররা কোথা থেকে এল? যে কোনওদিন খান সেনা দ্যাখেনি সেও এসে বলে ফ্রিডম ফাইটার। একাত্তরে আপনি কি ইন্ডিয়ায় ছিলেন?'

মতিন মাথা নাড়ল, 'না। আমি সিঙ্গাপুরে ছিলাম।'

'ও। সিঙ্গাপুর তো অনেকদূর।'

'হ্যাঁ, সেখানে আমরা বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিস খুলি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারের ব্যবস্থা করি। বাংলাদেশীদের কথা সবাইকে জানিয়ে জনমত সংগঠিত করেছিলাম। কিন্তু আমি কখনই নিজেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলি না।' মতিন বলল।

'তা কেন? যে সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ে তার চেয়ে কম লড়াকু নয় যে তাকে অস্ত্র জোগান দেয়। আমি ছিলাম এখানে। ভোলার অতীত জীবন কি আপনি জানেন?'

ভোলা বলল, 'উনি সব শুনেছেন।'

'এই ভোলাকে আমিই পরিবর্তন করি। খানসেনাদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই নয়, গোপনে তাদের সর্বনাশ করতে ভোলাকে বোঝাই। ও তো রোজ একটা করে খান মারত, কালীগঞ্জের অনেক মানুষই তখন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। এমন একটা পরিবার নেই যাদের কোনও না কোনও ক্ষতি হয়েছে শুধু—! খারাপ লাগছে বলতে, আপনাদের কিছু হয়নি।'

কথাগুলো ভালো লাগছিল না মতিনের। লোকটা ইচ্ছে করেই তাকে ঠোকার চেষ্টা করছে। শেখ মুজিবর রহমানের ঐতিহাসিক মার্চ মাসের বক্তৃতার পর তারা কি কি করেছিল সে কথা এই লোকটাকে বোঝানোর কোনও মানে হয় না।

মতিন বলল, 'আপনারা কালীগঞ্জে কি কি করেছেন তা যেমন আপনারাই জানেন তেমনই ঢাকায় আমরা যা করেছি তা আমরাই জানি। এটুকু বলতে পারি স্বাধীন বাংলাদেশে নাগরিক হিসেবে আমি গর্বিত।

'ব্যাস, ব্যাস। এটাই তো আসল কথা। সত্যি তো, না জেনে মন্তব্য করা ঠিক নয়।' মেছবাহউদ্দিন বললেন, 'আসার সময় দেখলাম আমাদের ফ্রিডম ফাইটার মুজিবর রহমান সাহেব ফিরে যাচ্ছেন। কি কথা হল?'

'উনি এসেছিলেন, আমাদের আশ্রিতদের ব্যাপারে কথা বলতে।'

হঠাৎ মেছবাহউদ্দিন উত্তপ্ত হলেন। ভোলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কিরকম কথা হল? কে রাইট দিয়েছেন ওকে কথা বলার? গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। আমি তাকে এর আগেও নিষেধ করেছিলাম, আপনি আপনার মতো থাকুন কিন্তু লোকটা দেখছি কথা কানে নেওয়ার মানুষ নয়।'

'আপনি এভাবে বলছেন কিন্তু শুনলাম গ্রামের মানুষ ওঁকে শ্রদ্ধা করে।'

'হ্যাঁ, আর সেটা ভাঙিয়ে উনি বেঁচে আছেন। আওয়ামি লিগ বলল নির্বাচনে দাঁড়াতে, উনি বললেন, না। বি এন পি অফার দিল, জাতীয় পার্টি অনুরোধ করল কিন্তু সবাইকে উনি প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ কি? না, নির্বাচনে জিতলে দায়িত্ব নিতে হবে।'

ভোলা মৃদু প্রতিবাদ করল, 'কথাটা ঠিক না।'

'ঠিক না? তা হলে ঠিক কি?'

'উনি বলেন নির্বাচনে জিতলেও যখন সাধারণ মানুষের অবস্থা বদলাতে পারবেন না তখন দাঁড়ানোর কি দরকার?'

'পলায়ন মনোবৃত্তি, অতীত ভাঙিয়ে খাওয়া। একদম কান দেবেন না ওঁর

কথায়। কোন দল বা সংগঠন নেই ওর পেছনে। আমরা যা করি তাতে বাগড়া দেওয়াই ওঁর স্বভাব। স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক করেছেন, ভাই মারা গেছে, সংসার পুড়েছে কিন্তু তাই ভাঙিয়ে তিনি সারাজীবন ছড়ি ঘোরাতে পারেন না। আচ্ছা, আজ উঠি।' মেছবাহউদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন, 'মতিন ভাই। আমি আছি। আমি থাকতে কোন প্রব্লেম হবে না। হ্যাঁ কত লোক চাই, কাজের জন্যে সেটা ঠিক করেছেন?'

'কোন কাজ?' মতিন বুঝতে পারল না।

মেছবাহউদ্দিন বললেন, 'এই যে বললেন ব্যবসা করবেন এখানে, তার জন্যে তো লোকের দরকার হবে।'

মতিন বলল, 'এখনও তো কিছুই ঠিক হয়নি।'

'বেশ, ঠিক হলে ভোলার মাধ্যমে আমাকে জানাবেন। এলাকার কিছু বেকার যুবককে নিয়ে আমি দুশ্চিন্তায় আছি। আচ্ছা, খোদা হাফেজ।'

মতিন মাথা নাড়তেই ভদ্রলোক রওনা হয়ে গেলেন। ভোলা গেল তার সঙ্গে।

'সাহেব!'

পেছন থেকে নরম গলায় ডাক ভেসে এলে মতিনের সম্বিত ফিরল। সে ঘুরে দাঁড়াতে দেখতে পেল চারটে মেয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। তাদের পেছনে মাঝবয়সী মহিলারা কিছুটা দূরত্ব রেখে অনেকটা ঘোমটা টেনে অপেক্ষা করছে।

মতিন বলল, 'হ্যাঁ, বল।'

এদের বয়স কুড়ির অনেক নীচে। মুখের চেহারা, হাত-পায়ের গড়ন দেখলে অভাবের কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় না। যে মেয়েটি ডেকেছিল সে আর একজনকে ঠেলল। যাকে ঠেলল তার লজ্জা আরও বেশি।

মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি ওই বাড়িতেই থাকো?'

চারজনের দুজন মাথা নেড়ে না বলল, দুজন হ্যাঁ। মতিন চারপাশে তাকাল। পুরুষরা হয়তো এখনও মাছধরা দেখছে। চেয়ারম্যান কথা বলছে বলে এ দিকে আসাটা উচিত বলে মনে করেনি। মেয়েরা লক্ষ রেখেছিল তাই একা হতেই এগিয়ে এসেছে।

এইসময় পেছন থেকে একজন মহিলা এগিয়ে এসে মেয়েদের পাশে দাঁড়ালেন, 'আপনি তো আমাদের কাউকেই চিনবে না। আপনাদের কথা আমরা অনেক শুনেছি।'

'খুব ভাল কথা। তোমরা কি পড়াশুনা কর?'

চারজনই মাথা নাড়ল, 'না।'

ঠিক তখনই আলতাফের গলা শোনা গেল, 'আরে! করে কি এরা। আবার বড়ভাইরে ধরছ তোমরা? সাহস তো কম না।'

আলতাফের গলা শোনামাত্র চারজন দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। মহিলাও একে একে সরে গেলেন। মতিনের ব্যাপারটা খারাপ লাগল। 'তোকে দেখছি এখানে সবাই ভয় পায়।'

'ভয় না পাওয়ালে এরা মাথায় চড়ে বসবে। আপনি তো এদের চেনেন না, এক একটি রক্তচোষা ছারপোকা। গলায় পা না দিলে ঠিকঠাক কাজ করে না।' আলতাফ মাথা নাড়ল, 'ওই মেয়েগুলো কি বলেছে?'

'বলার সুযোগ পেল কোথায়?'

'আমি জানি কি বলবে। ওরা গারমেন্ট ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে চায়।'

'গারমেন্ট ফ্যাক্টরিতে?'

'হ্যাঁ। এখানেও খবর এসেছে ঢাকার গারমেন্ট ফ্যাক্টরিতে হাজার হাজার মেয়ে কাজ পেয়েছে। ওই কাজের জন্যে বেশি বিদ্যার দরকার হয় না। আমি এখানে যেদিন প্রথম এলাম সেদিন থেকেই ওই বায়না শুনছি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! আমি বলেছি ফ্যাক্টরি ভালো চলছে না। যে মেয়ে আছে তাতেই বেশি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরা ভাবে মিথ্যে বলছি।'

'অন্য ফ্যাক্টরিতে যাক। মেয়েগুলো রোজগার করতে পারবে তাহলে। হাজার হাজার মেয়ে এখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে গারমেন্টের দৌলতে।'

'বাপ মা ছাড়বে না। ইজ্জত যাওয়ার ভয় আছে না? আমরা চেনা মানুষ আমাদের ওখানে কাজে গেলে নিরাপদ থাকবে। এই হল এদের ধারণা, আমি যত বলি ফ্যাক্টরি থেকে চলছে না বলেই আমরা এখানে আসছি ব্যবসা করার জন্যে, কিন্তু কে শোনে?' আলতাফের হঠাৎ খেয়াল হল, 'চেয়ারম্যান কি বলল?'

মতিন ভাইয়ের দিকে তাকাল। দূরে কাছে কিছু মানুষ ছিটিয়ে আছে। সে বলল, 'চল, ঘরে বসে কথা বলব।'

'আপনার কি খিদে পেয়েচে?'

ঘরের দিকে যেতে যেতে মতিন বলল, 'না।'

'ভাত হতে কিন্তু একটু দেরি হবে।'

'হোক। রাঁধবে কে?'

'এরাই রাঁধবে। একটা বড় মাছ পেলাম না, দুটো ছোট তুলতে হল।' আলতাফ পেছনে আসতে আসতে বলল, 'আমি সিওর, এরাই মাছ চুরি করেছে।'

ওরা ঘরে ঢুকতেই কবির এসে আলতাফকে ডেকে নিচু গলায় কিছু বলতেই সে পকেট থেকে টাকা বের করে গুনে ওকে দিল। কবির চলে গেলে, চেয়ারে বসে বলল, 'বলুন।'

'তুই আগে বল এখানে ব্যবসার ব্যাপারটা কি ভেবেছিস?'

'আপনি তো জানেন। প্রথমে মাছ চাষ করে দেখব। আজকেই ময়মনসিংহ থেকে মাছের চারা নিয়ে লরি আসবে। আমরা নতুন দুটো পুকুরে মাছ ছেড়ে যাব।'

'কত টাকার মাছ?'

'দেখি, কত আনে।'

'তিন থেকে চারমাসে বিক্রি করা যাবে?'

'অবশ্যই।'

'কিভাবে বিক্রি করবি?'

'ঢাকায় চালান দিতে পারি। ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার। তা নাহলে পাইকারকে দিয়ে দিতে পারি। তাতে লাভ কম থাকবে।'

'এই কাজের জন্যে কত লোক দরকার?'

'কেন?' আলতাফের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'জিজ্ঞাসা করছি, উত্তর দে।'

'দুজন। বারো ঘণ্টা করে ডিউটি দেবে। মাছগুলোকে ঠিক সময়ে খাওয়াবে।'

'মাত্র দুজনে হয়ে যাবে?'

'হবে না কেন? পাহারা দেওয়া ছাড়া তো কোনও কাজ নেই। মাছেরা নিজেদের মতো পানির তলায় বড় হবে। আমি যখন আসব তখন দরকার হলে ওষুধ দিয়ে যাব।'

'মাছগুলো বড় হলে একজন পাহারাদার চোর বদমাসকে থামাতে পারবে?'

'আপনার মাথায় কি আছে বলুন তো!'

মতিন ভাইয়ের দিকে তাকাল। ঢাকায় যে সুবোধ হয়ে থাকে সে এখানে এখনও তার সামনে উদ্ধত হয়নি। সেটা হতে দেওয়া উচিত হবে না। মতিন বলল, 'লাভের যে হিসেব তুই আমাকে বলেছিস সেটা সত্যি হলে চারজন লোক রাখ।'

'ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন।'

'এই চারজন কারা হবে?'

'ঢাকা থেকে আনব।'

'কেন?'

'আমি এদের বিশ্বাস করি না। সব শালা চোর। আব্বার প্রশ্রয় পেয়ে এখানে থেকে এখন আমাদের সর্বনাশ করতে চায়।'

'শোন। ব্যবসা করতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। এখানে এসে যা শুনেছি তাতে পরিষ্কার তুই মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারছিস না।'

'পারা যায় না।'

'পারতে হবে। ব্যবসা করতে হলে সেটা পারতেই হবে।'

'চেয়ারম্যান নালিশ করেছে?'

প্রশ্নটার সরাসরি জবাব না দিয়ে মতিন বলল, 'তুই এখানে রিভলভার নিয়ে আসিস কেন? নিজের গ্রামে রিভলভারের দরকার কি? এটা তো জঙ্গল নয়।'

'তার চেয়েও খারাপ। প্রথম প্রথম তো নিয়ে আসতাম না। এরা আমাকে নরম ভেবে চোখ দেখাল। ওই ভোলা আর নুরউদ্দিন আমার বিরুদ্ধে পাবলিক খ্যাপাতে লেগেছিল। বলে এতদিন যারা ভোগ করছে তারাই করবে আমরা বাইরের লোক। এসব কথা আপনাকে বলিনি চিন্তায় পড়বেন বলে। বুঝলাম নরম জমি ভেবে ওরা দাঁও মারবার চেষ্টা করছে কিন্তু যেই আমি রিভলভার বের করলাম, গালি দেওয়া শুরু করলাম তখনই ভোলা পাল্টি খেল। নুরুউদ্দিন বলেছিল হরতাল করাবে। তাকে যন্ত্রটা দেখাতে তবে ঠাণ্ডা হল।'

'হতে পারে। কিন্তু এখন আর এর প্রয়োজন নেই।'

'তা হলে আপনি ওদের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবেন না।'

'কেন?'

'এরা আপনার খেয়েও বলবে খায়নি।'

'মানুষ সম্পর্কে এত খারাপ ভাবনা ভাবতে আমি রাজি নই। তা ছাড়া জোরজবরদস্তি করে পৃথিবীতে কেউ কখনই বেশিদিন ক্ষমতা দখল করে রাখতে পারেনি। তোর কাছে রিভলভার আছে জেনে কেউ বন্দুক বের করতে পারে। তখন আর কিছু করার থাকবে না। আমি তাই তোকে বলছি মাথা ঠাণ্ডা করে এখানে কাজ করতে হবে।'

আলতাফ মাথা নিচু করে রইল। বোঝা যাচ্ছে এই পরামর্শ তার একটুও পছন্দ হল না। কিন্তু ভাইয়ের মুখের ওপর কিছু বলতে সে এখনও সাহস পাচ্ছিল না।

অপছন্দ হয়েছে শুনে আলতাফ খুশি হল, 'হ্যাঁ করে।'

'আনোয়ার ভাইকে ওর কথা বলব ঢাকায় ফিরে গিয়ে। আমি বা আমরা স্বাধীনতার সময় কি করেছি তাই নিয়ে কটাক্ষ করছিল।'

'বুঝুন।'

'বুঝেছি যা তাই ঢের। আর বুঝতে চাই না। কিন্তু এখানে ব্যবসা করতে গেলে এদের হাতে রাখতে হবে। মনে যাই থাক মুখে মিষ্টি কথা বলা দরকার।'

'আপনি আনোয়ার ভাইকে বললেই ব্যাটডা টাইট হয়ে যাবে।'

'কিন্তু ওকে শত্রু বানানো চলবে না।'

'ও কি আর কিছু বলছিল?'

'হ্যাঁ। এখানে নাকি প্রচুর বেকার ছেলে আছে। ব্যবসা করলে তাদের কাজ দিতে হবে।'

'ইনশাআল্লা। তা হলে তো ব্যবসা উঠে যাবে।'

'কেন?'

'ওরাই রাত্রে মাছ চুরি করবে অথচ আমরা কিছুই বলতে পারব না।'

'কিন্তু ঢাকা থেকে আমরা লোক আনব না। গ্রামের মানুষ তাদের মেনে নিতে পারবে না। তুই এক কাজ কর। এই গ্রামের বেকার ছেলেরা কি সবাইকেই পার্টি করে?'

'তা কেন হবে? অন্য পার্টিও করে আবার পার্টি করে না এমন ছেলেও আছে।'

'তাদের মধ্যে থেকে দু'জনকে বেছে নে। মেছবাহউদ্দিন বলেছে গ্রামের বেকার ছেলের কথা। আমি তাদের দু'জনকে নেব। তারা যদি ওর পার্টির লোক না হয় তাহলে তুই যে ভয় করছিস সেটা থাকবে না। বাকি দু'জনকে নেব আমার আশ্রিতদের মধ্যে থেকে।'

'আপনি—।'

'আপত্তি করিস না। এদের দু'জনকে নিলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। আমি একটু ঘুরে আসছি। তুই ইতিমধ্যে চারজনকে বাছাই করে রাখ।' মতিন উঠে পড়ল।

'মাছগুলো বড় হওয়ার আগে যদি দেখি এরা অবাধ্যতা করছে তাহলে কিন্তু ছাড়িয়ে দেব। বড় মাছ চুরি করার সুযোগ দেব না।' আলতাফ শেষ আপত্তিটা জানিয়ে রাখল।

বাইরে এসে মতিন সেই বাচ্চা ছেলেটাকে দেখল যার নাম লিটন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সে বলল, 'চল। আমাকে হিন্দুপাড়ায় নিয়ে যাবি তুই?'

'চলেন।' লিটন খুশি হল।

বিলের পাশের বাঁধ ধরে ওরা এগোতে লাগল। এখন পানির সময় নয়। তাই বাঁধ থেকে নেমে মাঠে পা রাখতে অসুবিধে হল না। হাঁটতে হাঁটতে লিটন জিজ্ঞাসা করল, 'ছার, ঢাকা কিরম জায়গা? খুব বড়?'

'হ্যাঁ। বড় শহর। তুই কখনও যাসনি?'

'নাঃ। আমার আব্বাও যায় নাই।'

'বড় হলে তুই যাস।'

'আপনার দেশ তো এই জায়গা, না?'

'হ্যাঁ। তোর চেয়ে অল্প বয়সে আমি ঢাকায় চলে গিয়েছিলাম।'

'আপনি আসছে দেইখ্যা সবাই খুব খুশি।'

'কেন?'

'সবাই ভাবতেছে আল্লা ইবার দিবেন।'

'কি দেবেন?'

'আমি অত জানি না। আম্মা আব্বারে কইতেছিল, সব বুঝি নাই।'

মতিন নিশ্বাস ফেলল। কতটা পরিবর্তন হয়েছে গ্রাম বাংলার এক দরিদ্র বালকের জীবনযাত্রা? তার বাল্যকালে এরা যেমন ছিল তা থেকে কতটা সরে এসেছে।

'হিন্দুপাড়া।' লিটন বলল।

কলাগাছ আম আর কাঁঠালে ছাওয়া ছোট্ট গ্রামটা এখন চুপচাপ। কয়েকটা গরু এবং ছাগল ওদের দেখার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছে। কুড়ি পঁচিশ ঘরের বেশি মানুষ এখানে নেই। ছেচল্লিশে নোয়াখালির দাঙ্গা, সাতচল্লিশে দেশ ভাগ, পঁয়ষট্টির যুদ্ধ অথবা একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঝড় সত্ত্বেও কোনও হিন্দু নাকি কালীগঞ্জ ছেড়ে চলে যায়নি। হানাহানির আগুন নাকি স্পর্শ করেনি কালীগঞ্জের মাটি। কথাটা সত্যি। কিন্তু এই গ্রামে ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থরা কোনওদিন ছিল কি? মতিনের মনে পড়ে না।

গ্রামে ঢুকে কয়েক পা হাঁটতেই বিস্মিত মুখগুলোকে দেখতে পেল সে। নিজেদের বাড়ির দাওয়া অথবা উঠোনে কাজ করতে করতে শহুরে মানুষকে ওরা অবাক হয়ে দেখছে। একজন প্রৌঢ়কে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মতিন বলল, 'আদাব। দুর্গাদাসের বাড়ি কোথায়?'

'দুর্গাদাসদাদা? হুই কলাগাছ দেখতেছেন, ওই বাড়ি।'

মতিন হাঁটতে শুরু করল। সে লক্ষ করছিল এই গ্রামের বাড়িগুলো, উঠোন অনেক পরিষ্কার। অভাব থাকলেও সেটা প্রকট হয়ে নেই।

কলাগাছে ঘেরা উঠোনে পা দিয়ে মতিন দাঁড়াল। একজন বৃদ্ধা বারান্দায় বসে কুলোর ওপর ঝুঁকে কিছু বাছছিলেন। তাকে দেখতে পেয়ে ঘোমটা টানলেন।

মতিন কয়েক পা এগোল, 'দুর্গাদাসদাদা আছেন?'

ঘোমটার আড়ালে মুখ রেখে বৃদ্ধা গলা তুললেন, 'কে ডাকে!'

ঘরের ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ ভেসে এল, 'কে?'

'চিনি না।' বৃদ্ধা জবাব দিল।

'এই গ্রামের মানুষ হইলে চিনবা না তুমি?' বৃদ্ধের গলায় বিরক্তি।

'আসো না একবার।'

এবার দরজায় শব্দ হল। প্রথমে একটা লাঠি বেরিয়ে এল। তারপর শীর্ণদেহ একটি মানুষ। মুখে অনেকখানি পাকা দাড়ি। পরনে খাটো ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই। মাথার চুল অর্ধেক উঠে গেছে, বাকিটা সাদা। শরীরের হাড়গুলোকে এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে মতিন। কাঁপতে কাঁপতে লাঠিতে ভর রেখে বৃদ্ধ বারান্দার প্রান্তে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারে চান?'

'দুর্গাদাসদাদা।'

'আমিই সেই লোক।'

দুর্গাদাস। মতিন অবাক হয়ে দেখছে। বিলে নৌকো নিয়ে এই মানুষটা যখন আকাশের দিকে তাকাত তখন মনে হত মেঘগুলো ভয় পেয়ে যাচ্ছে। দুর্গাদাসের নৌকোয় চড়লে কোন কিছুরই ভয় নেই। না ডাকাত না ঝড়।

'আপনারে চিনলাম না!'

এই সময় পেছন থেকে লিটন বলে উঠল, 'বড় ছার।'

'আপনি সরকারি লোক?'

'একদম না। আপনি আমাকে তুমি বলুন, কারণ একসময় তাই বলতেন।' মতিন হাসল, 'আমাকে একদম চেনা যাচ্ছে না? আমি মতিন।'

'মতিন?'

'ছেলেবেলায় আপনি আমাকে সাঁতার শিখিয়েছিলেন।'

হঠাৎ যেন ভূমিকম্প হল। বৃদ্ধের শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে দাওয়া থেকে উঠোনে নামতে লাগল। হাতের লাঠি ছিটকে পড়ল একপাশে। মতিন কিছু বলার আগে দুর্গাদাসের শরীরটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর পায়ের ওপর, 'দাদারে, এতদিনে তুমি আইলা।' ডুকরে উঠল কান্না।

এমন প্রস্তুত জীবনে হয়নি মতিন। সে নিচু হয়েও ক্রন্দনরত বৃদ্ধকে তুলতে পারছিল না। সে যতই বলছে, এ আপনি কি করছেন, ততই বৃদ্ধের কান্না বাড়ছে।

শেষপর্যন্ত উবু হয়ে বসে পড়ে বৃদ্ধের কাঁধ দুটোকে সোজা করল সে, 'ছিঃ। আপনি আমার পায়ে পড়লেন? আপনি আমার কত বড় না?'

'কে বড়?' বৃদ্ধের গলায় তখনও কান্না, 'আমি? একদম না। আমি তোমাগো চাকর। বড় সাহেব আমার দেবতা ছিলেন। আমি এতবড় পাপী যে তাঁর মাটি নেবার সময় থাকতে পারলাম না। গরু গুঁতাইল এমন যে হাসপাতালে নিয়া গেল এরা। এখন সোজা খাড়াইতে পারি না। ওহো! মতিনভাই, তুমি আইছ এখানে। ভগবান আছেন। শুনছ, তুমি চিনতে পারতেছ না? আমাগো বড়সাহেবের পোলা, মতিন। এইটুকুনি দেখছি এরে।'

বৃদ্ধা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। একটা ছোট্ট টুল নিয়ে উঠোনে নেমে এসে মতিনের পাশে রাখতেই দুর্গাদাস বললেন, 'বসো, ওখানে বসো। কি ভাগ্যি আমার।'

মতিন টুলে বসল। ইতিমধ্যে উঠোনে বেশ ভিড় জমে গিয়েছে। ফিসফিস কথা শুরু হয়ে গেছে। দুর্গাদাস বললেন, 'কবে আইলা তুমি?'

'আজই।'

'কেউই বলে নাই। আমারে কেউ মানুষই মনে করে না।'

বৃদ্ধা বললেন, 'আমিও তো জানি না।'

মতিন বলল, 'আপনি কেমন আছেন?'

'মরি নাই। এখনও ভগবান প্রাণটা নেয় নাই।' অভাব। বড় অভাব। বৃদ্ধ বয়স। কাজ কাম করতে পারি না। পয়সা নাই। এই তিনি তাঁতের কারখানায় এখনও কাম করেন বইল্যা একটু ভাত পাই। মতিন, দিন যখন যায় তখন সব নিয়া যায়।'

'কিন্তু আপনার ছেলে তো এখানকার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য!'

দুর্গাদাস মাথা নাড়ে, 'আমার কোন ছেলে নাই।'

'আপনার মনের দুঃখ আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ভোলা তো এখন পাল্টে গিয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধের সময় থেকেই পাল্টেছে। এখন মানুষের উপকার করে সে। তাছাড়া সে কেন ডাকাতি করত তাও নিশ্চয়ই আপনি জানেন দুর্গাদাসদাদা!' মতিন বোঝাবার চেষ্টা করল।

'এইসব কথা আমারে বুঝাইয়া কোন লাভ নাই। যারে অন্যায় বলি, পাপ বলছি সারাজীবন তাই তার জীবন হইয়া গেল। তোমার বাপ বড়সাহেব কইতেন, দুর্গা, তুই ঠিক করছস; আগে তুই মানুষ তারপর বাপ।' মাথা ঝাঁকালেন দুর্গাদাস, 'আরে তুমি তামাশা দ্যাখো নাকি! ঘরে কিছু নাই? মুড়ি বাতাসা তো ছিল?

বৃদ্ধা নড়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াতেই মতিন আপত্তি করল, 'না, না। আমি এখন কিছু খাব না। আমার পেট ভর্তি, আপনারা ব্যস্ত হবেন না।'

দুর্গাদাসের কথাগুলো পছন্দ না হলেও মেনে নিলেন, 'বাসার খবর কি?'

মতিনের মজা লাগল। ঢাকার নিজস্ব বাড়িকে দুর্গাদাস বাসা বলছেন এখনও।

মাথা নাড়ল সে। তারপর বলল, 'আপনার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা আছে।'

'দরকার? আমার লগে দরকারি কথা?'

'হ্যাঁ। আমার ছোটভাই আলতাফকে আপনি দেখেছেন?'

'না। আমি তো এইখান থিকা কোথাও যাই না।'

'ও। ওর বয়স বছর আঠাশেক। খাটিয়ে ছেলে কিন্তু রাগী খুব।'

'আইছা। তোমার দাদাও রাগী ছিল শুনছি।'

ঠাকুর্দার কথা মতিনের মনে নেই অথচ দুর্গাদাস সহজে বলে দিল। সে হাসল, 'আমি এবং আলতাফ ঠিক করেছি এখন থেকে এখানে মাঝে মাঝে আসব। আলতাফই প্রতি সপ্তাহে আসবে। দুটো নতুন পুকুর খোঁড়ানো হয়েছে। পুরনোগুলো তো আছেই। ওইসব জায়গায় মাছের চাষ করা হবে। আমার নিজের কোনও ধারণা নেই কিন্তু আলতাফ বলছে ব্যবসা হিসেবে খুব ভাল ফল দেবে।'

'মাছের ব্যবসা?' দুর্গাদাস অবাক হয়ে গেল।

'হ্যাঁ। আজ থেকেই মাছ ছাড়া হবে। পাঁচ মাস থেকে শহরে চালান যাবে। তা এই সব দেখাশোনা করার জন্যে চারটে ছেলেকে রাখা হবে। তারাই কাজ করবে, মাইনে পাবে। আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?'

'না। বড়সাহেবের বংশধর হইয়া মাছের ব্যবসা করব কেনে?'

মতিন হাসল, 'এখন কোন ব্যবসায় মান যায় যদি না সেটা বেআইনী হয়।'

'হুম। শহরের ব্যবসা ভাল চলতেছে না?'

'খুব ভাল না।'

'নিজের বাড়ি, পুকুর, মাটি নিয়া ব্যবসা করা ভালো?'

'আমরা ওসব কিছুই করছি না। শুধু পানিতে মাছ ছেড়ে একটু বড় করে তুলে নিচ্ছি। যা হোক, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।'

দুর্গাদাস অবাক হয়ে তাকালেন।

'আপনি রোজ সকালে বিকেলে ওখানে গিয়ে বসবেন। আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আপনি কি হেঁটে যেতে পারবেন?' মতিন জিজ্ঞাসা করল।

'কষ্ট হয়। বেশিদূর যাইতে পারি না লাঠি লইয়া। দুর্গাদাস মাথা নাড়লেন, 'যে জিনিস বগলে দিয়া হাঁটে সেটা পাইলে পারতাম।'

'ক্রাচ। ঠিক আছে আমি আপনাকে একজোড়া ভাল ক্রাচ পাঠিয়ে দেব।'

'কিন্তু আমি ওখানে কেন যাব?'

'নজর রাখতে। আপনি দেখবেন ছেলে চারটে ঠিকঠাক কাজ করছে কি না। আমরা থাকব না, আপনি আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে ওখানে যাবেন রোজ। কোন গোলমাল লক্ষ করলে সঙ্গে সঙ্গে শহরে আমাদের খবর পাঠাবেন। কাকে বললে আমরা খবর পাব তাও আপনাকে জানিয়ে দেব আমি।'

'তার মানে তুমি এখানে বিশ্বাসী লোক পাও নাই!'

'ঠিক বলেছেন।' মতিন মাথা নাড়ল, 'আপনি যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন আমাদের এই উপকারটা করুন।'

দুর্গাদাস হাসলেন, 'নতুন নতুন লাগে। আমি যে একটা মানুষ তাই কেউ বলে না। শুনছ? কি জবাব দিব বল?'

যাঁর উদ্দেশে প্রশ্ন তিনি বললেন, 'না বলব কেন? নিমকহারামি হবে।'

দুর্গাদাস বললেন, 'উত্তর শুনছ মতিন?'

মতিন হাসল, 'উত্তরটা আমার জানা ছিল বলেই তো আপনার কাছে এসেছিলাম। এখন বলুন কত টাকা দিলে আপনাদের খাওয়াপরার অসুবিধা থাকবে না।'

'এইডা তুমি ব্যবসায়ীর মত কথা বল্‌লা।' মাথা নাড়লেন দুর্গাদাস।

'ঠিক আছে। ব্যাপারটা আমরাই ঠিক করে নেব। আমি বিকেল পর্যন্ত আছি। তার আগে যদি একবার আসেন খুব ভালো হয়। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে?'

'আজ করবা, রোজ তো পারবা না। আমি ঠিক যাব।'

মতিন উঠল। কাঁপতে কাঁপতে দুর্গাদাস দাঁড়াতে বৃদ্ধা একটা প্লেটে বাতাসা নিয়ে এসে সামনে ধরলেন। লাল বাতাসা। লবেঞ্চুসের স্বাদ মনে পড়ল মতিনের। তারপরেই খেয়াল হল অনেক বছর সে লাল বাতাসা খায়নি। হাত বাড়িয়ে একটা তুলে মুখে পুরতেই দাঁতের চাপে যে শব্দ হল সেটা তার খুব চেনা। ছেলেবেলায় বাতাসা খেলেই এই শব্দ হত। সে চোখ বন্ধ করল। বাঃ বেশ চমৎকার স্বাদ।

'বিলটার হাল দেখছ মতিন?'

দুর্গাদাসের কথায় চোখ খুলল মতিন, 'হ্যাঁ। কি করে এমন হল? আমি চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সমুদ্রের মত ঢেউ খেলত। কি ভয় লাগত নৌকায় উঠতে। আজ সব খাঁ খাঁ করছে। পানি ছাড়া বিলের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।'

'তুমি আজ হঠাৎ দেখলা আর আমি? চোখের সামনে দেখলাম বিলটা ধীরে ধীরে মাঠ হইয়া গেল! এখন আর আমি ওই দিকে তাকাইতে পারি না।'

বৃদ্ধার দেওয়া পানি খেয়ে মতিন লিটনের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখল অনেকে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য উদগ্রীব। একটা সূত্র পেলেই হয়। চোখ বুলিয়ে কোন মুখকেই চেনা মনে না হতে সে হাঁটা শুরু করল। কয়েক পা যেতে লিটন তার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আমার আব্বারে কাম দিবে না?'

'তোর আব্বা কি করে?'

'মানুষের বাড়িতে কাম করে। খেতির কাম। ডেইলি টাকা পায়। গত সাতদিন কোন কাম নাই। কাল শুধু মুড়ি খাইছি আমরা।' লিটন বলল।

'আমাকে তখন তুই চা এনে দিলি কোত্থেকে?'

'কবির চাচা দিছিল।'

'ঠিক আছে, তোর আব্বাকে দেখা করতে বলিস।'

'আব্বা ডর পায়।'

'কেন?'

'ছোটসাহেব যদি রাগ করে!'

'না, রাগ করবে কেন? তুই দেখা করতে বলিস।' মতিন পা চালাল।

মাঝেমাঝে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে দরজা অবধি। ঘরে ঢুকছে না কেউ।

জানলার ধারে ইজিচেয়ার নিয়ে বসে ছিল মতিন। মাথর ওপর ফ্যান ঘুরছে। বাথরুমের ড্রামে আজ জল ভরা হয়েছে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও ঘরটি মন্দ নয়। মতিন দরজার দিকে তাকাচ্ছিল না। এখনকার অধিকাংশ মানুষ তার কাছে সাহায্য চেয়ে হাত বাড়াবে এতে অবাক হচ্ছে না সে। অথচ আলতাফ নিজের যে ইমেজ ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছে তাতে এইসব সমস্যা ওর কাছে পৌঁছাবে না। কোনটা ভাল তাই ঠিক বুঝতে পারছে না মতিন।

সে জানলার বাইরে তাকাল, পুকুর, দূরের শিমুলগাছকে রোদে পুড়তে দেখল। প্রখর রোদ সত্ত্বেও অল্প অল্প হাওয়া বইছে। এই সেই জায়গা যেখানে তার শৈশব এবং বাল্যকালের অনেকটা কেটেছিল। মাঝেমাঝেই বুকের ভেতরে একটা টনটনানি ব্যথা চলকে উঠেছে। এত শান্ত, শান্তির জায়গা ছেড়ে ঢাকা শহরের ইটকাঠ পাথরের সমস্যায় তাকে নিত্য বেঁচে থাকতে হয়। যদি সব ছেড়ে ছুড়ে চলে আসা যেত! হেসে ফেলল মতিন। যদি বিলটায় আবার পানি জমত, যদি ছিপ নিয়ে সে পুঁটি মাছ ধরার নেশাটাকে ফিরে পেত। পৃথিবীর যদিগুলো বড় গোলমেলে!

'আসব?'

নারীকণ্ঠের আওয়াজ কানে আসতেই মুখ ফেরাল মতিন। তার ধাই মা এবং একটি বছর তিরিশের যুবতী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'কি ব্যাপার?'

ধাই মা বলল, 'তখন কথাডা কইতে পারলাম না।'

'ও হ্যাঁ।' মতিন মাথা নাড়ল, 'বলুন।'

ধাই মা ইতস্তত করল। যুবতী দেখিয়ে, 'আমার মাইয়্যা। এরে তুমি বাঁচাও।'

'কি হয়েছে ওর?' মতিন সোজা হল।

বৃদ্ধা যা বলল তা মন দিয়ে শুনল মতিন। অনেক কষ্টে মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বছর দশেক আগে। স্বামী খুব ভাল মানুষ ছিল। চাষবাস করত। কিন্তু স্বামীর বড় ভাই বিয়ে-থা করেনি, মাতাল, লম্পট। সে কু-নজর দেয় ভাইয়ের বউয়ের ওপর। শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি স্বামীকে সব জানায়। স্বামী দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে। গ্রামে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়। কিন্তু তার কিছু দিনের মধ্যেই রাত্রে নদী থেকে আসবার সময় স্বামীর অপঘাতে মৃত্যু হয়। লোকে বলে এই মৃত্যুর পেছনে ভাসুরের হাত ছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর বেচারা একা হয়ে যায়। কিছুদিন পরে ভাসুর এমন ব্যবহার করতে থাকে যেন সে-ই মেয়েটির কর্তা। ওকে ভোগ করার জন্যে খেপে ওঠে লোকটা। তাই বাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে সে। যেহেতু ছেড়ে এসেছে তাই স্বামীর সম্পত্তির দখল ভাসুর দেবে না। এখানকার থানায় জানিয়েও কোন কাজ

হয়নি। বৃদ্ধার এখানে নিজেরই চলে না তার ওপর যুবতী মেয়ে ঘাড়ে চেপেছে। কি হবে সে ভেবে পাচ্ছে না। লোক বলছে মামলা করতে। কিন্তু সেটা করতে গেলেও টাকা লাগে। স্বামীর গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছিল, কোন কাজ হয়নি। এখন মতিন যদি কোন সুরাহা করে দেয়। সে শহরে থাকে। অনেক বড় বড় মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। সে ইচ্ছে করলে ভাসুরকে জব্দ করতে নিশ্চয়ই পারবে।

মতিনের খারাপ লাগল। কিন্তু সে ভেবে পেল না এই সমস্যার সমাধান কি করে করবে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন গ্রামে বিয়ে হয়েছিল?'

বৃদ্ধা জবাব দিল, 'রসিদপুর।'

মতিন বলল, 'দেখুন, ওখানে তো আমি কাউকে চিনি না। আমি কি করব?'

'তোমার নিজের বুন হইলে কি করতা?'

চমকে উঠল মতিন। 'সত্যি কথা খারাপ শোনায়। কিন্তু কথাডা ভিন্ন নয়।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

বৃদ্ধা মুখ নীচু করল। মনে হল কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিল শেষ পর্যন্ত। তারপর মুখ তুলল, 'বড় আশা নিয়া আসছিলাম তোমার কাছে।'

এই গলার স্বরে নরম হয়ে গেল মতিন। পকেট থেকে কাগজ এবং কলম বের করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওর নাম বলুন।'

'শামসুন্নেছা। ডাক নাম আনু।'

'ওর স্বামীর নাম?'

'মাহবুবুর রহমান।'

'ওর ভাসুরের নাম?'

'মিজানুর রহমান।'

'সিরাজগঞ্জের কোন পাড়ায় বাড়ি?'

'পশ্চিম পাড়া। স্কুলের পাশে বাড়ি।'

'ঠিক আছে। আমি কোনও কথা দিচ্ছি না কিন্তু ঢাকায় ফিরে চেষ্টা করব।'

'তুমি একবার সিরাজগঞ্জে যাইতে পারবা না?'

'আমি? সেখানে গেলে আমার কথা ওর ভাসুর শুনবে কেন? যারা বললে সে শুনতে বাধ্য হবে তাদের দিয়ে বলাব। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

'ঠিক আছে। চল।'

মতিন দেখল ওরা দরজা থেকে বারান্দায় নেমে গেল। যুবতীটি এতক্ষণ চুপচাপ

দাঁড়িয়ে ছিল। একটি কথাও সে উচ্চারণ করেনি। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে কারও কাছে হাত পাততে এসে সে বোধহয় একটু বেশি পরিমাণই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল।

আলতাফ হই চই করে রান্না শেষ করিয়ে ওই ঘরেই যখন পরিবেশনের ব্যবস্থা করল তখন বিকেল প্রায় চারটে। ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, মাছের ঝোল, মুরগির ঝোল এবং চাটনি। চেয়ারে বসে খাদ্যদ্রব্যগুলো দেখে খিদেটা বেড়ে গেল মতিনের। রং দেখে মনে হচ্ছিল যথেষ্ট উপাদেয় হয়েছে। কবির নিজে বয়ে এনেছে পাত্রগুলো। সাজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। যাওয়ার আগে বলে গেছে, 'শহরের মত রান্না হয় নাই।'

খেতে বসে মতিনের মনে হল অতীব সুস্বাদু। এত সুন্দর মাছের ঝোল আজকাল ঢাকার বাড়িতে হয় না। সেখানে প্রায় প্রতি বাড়িতেই মাছ এবং মাংসের রান্নায় যে আধুনিকীকরণ ঘটেছে তাতে আর স্বাদের হেরফের ঘটে না। তার মানে হল অনেকদিনের পরে এই দিশি গ্রাম্য রান্নায় ছেলেবেলার স্বাদ পাচ্ছে। শেষ পাতে ডাল খেতে খেতে বুঝতে পারল অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

আলতাফ বলল, 'আপনার খুব খিদে পেয়েছিল।'

'না রে। খিদের চেয়ে রান্নাটা জব্বর হয়েছে। কে রেঁধেছে?'

'কবিরের বৌ।'

'এত সব রান্না করল—।'

'মাছ তো আমি দিয়েছি। বাকি সব কেনার জন্যে টাকা দিয়েছিলাম।'

একটু স্বস্তি। তারপরই মতিনের মাথায় দুটো প্রশ্ন চলকে উঠল। আজ, এই বিকেলেও এই বাড়ি এবং বাড়িকে ঘিরে পাড়ায় যে সব পরিবার থাকে তাদের কেউ চমৎকার খাবারের স্বাদ পাচ্ছে? যে পরিমাণ মাছ এবং মাংস তাদের টেবিলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে তারপর আর কি অবশিষ্ট থাকতে পারে ওদের জন্য? নিজেরা নুনভাত খেয়ে তাদের এই সব খাবার পরিবেশন করার সময় কি ওদের মনে লোভ ছোবল মারবে না?

বাড়িতে শখে পড়ে হঠাৎ রান্নাঘরে গিয়ে কোন পদ বানিয়ে স্ত্রী বলেন, খারাপ হলে কিছু বলব না। অভ্যেস নেই, খারাপ হতেই পারে। কবিরের স্ত্রী বছরের পর বছর যে সব রান্না করার কোন সুযোগই পায় না, কবে কখন কোন এককালে হয়তো দু-চারদিন করেছিল, সেই পদগুলো আজ এমন সাবলীল ভঙ্গিতে রান্না কবিরের স্ত্রীর হাত দিয়ে বেরুল কি করে? এ সব কথা আলতাফকে বলার কোন মানে হয় না।

মতিন বলল, 'বলে দিস রান্না খুব ভাল হয়েছে।'

আলতাফ বলল, 'আমরা খাব বলে অন্য বউরা কবিরের বউকে হেল্প করেছে।'

'ও।' দৃশ্যটা কল্পনা করল মতিন।

'হাতমুখ ধুয়ে আপনি বিশ্রাম নিন। একটু পরেই ময়মনসিংহ থেকে ট্রাক এসে যাবে মাছের পোনা নিয়ে। ওজন করে গুনে পুকুরে ছেড়ে আমরা ফিরে যাব।'

'তুই চারজনকে জোগাড় করেছিস?'

'হুঁ। আপনি বলেছেন বলে করলাম কিন্তু আমি ওদের বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বিশ্বাস তো করতেই হবে। তবে আর একটা ব্যবস্থা আমি করেছি যাতে ঠকার চান্স নেই।'

আলতাফ অবাক হয়ে তাকাল।

মতিন বলল, 'ভোলার বাবা দুর্গাদাসকে তুই দেখেছিস?'

'না। শুনেছি বুড়ো হাঁটা চলা করতে পারে না। আপনি তো আজ ওখানে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, দুর্গাদাসকে দেখে এলাম। আব্বা ওর আল্লা ছিলেন। আমাদের বাড়ির জন্যে ও জান দিয়ে দিতে পারত। কোমরে আঘাত পাওয়ার পর থেকেই ও ভেঙে পড়েছে। তাছাড়া বয়স হয়েছে, খেতেও পায় না ঠিকঠাক তাই আরও অথর্ব হয়ে পড়েছে।'

'তা সে কি করবে?'

'আমি তাকে বলেছি রোজ এখানে এসে পুকুর ধারে বসে থাকতে। এখানকার সব খবরাখবর রাখতে। যদি কোন গোলমাল দ্যাখে তা হলে আমাদের কাছে খবর পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে সে।' মতিন বলল।

'এতদূর আসতে পারবে সে?'

'বলল পারবে।'

'মন্দ না কিন্তু কত দিতে হবে ওকে?'

'কিছু কথা হয়নি। খাওয়া-পরার মতো টাকা দিলেই হবে।'

'সে অনেক টাকা।'

'বহু টাকা লোকসান বাঁচানোর জন্যে এই টাকাটা আমাদের খরচ করতে হবে।'

'হুম। কিন্তু ভোলা কি মনে করবে?'

'তার মানে?'

'ভোলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য। বেশ প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে। তার

বাপকে যদি পাহারাদারের কাজে রাখি তা হলে—।' কথাটা শেষ করল না আলতাফ।

'যে ছেলে নিজের বাপের খবর নেয় না, বাপ খেতে পাচ্ছে কি না দ্যাখে না, তার কি মনে হল তা নিয়ে ভাবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। দুর্গাদাসের প্রতি আমাদের পরিবার কৃতজ্ঞ। আজও সে বিশ্বস্ত। ও যদি এখানে হেঁটে আসতে পারে তা হলে দেখবি তোর সমস্যা কমে যাবে।' মতিন উঠে পড়ল হাত ধুতে।

খাওয়াদাওয়ার পর পান নিয়ে এল লিটন। একটা প্লেটে পান, সুপারি, চুন আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। ছেলেটা খেয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে সামলে নিল মতিন। এখানে প্রশ্ন করলেই কি জবাব শুনতে হবে তার বিশ্বাস নেই।

আলতাফ বলল, 'আপনি আলমারিটা দেখবেন না?'

মতিন আলমারির দিকে তাকাল। এই আলমারি আব্বার মৃত্যুর পরে আর খোলা হয়নি। চাবিও হারিয়ে গেছে। ওর ভেতরে কি আছে তা এখন অনুমানের বিষয়। আব্বা বিষয়ী মানুষ ছিলেন। প্রায়ই আসতেন এখানে। দরকারি কাগজপত্র ঢাকার বাড়িতে না রেখে এখানে কেন রেখে যাবেন? সে বলল, 'একটা হাতুড়ি নিয়ে আয়।'

লিটন ছুটে গেল বাইরে। এবং তারপরেই হইচই পড়ে গেল। বড়সাহেবের আলমারি খোলা হচ্ছে শুনে এ বাড়ির প্রায় সমস্ত আবাসিকরা বারান্দায় জড়ো হল। তাই দেখে আলতাফ রেগে গেল খুব, 'কি হচ্ছে কি? আপনারা কি নাটক দেখতে এসেছেন? আলমারিতে যাই থাকুক তাতে আপনাদের কি দরকার? যান, যে যার কাজে যান।'

ওর মুখচোখ গলার স্বরে কাজ হল। ভিড়টা হালকা হতে শুরু করল। মতিন ঘরে বসে দেখল ওই দলে করিমচাচা এবং কবির রয়েছে। আলতাফ তখনও চেঁচাচ্ছে, 'সব ব্যাপারে নাক গলানো স্বভাব হয়ে গেছে আপনাদের।'

এইসময় লিটন একটা হাতুড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াল। আলতাফ বলল, 'আমাকে দে।'

প্রথমে অল্প জোরে তালায় আঘাত করতে লাগল আলতাফ। কোনও কাজ হল না তাতে। আশেপাশে তাকিয়ে একটা কাঠের টুকরো নিয়ে এসে তার ওপর

তালাটাকে রেখে জোরে আঘাত করল। তালাটা সামান্য তুবড়ে গেল কিন্তু খুলল না।

মতিন দেখছিল। বলল, 'আগেকার দিনের তালা তো, বেশ শক্তপোক্ত। ভেতরে হ্যান্ডেলটা ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে দ্যাখ তো।'

আলতাফ আদেশ পালন করল। ক্রমশ সে অধৈর্য হয়ে উঠছিল। এখন মানুষগুলো বারান্দা থেকে নেমে উঠোনের যে জায়গায় জড়ো হয়েছে সেখান থেকে আলমারিটা দেখা যায়। আলতাফ গায়ের জোর বাড়াতে লাগল। তার মুখ হিংস্র হয়ে উঠছিল। যেন তালাটার সঙ্গে তার সম্মানের লড়াই চলছে। শেষপর্যন্ত খোলেনি, যে কড়ায় তালা আটকেছিল সেইটেই আলমারি থেকে খুলে বেরিয়ে এসেছে। আলতাফ চাপা গলায় বলল, 'শালা।'

লিটন বলল, 'খুলছে।'

আলতাফ বলল, 'খুলে দেখুন।'

মতিন নড়ল না, 'তুই খোল।'

অতএব আলতাফ পাল্লা ধরে টান দিল। কাঠের পুরনো আলমারি। দুটো পাল্লা খুলে দিতেই তাকগুলো দেখা গেল। নানান রকম জিনিসপত্রে ঠাসা। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় একটা অন্যরকম চেহারা তৈরি হয়ে গেছে। মাঝখানের তাকটা লকারের মতো পাল্লায় ঢাকা। সেটা চাবি দেওয়া।

আলতাফ বলল, 'যাচ্চলে! এটা খুলব কি করে?'

মতিন এবার উঠে এল। লকারগুলো যেমন হয়, ফুটোটার চেহারা নিরীহ।

সে বলল, 'হাতুড়ি ঠোক, ভেঙে যেতে পারে।'

লিটন হাতুড়ি তুলে দিল। আলতাফ সেটা ধীরে ধীরে ঠুকতে লাগল। ক্রমশ আবার তার জোর বাড়তে লাগল। মতিনের তখন খেয়াল হল ভেতরের লক ভাঙলেও ওটা খুলবে না। চাবি ঘোরালে পাল্লাদুটোর সামনে খুলে আসার কথা। হাতুড়ির আঘাতে ওটা তো ভেতরে যাবে না। সে আলতাফকে থামাল, 'এভাবে হবে না। পুরোটাই ভেঙে যাবে। ওদের জিজ্ঞাসা করে দ্যাখ কেউ কোনও কায়দা জানে কি না।'

আলতাফ বিরক্ত হল, 'ওরা কি জানে!'

'জিজ্ঞাসা করেই দ্যাখ না।'

আলতাফ বারান্দায় বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করল। মানুষগুলো এ ওর মুখের দিকে তাকাল। চাবিছাড়া তালা খোলার একমাত্র পথ সেটাকে ভাঙা। কিন্তু গুরুত্ব পেয়ে একজন উঠে এল বারান্দায়। লিটল মতিনের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আমার আব্বা।'

আলতাফ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তালা খুলেছেন কখনও?'

লোকটা বলল, 'খুলি নাই। তবে চেষ্টা করতে পারি।'

'করুন।' আলতাফ কাঁধ নাচাতে লোকটি ভেতরে ঢুকল। লকারের সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি মারতে লাগল ফুটোতে। তারপর লিটনকে চাপা গলায় কিছু বলল। সঙ্গে সঙ্গে লিটন ছুটল বাইরে। বিরক্ত আলতাফ বলল, 'কি হল?'

'সরু তার দিয়া আমার এক দোস্ত তালা খুলত, দেখছিলাম।' লোকটি হাসল।

মতিন লোকটিকে দেখছিল। এর কথাই লিটন তাকে বলেছে। লোকটাকে সরল বলেই মনে হচ্ছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম কি?'

'জী, আলি।'

ইতিমধ্যে লিটন ফিরে এল। তার হাতে একটা তার আর চুলের কাঁটা। আলি সে দুটো নিয়ে ফুটোতে মনোনিবেশ করল। তারটা বেঁকে যাচ্ছিল বারংবার। ওরা অধৈর্য হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে সে এবার ঘামতে লাগল। এইসময় বাইরে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। উঠোনের মানুষেরা চেঁচিয়ে উঠল, 'আইছে আইছে।'

উঁকি মেরে দেখে আলতাফ বলল, 'মাছের লরি এসে গেছে। বড়ভাই, আপনি দেখুন ও খুলতে পারে কিনা। আমি ওদিকে যাচ্ছি।'

আলি তখন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। মতিন দেখল বাইরের ভিড়টা লরির দিকে এগিয়ে গেছে। হঠাৎ সে আলির গলা শুনতে পেল, 'হইছে।'

পাল্লাদুটো দু হাতে খুলে আলি হাসল, যেন যুদ্ধ জয় করে ফেলেছে সে।

মতিন বলল, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আলি। তুমি কি কর?'

'এখন কাম নাই সাহাব।'

'কি কাজ কর?'

'যে যা কয় তাই করি।'

'ঠিক আছে। এই যে কাজটা করলে তা আগে কখনও করোনি?'

'না সাহাব। আল্লা কসম, এই প্রথম করলাম।' আলি সরে দাঁড়াল।

মতিন লকারটা দেখল। একটা ফাইল কভার চোখে পড়ছে। ফিতে দিয়ে বাঁধা। পাশে একটা কাঠের বাক্স। এ ছাড়া লকারে কিছু নেই।

ফাইল এবং বাক্সটাকে তুলে নিয়ে সে খাটের ওপর রাখল। লিটন এবং আলি এখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে আছে। আলতাফের মতো ওদের তাড়িয়ে দিতে পারল না মতিন। ওদের উপস্থিতি উপেক্ষা করে সে বাক্সটা খুলতেই দুটো সোনার বালা দেখতে পেল। বেশ ভারী সোনার বালা। এক

একটাই চারভরি হবে। মতিন মনে করার চেষ্টা করল এই বালাদুটোকে সে কখনও দেখেছে কি না। তার মনে পড়ল না। জিনিস দুটোর দাম এখন অনেক। এগুলো বছরের পর বছর এ বাড়ির আলমারিতে পড়েছিল অথচ এই অভাবী মানুষগুলো কখনই নজর দেওয়ার চেষ্টা করেনি। আলতাফ বলবে, ওরা জানত না বলেই চুরি করার চেষ্টা করেনি।

বালাদুটোকে আবার বাক্সে রেখে দিয়ে ফাইলের ফিতে খুলল মতিন। কিছু রসিদপত্র, টুকরো কাগজের নীচে সে ডিডটাকে দেখতে পেল। স্ট্যাম্প পেপারের ওপর হাতে লেখা ডিড। ডিড-এর শুরুতেই ঘোষণা, 'আমি হাজী খালেদ মোহম্মদ, কালীগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী, সজ্ঞানে ঘোষণা করিতেছি যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অত্যন্ত সততার সহিত লিখিত হইয়াছে। কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তির আদেশ অথবা উপদেশে প্রভাবিত হইয়া আমি ইহা রচনা করি নাই।

প্রথমেই ঘোষণা করিতেছি ইহা আমার উইল নয়। দানপত্রও নয়। বলা যাইতে পারে ইহা আমার অভিলাষমাত্র। আইনের মাধ্যমে কেহ এই অভিলাষ পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে না। বিভিন্ন সময়ে আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি তাহাই এখানে লিখিত হইয়াছে। আমার উত্তরাধিকারীরা যদি এই অভিলাষকে মর্যাদা দিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে। কিন্তু কেহই ইহাকে লইয়া আদালতে যাইতে পারিবে না।'

মতিন মুখ তুলল। এ রকম একটা জিনিসকে কি বলা যায়? সে দেখল লিটন এবং আলি তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে খুব হইচই হচ্ছে, মানুষজন যেন কোনও কাজের মধ্যে রয়েছে।

'আমার অভিলাষ।'

(এক) আমার পুত্রেরা সবাই ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পথে। তাহারা কখনও কালীগঞ্জে বাস করিতে আসিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাই আমাদের এই কালিগঞ্জের বাড়ির সহিত যাহারা বংশপরম্পরায় যুক্ত তাহাদের অধিকার দান করিলে ভালো হয়, তাহারা যে যেমন আছে তেমনই থাকিবে। চাষের জমিতে চাষ, পুকুরের মাছ, বিলের মাছ, গাছের ফল ইহারা সমান ভাগ করিয়া লইবে। যেহেতু আইনসম্মত ব্যবস্থায় এইসব বিষয়সম্পত্তির মালিকানা আমার পুত্রদের তাই কেহই এইসব বিক্রি করিতে পারিবে না। যাহারা এই ফলভোগ করিবে তাহারা হইল—

(১) করিম আলি এবং তাহার পরিবার

(২) কবির এবং তাহার পরিবার

(৩) আবদুল কুদ্দুস এবং তাহার পরিবার

(৪) দুর্গাদাস মৃধা এবং তার পত্নী

(৫) শামসুন্নেছা এবং তার মাতা

(৬) তারিখ এবং তার পরিবার

এইসব মানুষেরা সুখে দুঃখে আমাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাহারা যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের সম্পত্তির উচিত তাহাদের দায় বহন করা।

আমি আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন তিনি আমার পুত্রদের সুবুদ্ধি দান করেন।'

মতিনের মনে পড়ল এসব কথা সে তার আব্বার মুখে অনেকবার শুনেছে। কিন্তু তিনি যে এসব লিখে যাবেন তা কে জানত। এটা কোনও উইল নয়। এই কাগজটাকে মেনে নিতে কেউ বাধ্য নয়। তবু মতিনের মনে যেন কাঁটা ফুটল। সে নামগুলোর ওপর চোখ রাখল। করিম চাচা, কবির এবং দুর্গাদাসের মুখ মনে পড়ল। বাকিদের সে হয়তো দেখেছে কিন্তু নামে মনে পড়ছে না। দুর্গাদাস তো এ বাড়িতে থাকে না অথচ হাজি সাহেব তার কথাও মনে রেখেছেন। হঠাৎ তার ৫ নম্বর নামের মানুষটাকে মনে পড়ে গেল। শামসুন্নেছা। ধাই-মায়ের মেয়ের নামও তো তাই। অন্য সবার ক্ষেত্রে পরিবারের কথা লিখেছেন হাজি সাহেব কিন্তু এর বেলায় মায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এসব অঞ্চলে সন্তানের মা হিসেবেই মহিলাদের ডাকা হত অথবা হয়। সেক্ষেত্রে শামসুন্নেছা যে ধাই মায়ের মেয়ে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

ফাইলটাকে বন্ধ করল মতিন। কি করা যায়। আলতাফকে বললে সে কখনই হাজি সাহেবের অভিলাষের প্রতি সম্মান দেখাবে না। কিন্তু দেখানো উচিত। একটি মানুষ যখন তাঁর ইচ্ছার কথা লিখে যায় তখন নিশ্চয়ই সেটা সে মনে প্রাণে চায় বলেই লেখে।

'বড়ভাই।' দরজায় আলতাফের গলা পাওয়া গেল।

লিটনরা নেমে গেছে বারান্দায়। মতিন জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'আসুন। মাছ গোনা দেখবেন না?'

'দেখব। কিন্তু।'

'কি পেলেন লকারে?'

বাক্সটা এগিয়ে দিল মতিন। আলতাফ এগিয়ে এসে সেটা তুলে নিয়ে খুলল। বালাদুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কার এগুলো?'

মতিন মাথা নাড়ল, 'জানি না। কখনও দেখিনি।'

'আম্মার?'

'না। হলেও আমি দেখিনি।'

'আম্মার হলে এখানে থাকবে কেন।' আলতাফ নিজের মনেই বলল। তারপর জিনিসদুটো বাক্সবন্দি করে মতিনের সামনে রাখল, 'ওটা কি?'

'কাগজপত্র। সঙ্গে একটা অভিলাষপত্র।'

'কি পত্র?'

'উইল বা দানপত্র নয়। আব্বার যা ইচ্ছা হয়েছিল তাই লিখে গিয়েছেন। মানা না মানা আমাদের ওপর।' মতিন বলল।

'কি ইচ্ছে?'

'পরে দেখিস। এখন চল, বাইরে কাজ হচ্ছে।'

আলতাফ অদ্ভুত চোখে তাকাল, 'উল্টোপাল্টা কিছু?'

'এখানকার ছটি পরিবার যদি বিপদে পড়ে তাহলে তাদের ভরণপোষণ যদি এখানকার সম্পত্তি থেকে হয় তাহলে উনি খুশি হবেন।'

'চমৎকার। কিন্তু কেন?' আলতাফের গলায় ব্যঙ্গ।

'আমাদের পরিবার এদের কাছে উপকৃত, তাই।'

'আব্বার মাথা ঠিক ছিল না। এখন এইকথা এরা জানলে মাথায় উঠে বসবে।'

'আব্বা নিজেই লিখে গেছেন, এই নিয়ে কোর্টে যাওয়া যাবে না।'

'ও। তাহলে তো আমরা মানতে বাধ্য নই।'

'ইচ্ছে না হলে নই।'

আলতাফ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কি ইচ্ছে?'

'আমার? এখনও ভাবিনি।'

'কাদের কাদের নাম আছে?'

মতিন নামগুলো বলে গেল।

শোনামাত্র আলতাফ বলল, 'শামসুন্নেছার নামও আছে। সর্বনাশ। আপনি এই ব্যাপারটা চেপে যান।'

'কেন? সর্বনাশের কি হল?'

'আপনাকে বলা আমার পক্ষে মানায় না।'

'ব্যাপারটা কি? শামসুন্নেছাকে নিয়ে তার মা আমার কাছে এসেছিল। মহিলা আমার ধাই-মা ছিলেন। ওর মেয়ের স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে ওর ভাসুর অত্যাচার শুরু করে। আত্মসম্মান বাঁচাতে সে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।'

'আর কিছু বলেনি?'

'না। আমাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছে।'

'বড়ভাই, আমি এখানে এখন প্রায়ই আসি। আমি না চাইলেও আমার কানে অনেক গল্প আসে। সেগুলোকে বদমাস লোকের তৈরি গল্প বলে আমি উড়িয়ে দিই। কিন্তু আব্বা লিখিতভাবে ওর নাম জানিয়ে গেছেন শুনলে লোকে আবার গল্প তৈরি করবে।'

'কি গল্প শুনেছিস তুই?'

'আমি বলতে পারব না। আব্বার চরিত্র ভালো ছিল। তাই আমি গল্পটা বিশ্বাস করি না।'

আলতাফ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মতিন হাঁ হয়ে গেল। কি বলে আলতাফ? আব্বা যখন মারা যান, তখন শামসুন্নেছার বয়স কত ছিল? আট দশ। তাহলে আব্বার চরিত্রের কথা আলতাফ তুলল কেন? তার ইচ্ছে করল ছোটভাইকে ডেকে চড় কষায়। কঠোর গলায় বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করে।

'আপনারে ডাকতেছে।' লিটনের গলা কানে এল।

বাক্স এবং ফাইল আলমারিতে রেখে মতিন বাইরে বেরিয়ে এল। একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে। লরি থেকে তিনটে বড় ড্রাম নামানো হয়েছে। তিনজন লোক সেই ড্রামে হাত ঢুকিয়ে ক্রমাগত জল নেড়ে চলেছে।

আলতাফ বলল, 'মাছের বাচ্চা আছে এখানে। মুখে যা বলে তা তো ঠিক হয় না। তাই গুনে গুনে পানিতে ফেলব। সাইজ এক। এই কৌটায় মাছ ভর্তি করলে সংখ্যাটা বোঝা যাবে।'

'পানি থাকবে না?' মতিন জিজ্ঞাসা করল অন্যমনস্ক গলায়।

'না। কৌটোর নীচে ফুটো আছে।'

আলতাফকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না সে একটু আগে আব্বা সম্পর্কে ওইসব কথা বলে এসেছে।

আলতাফ লোকগুলোকে নির্দেশ দিল ড্রামগুলোকে পুকুরের ধারে নিয়ে যেতে। এইরকম কিছু লোক গুনগুন করে উঠতেই মতিন দেখতে পেল লাঠিতে ভর করে প্রায় লেংচে লেংচে দুর্গাদাস আসছেন। সে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দুর্গাদাসকে ধরল, 'অসুবিধে হচ্ছে খুব?'

হাঁপাচ্ছিলেন দুর্গাদাস, 'একটু তো হইবই। অনভ্যাস। লরি কইর‍্যা মাছ আনলা নাকি?'

'হ্যাঁ। আলতাফ, এদিকে শোন।'

আলতাফ এগিয়ে এল। মতিন বলল, 'এই হলো আলতাফ, আমার ছোটভাই।'

দুর্গাদাস একদৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করলেন, 'এইটুকুন দেখছিলাম তোমারে।'

'বড়ভাই আপনার কথা বলেছিলেন। কিন্তু আপনি কি পারবেন রোজ আসতে?'

মনে হচ্ছিল দুর্গাদাসকে দেখে আলতাফ মোটেই সন্তুষ্ট নয়। দুর্গাদাসের পোশাকও খুব জীর্ণ।

'আজ যখন পারলাম তখন কাল না পারার তো কোনও কারণ নাই।' দুর্গাদাস হাসলেন।

অগত্যা আলতাফ হাত তুলে একজনকে ডেকে বলল, 'লতিফকে নিয়ে এখানে আয়।'

মতিন দেখল দু'জন যুবক এগিয়ে আসছে। গ্রামের অন্য মানুষের তুলনায় এদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো। ওরা কাছে এসে সেলাম করতেই আলতাফ বলল, 'এর নাম আজিজ আর ওর নাম লতিফ। এদের আজ কাজে রাখলাম।'

মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় থাকো তোমরা?'

আজিজ বলল, 'ওই পাড়ায়।'

মতিন বুঝল আলতাফ এই বাড়ির কোনও লোককে পাহারায় রাখেনি। ব্যাপারটা ঠিক নয়। সে যুবক দুটোকে বলল, 'ছোট সাহেব যা বলে যাবেন সেইভাবে কাজ কর। আর হ্যাঁ, এঁকে তোমরা চেনো? ইনি আমাদের খুব পুরনো মানুষ। রোজ সকাল বিকেল উনি আসবেন এখানে। কোনও অসুবিধে হলে এঁকে বলবে। ঠিক আছে, যাও।'

সেলাম করে ওরা চলে গেলে মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'চারজন লোক রাখার কথা ছিল না?'

আলতাফ বলল, 'এখন দু'জনেই হয়ে যাবে। মাছ বড় হলে—।'

'না। এরা দিনের বেলায় কাজ করবে। রাত্রের জন্য তুই এখন একজন রাখ।' সে হাত তুলে দূরে দাঁড়ানো আলিকে ডাকল। কিছু না বুঝেই আলি ছুটে এসেছিল। মতিন যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল রাত জেগে পুকুরের মাছ পাহারা দিতে পারবে কি না তখন সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

আলতাফ তাকে ধমকাল, 'আমি যদি খবর পাই তুই ফাঁকি দিচ্ছিস তাহলে...।'

আলি বলল, 'তখন আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন।'

মাছ ছাড়া হল পুকুরে হইহই করে। আলতাফ এবং লতিফরা গুনে গুনে মাছ

ছাড়ল বিকেলের পড়ন্ত আলোয়। পাড়ে দাঁড়িয়ে মতিন দেখছিল দৃশ্যটা। পাশে দুর্গাদাস। মতিন বলল, 'আপনি তো কখনও ঢাকায় গেলেন না। কিন্তু এখানে গোলমাল হলে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা খবর পাই।'

দুর্গাদাসকে চিন্তিত দেখাল। মতিন পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দুর্গাদাসকে দিল, 'এটা যত্নে রাখুন। এতে আমার ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লেখা আছে। কিভাবে খবর পাঠাবেন সেটা আমার ওপর নির্ভর করছে। এই কুড়িটা টাকা রাখুন। এটা এই বাবদে দিলাম। খুব প্রয়োজন না হলে খরচ করবেন না।'

মাছ ছাড়া হয়ে গেলে অদ্ভুত ধূসর এক আলো নামল পৃথিবীতে। মতিন ভাবছিল এইসময় যদি ভোলা এদিকে আসে তাহলে ওর বাপের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হবে। মতিনও চেষ্টা করত দুজনের মধ্যে ভাব করিয়ে দেবার। অবশ্য দুর্গাদাস ছেলেকে সহজে গ্রহণ করবে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। মানুষটার জন্যে বেশ কষ্ট হচ্ছিল মতিনের।

আকাশে পাখিরা এখন উড়ে উড়ে যাচ্ছে। শিমুল গাছের ওপর যেন পাখিদের সভা বসে গেছে। বিলের ওপর ছায়া ঘন হয়ে আসছে। মতিন বলল, 'আপনি এখানে রাত করবেন না। বাড়ি ফিরতে অসুবিধে হবে।'

দুর্গাদাস হাসলেন, 'তোমার চাচী তাঁতকল থিক্যা যাওয়ার সময় আমারে লইয়া যাইব।'

মতিন খুশি হল। তারপর বলল, 'জানেন, এখানে যারা আছে তাদের অনেককেই আমি চিনি না।'

দুর্গাদাস মাথা নাড়লেন, 'তুমি ঢাকায় থাকো বইল্যা চিনো না, আমি ঘর থিক্যা বাহির হই না বইল্যা চিনি না। ব্যাপারখান একই।'

কাজ শেষ হয়ে গেলে আলতাফ উঠে এল।

আলতাফের হাতে পায়ে জল কাদা লেগে গেছে। সেসব পরিষ্কার করে সে দুর্গাদাসকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি টাকার হিসেব রাখতে পারবেন।'

'কি রকম?'

'মাছের খাবার কেনার টাকা আমি দিয়ে যাব। গাজীপুরে পাওয়া যায়। সেখান থেকে টাইম টু টাইম কিনে এনে খাওয়াতে হবে।'

দুর্গাদাস আপত্তি করলেন, 'টাকা দেওনের দরকার কি! খাবারটাই কিনে দাও। বেশি কিনলে তো নষ্ট হইব না।'

কথাটা পছন্দ হল আলতাফের।

এখন একটু একটু করে ভাল লাগা তৈরি হচ্ছে। দিন গেলেও দিনের স্মৃতি মনে

পড়ায় যে ভাল লাগা তাই বা কম কি। মতিন একাই হাঁটতে বের হল। মসজিদে আজান দেওয়া হচ্ছে। মাঠের ওপর দিয়ে বিলের শুকনো জমি পেরিয়ে তার সুর ভেসে যাচ্ছে দূর দূরান্তরে। বড় সুন্দর এ সময়। এই পথটা আব্বা করে গিয়েছিলেন। এই পথে আব্বা হাঁটাচলা করতেন। কেমন যেন শিরশিরানি এল শরীরে। আব্বার শেষ অভিলাষ সে পূর্ণ করতে পারছে না। এই বাড়ি, মসজিদ, মাটি, পুকুরের ওপর কার অধিকার বেশি? তাদের না যারা তাদের হয়ে এতকাল আগলে বসে আছে?

এখনও সন্ধের অন্ধকার নামেনি। দোকানপাট যে জায়গায় সেখানে পৌঁছানো মাত্র একটি ছেলে দৌড়ে এল, 'এই নেন।'

মতিনের মনে পড়ল। সকালে লবেঞ্চুস কেনার সময় সে চেঞ্জ নেয়নি। ভালো লাগল ছেলেটির সততা দেখে। তারপরেই সে মুজিবর ভাইকে দেখতে পেল।

মুজিবর বলল, 'আদাব। চললেন, কই?'

'কোথাও না। এমনি হাঁটছিলাম। মুজিবর ভাই, আমি আলতাফকে বলে দিয়েছি যাতে এখানে এসে কোনও ঝামেলা না করে।'

'ভালো করছেন।'

'এখানে আমরা একটা ব্যবসা শুরু করতে চলেছি। আমার আব্বা যাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের কাউকে আমরা উৎখাত করছি না, বরং কয়েকজনকে চাকরি দিয়েছি।' মতিন বলল।

'কিন্তু আপনারা মাছ চাষ করলে ওরা পুকুরে জাল ফেলতে পারবে না।'

'হ্যাঁ, সেটা সম্ভব নয়।'

'সেটাও ঠিক। তাহলে ওরা বাঁচবে কি করে?'

মতিন প্রশ্নটা শুনে হাসল, 'আপনি স্বাধীনতা সংগ্রামী। আপনিই বলুন, মানুষ কতদিন অন্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকবে? তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করা উচিত নয়?'

'এরা সবাই বৃদ্ধ, অশক্ত, নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার বয়স চলে গিয়েছে।' মুজিবর মাথা নাড়লেন, 'আমি জোর করছি না, শুধু ভেবে দেখতে বলেছি। আমার কথা লোকে এখন শোনে না।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। বোঝাই গেল উনি একটুও সন্তুষ্ট নন। মতিনের মনে হল গোটা দেশের চেহারাটাই যদি এমন হয়ে যায় তাহলে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু হবে না। শুধু সাহায্য চেয়ে হাত বাড়িয়ে বেশিদিন বেঁচে থাকা যায় না, তাতে

আত্মমর্যাদাও থাকে না। এ কথা এইসব প্রবীণ মানুষেরা কবে বুঝতে পারবেন? মুজিবর ভাই যদি জানতেন হাজী সাহেব একটা অভিলাষপত্র রেখে গিয়েছেন তাহলে আর দেখতে হত না। মতিন বুঝতে পারছিল কাগজটা পড়ার পর যে দুর্বলতা তার মনে জুড়ে বসেছিল তা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে।

মসজিদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মেছবাহউদ্দিন সাহেব। জিজ্ঞাসা করলেন, 'চললেন নাকি?'

'হ্যাঁ, একটু বাদেই ফিরে যাব।'

'আবার কবে আসবেন?'

'এখন তো মাঝেমাঝেই আসতে হবে।'

'শুনলাম মাছের চারা নিয়ে লরি এসেছে।'

'হ্যাঁ, মাছ ছাড়াও হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আপনার উপদেশ মতো আমরা এখানকার চারজন মানুষকে চাকরিতে নিয়োগ করেছি আজ থেকে।' মতিন ইচ্ছে করেই উপদেশ শব্দটি ব্যবহার করল।

'নিয়োগ করে ফেলেছেন? কাদের?' কপালে ভাঁজ পড়ল চেয়ারম্যান সাহেবের।

'আজিজ, লতিফ, আলি আর দুর্গাদাস।'

'দুর্গাদাসটা কে?' মেছবাহউদ্দিন পাশে দাঁড়ানো কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে হে?'

মতিন জবাব দিল, 'হিন্দু পাড়ায় বাড়ি। আমার আব্বা ওঁকে খুব ভালোবাসতেন।'

'ও দুর্গাদাস।' চিনতে পারলেন মেছবাহউদ্দিন, 'ভোলার বাবা! সে তো অথর্ব, ভালো করে হাঁটতে পারে না। ওকে দিয়ে কোন কাজ করাবেন?'

'পাহারা দিতে পারবে।'

'হুম। কিন্তু আমাকে বলে নিয়োগ করলে ভালো করতেন।' গম্ভীর গলায় বললেন মেছবাহউদ্দিন, 'যাদের সত্যিকার প্রয়োজন ছিল তাদের বঞ্চিত করা ঠিক নয়।'

মতিন হাসল, 'ব্যাপারটা কি হওয়া উচিত বুঝতে পারিনি। আসলে গতকাল ঢাকায় আড্ডা মারার সময় মুকুলভাই বলেছিলেন আপনার কথা। কালীগঞ্জে কোন অসুবিধে হবে না।'

'মুকুল ভাই মানে? কোন মুকুল ভাই?'

'এম এ সামাদ মুকুল।'

'মুকুল ভাইকে আপনি চেনেন?' মেছবাহউদ্দিনের গলায় স্বর বদলে গেল।

'আমার বন্ধু।'

সঙ্গে সঙ্গে মতিনের হাত জড়িয়ে ধরলেন ভদ্রলোক, 'একথা এতক্ষণ বলেননি কেন? ছি ছি ছি। কি বলতে কি বলেছি। হ্যাঁ, এখন থেকে আপনি নিশ্চিন্ত। কেউ আপনার ওখানে কোন ঝামেলা করবে না। খুব ভালো হল। আপনারা যত গ্রামে আসবেন তত গ্রামের মঙ্গল হবে।'

এরপর কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা চলে। মেছবাহউদ্দিন বারংবার মতিনকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু সময় কম বলে এড়িয়ে গেল মতিন। তারপর ফিরে এল বাড়ির দিকে।

এখন অন্ধকার গাছের মাথায়। মাটিতে তার ছোপ লেগেছে। সাবধানে পথ চলতে হচ্ছিল। মাটির পথ। হাজী সাহেবের ইন্তেকাল হওয়ার পর আর কেউ রাস্তাটাকে যত্ন করেনি। বর্ষায় এখান দিয়ে হাঁটা মুশকিল হয়ে পড়বে। হাওয়া বইছে বেশ। সেই হাওয়ায় মতিনের মন ভালো হয়ে উঠল। বাল্যকালে এইরকম সময়ে এই পথ দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় এমনই হাওয়া বইত। পৃথিবীটা ঠিকঠাক আছে, শুধু মানুষের বয়স বাড়ে আর বিলের পানি শুকিয়ে যায়।

মতিনের মনে হল বাঁকের মুখে রাস্তার পাশে একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটি যে মহিলা সেটা ঠাওর করতে কয়েক পা এগোতে হল। একটা গাছের গায়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে মহিলা দাঁড়িয়ে। একেবারে পাশে চলে আসার পর সে মহিলাকে চিনতে পারল। ধাই মায়ের মেয়ে শামসুন্নেছা, আনু।

'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?' মতিন জিজ্ঞাসা করল। এই মেয়েটি ধাই-মায়ের সঙ্গে তার ঘরে এসে একটিও কথা বলেনি আজ দুপুরে।

মাথা নিচু করল আনু। অন্ধকারে তার আদল বোঝা যাচ্ছে।

'তুমি কি কিছু বলবে?'

'আমাকে বাঁচান।' সরু ফিনফিনে গলা কানে এল মতিনের।

'আমি তো তোমার মাকে বলেছি, চেষ্টা করব।'

'সেকথা না—।'

'তাহলে?'

'আমারে একটা কাম দ্যান। গারমেন্টের কাম।'

'সেটা করতে হলে তো তোমাকে ঢাকায় যেতে হবে।'

'যামু।'

'কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকবে কোথায়? ঢাকায় একা একা থাকতে পারবে না।'

'বড় সাহেব আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি থাকলে...।'

'হ্যাঁ, বাবা তোমার নাম লিখে গিয়েছেন।' অন্যমনস্কভাবে বলে ফেলল মতিন।

কথাটা বুঝতে পারল না আনু। নিজের মনেই বলে চলল, 'আমাকে তিনি কত কি দিছিলেন। আমার বিয়ার সময় দিবেন বইল্যা দুইখান বালা কিনছিলেন। সোনার বালা।'

মতিনের বুক ধক করে উঠল। সে বলল, 'তুমি সেই বালা দেখেছ?'

'হুঁ।'

'দেখলে চিনতে পারবে?'

'হুঁ।' আনু বলল, 'বালার ওপর ছোট ছোট সাপ আছে।'

আর সন্দেহ রইল না। মেয়েটা সত্যি বালা দেখেছে। চারভরি ওজনের বালার গায়ে সাপ আঁকা ছিল। তখন খেয়াল করেনি। এখন শোনার পর মনে পড়ল। আলতাফ তখন কিছু একটা বলতে চেয়েছিল কিন্তু বলেনি। ওই কাগজের খবর জানাজানি হলে আব্বাকে নিয়ে আবার গল্প চালু হবে। আব্বা যখন মারা যান তখন এর বয়স খুবই কম। বালিকামাত্র। গল্প চালু হবার কারণ কি?

'তোমাকে নিয়ে আব্বা সম্পর্কে কোনও গল্প এই গ্রামে হয়?'

'হয়।'

'কি গল্প?'

'সবাই বলে তিনি আমার বাপের মত ছিলেন।'

'বাপের মত মানে?'

'আমার নিজের আব্বারে তো সাপে কাটছিল।'

'ও।' মতিন দেখল দূরে তাদের বাড়ির দিক থেকে একটা গাড়ির হেডলাইট এগিয়ে আসছে। সে বলল, 'ঢাকায় আমাদের গারমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে। আমি দেখছি কি করা যায়। তুমি সাবধানে থেকো।'

ততক্ষণে গাড়ির আলোয় চারপাশ আলোকিত হয়ে গেছে। মেয়েটা উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তীব্রতার জন্যে। গাড়িটা সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। হেডলাইট নিভল না। আলতাফের গলা শোনা গেল, 'বড়ভাই আপনি এখানে?'

'একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।'

'ও এখানে কি করছে? কি বলছিল?'

'এমনি কথা বলছিল।'

গাড়ি থেকে নেমে এল আলতাফ। হেডলাইট নেভায়নি। তার আলোয় ওকে বেশ বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল, 'অ্যাই, বড়ভাইকে কি বলছিলি?'

মেয়েটা জবাব দিল না। মতিন বলল, 'বললাম তো তোকে।'

'আপনি জানেন না এরা কি ডেঞ্জারাস।'

'সব মানুষকে তোর ডেঞ্জারাস বলা অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে।'

'একদম না। বড়ভাই, এ আপনাকে কিছু বলেছে?'

'কি ব্যাপারে?'

'আব্বাকে নিয়ে কোনও কথা?'

'না।'

মনে হল আলতাফ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'নেক্সট টাইম যখন আসব তখন তোকে আর তোর মাকে নিয়ে যাব তোর ভাসুরের কাছে। ওখানেই থাকবি তোরা। আপদ। আসেন বড়ভাই।'

'আমরা কি এখানেই ফিরে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ।'

'আমার একবার বাড়িতে যাওয়া দরকার।'

'কেন?'

'ফাইল আর বালার বাক্সটা আলমারিতে ফেলে এসেছি।'

ওটা আমার সঙ্গে আছে। বেরুবার সময় নিয়ে এসেছি।'

'লোকজনদের সঙ্গে দেখা করে আসব না?'

'আবার তো আসবেন। এখন গেলে সবাই টাকা চাইবে। সারাদিন বলতে পারেনি এখন সব্বাই হাত পাতবে। আসেন।' গাড়িতে ফিরে গেল আলতাফ।

মতিন ধীরে ধীরে গাড়ির কাছে গেল, 'আলতাফ।'

'বলেন।'

'দ্যাখ, আমি আমার আব্বাকে খুব সমীহ করতাম। তাঁর অনেক কিছু আমার রক্তে ঢুকে গেছে। তোরা ওঁকে খুব অল্পদিন দেখেছিস। তোরা এটা বুঝবি না।'

'তা ঠিক। কিন্তু এসব বলছেন কেন?'

'আমার মনে হচ্ছে আব্বার শেষ ইচ্ছাকে সম্মান দেব।'

'কি আশ্চর্য। এইসব জমি পুকুর বিলিয়ে দেবেন? আপনি ভাবীকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনিও আপনাকে একই কথা বলবেন। আব্বা আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এসব সম্পত্তি আমাদের কারো একার নয়। আমরা একা কিছুই করতে পারি না।' আলতাফ বলল।

'ঠিক কথা। কিন্তু ওই বালাদুটো কার?'

'ওটা আমাদের সবার। তবে আপনি রেখে দিতে পারেন।'

'না। এই বালা ওর। আব্বা ওর জন্যে বানিয়েছিলেন।'

'মিথ্যে কথা।' চেঁচিয়ে উঠল আলতাফ।

'চেঁচাস না। আমরা বালা পেয়েছি ও জানে না। নিজেই বলল। বালাটার বর্ণনা দিল। যার বালা তাকে দিয়ে যেতে চাই।'

'আপনি যখন বালা দেখছিলেন তখন আলি আর তার ছেলে ছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'ওরাই বলতে পারে।'

'পারে। কিন্তু অতদূর থেকে বালার গায়ের সাপ দেখতে পারে না।' মতিন হাত বাড়াল, 'বাক্সটা দে।'

'ও কি করবে এদুটো নিয়ে? কোথায় রাখবে? বিক্রিও করতে পারবে না।'

'যা ইচ্ছে করুক। আব্বা শান্তি পাবে।'

আলতাফ বাক্সটা দিয়ে দিল। মতিন সেটাকে নিয়ে আনুর দিকে এগোতেই সে কঁকিয়ে উঠল, 'না, আমি নিব না। যে নাই তার জিনিস আমি নিব না। আপনি আমারে চাকরি দেন। আমারে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবেন না।' হঠাৎ মেয়েটা ছুটতে লাগল অন্ধকারে। মাঠঘাট পেরিয়ে মিলিয়ে গেল সে। তাকে আর দেখা গেল না।

মতিন গাড়ির দরজা খুলতেই কান্নার আওয়াজ পেল। স্টিয়ারিং-এর উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আলতাফ। সে খুব অবাক হল। হাত বাড়িয়ে ভাইয়ের কাঁধ ধরল, 'এই, কাঁদছিস কেন?'

আলতাফ কথা বলার চেষ্টা করল। রিভলভার নিয়ে ঘোরা রাগী ছেলেটা এখন নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত, 'আব্বা—আব্বা—।'

'দুর পাগল। মানুষের স্বভাব হল গল্প তৈরি করা। আমাদের আব্বা ছিলেন কালীগঞ্জের মাটি, গাছ, পুকুর বিলের মত সহজ। আমি তাঁকে অনেক বেশি চিনেছি। তাঁকে সন্দেহ করা মানে নিজের খুন নষ্ট করা। ঠাণ্ডা হ। দ্যাখ না, বাবা যাকে স্নেহ করত সে লোভী নয়। এত দামি বালাটা নিল না। যে নেই তার জিনিস নেবে না বলে। তুই গাড়ি চালাতে পারবি না আমি চালাব।'

আলতাফ সোজা হয়ে বসল। ইঞ্জিন চালু করল। মতিন বাক্সটাকে একপাশে রেখে পকেটে হাত দিল রুমালের জন্যে। হঠাৎ আঙুলের ডগায় অন্যরকম স্পর্শ। আঙুল চটচটে হয়ে উঠল। অস্বস্তি হতেই সে পকেটটা ভাল করে দেখতে গিয়ে থমকে গেল। সকালে যে লবেঞ্চুসগুলো পকেটে রেখেছিল সেগুলো খানিকটা গলে প্যান্টের সঙ্গে লেগে গেছে। তিনটেকে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া সত্ত্বেও পকেটের চটচটানি রয়েই গেল। শরীরটাই কেমন করে উঠল। বাড়ি ফিরে প্যান্টটাকে ছেড়ে না ফেলা পর্যন্ত মতিনের স্বস্তি হবে না। সে আলতাফকে বলল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার।'

— সমাপ্ত —

সমরেশ মজুমদারের জন্ম ১০ মার্চ ১৯৪৪। শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র। কলকাতায় আসেন ১৯৬০-এ।

শিক্ষা: স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ। প্রথমে গ্রুপ থিয়েটার করতেন। তারপর নাটক লিখতে গিয়ে গল্প লেখা। প্রথম গল্প 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৬৭ সালে। প্রথম উপন্যাস 'দৌড়', ১৯৭৫-এ 'দেশ' পত্রিকায়।

গ্রন্থ: দৌড়, এই আমি রেণু, উত্তরাধিকার, বন্দীনিবাস, বড় পাপ হে, উজান গঙ্গা, বাসভূমি, লক্ষ্মীর পাঁচালি, উনিশ বিশ, সওয়ার, কালবেলা, কালপুরুষ এবং আরও অনেক।

সম্মান: ১৯৮২ সালের আনন্দ পুরস্কার তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি। এ ছাড়া 'দৌড়' চলচ্চিত্রের কাহিনিকার হিসাবে বি এফ জে এ, দিশারী এবং চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির পুরস্কার। ১৯৮৪ সালে 'কালবেলা' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।